উপন্যাস

পুতুলনাচের ইতিকথা

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচিপত্র

১. খালের ধারে প্রকাণ্ড বটগাছ 2
২. শশীর চরিত্র... 16
৩. মতির জন্য পাত্র দেখিতে গিয়া 35
৪. এবার কার্তিক মাসে পূজা 54
৫. যামিনী কবিরাজের বউ সেনদিদি.................................... 78
৬. গ্রাম্য জীবনে শশীর বিতৃষ্ণা 108
৭. মতিকে লইয়া কুমুদ চলিয়া গিয়াছ.................................. 137
৮. গ্রামে না-ফিরিবার প্রতিজ্ঞা.. 154
৯. নৌকার দোলনে দুলিয়া 183
১০. মতির কথা 194
১১. নতুন আশার সঞ্চারে 213
১২. হাসপাতালের নবনির্মিত গৃহটি 249
১৩. সূর্যাস্ত দেখিবার শখ.. 268

১. খালের ধারে প্রকাণ্ড বটগাছ

পুতুলনাচের ইতিকথা (উপন্যাস)

১

খালের ধারে প্রকাণ্ড বটগাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়া হারু ঘোষ দাঁড়াইয়া ছিল। আকাশের দেবতা সেইখানে তাহার দিকে চাহিয়া কটাক্ষ করিলেন।

হারুর মাথায় কাঁচা-পাকা চুল আর বসন্তের দাগভরা রুক্ষ চামড়া ঝলসিয়া পুড়িয়া গেল। সে কিন্তু কিছুই টের পাইল না। শতাব্দীর পুরাতন তরুটির মূক অবচেতনার সঙ্গে একান্ন বছরের আত্মমমতায় গড়িয়া তোলা জগৎটি তাহার চোখের পলকে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

কটাক্ষ করিয়া আকাশের দেবতা দিগন্ত কাঁপাইয়া এক হুঙ্কার ছাড়িলেন।তারপর জোরে বৃষ্টি চাপিয়া আসিল।

বটগাছের ঘন পাতাতেও বেশিক্ষণ বৃষ্টি আটকাইল না। হারু দেখিতে দেখিতে ভিজিয়া উঠিল। স্থানটিতে ওজনের ঝাঁঝালো সামুদ্রিক গন্ধ ক্রমে মিলাইয়া আসিল। অদূরের ঝোপটির ভিতর হইতে কেয়ার সুমিষ্ট গন্ধ ছড়াইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল। সবুজ রঙের সরু লিকলিকে একটা সাপ একটি কেয়াকে পাকে পাকে জড়াইয়া ধরিয়া আচ্ছন্ন হইয়াছিল। গায়ে বৃষ্টির জল লাগায় ধীরে ধীরে পাক খুলিয়া ঝোপের বাহিরে আসিল। ক্ষণকাল স্থিরভাবে কুটিল অপলক চোখে হারুর দিকে চাহিয়া থাকিয়া তাহার দুই পায়ের মধ্য দিয়াই বটগাছের কোটরে অদৃশ্য হইয়া গেল।

হারুকে সহজে এখানে কেহ আবিষ্কার করিবে, এরূপ সম্ভাবনা কম। এদিকে মানুষের বসতি নাই। এদিকে আসিবার প্রয়োজন কাহারো বড় একটা হয় না, সহজে কেহ আসিতেও চায় না। গ্রামের লোক ভয় করিতে ভালবাসে। গ্রামের বাহিরে খালের এপাড়ের ঘন জঙ্গল ও গভীর নির্জনতাকে তাহারা এই কাজে লাগাইয়াছে। ভূত-প্রেতের অস্তিত্ব

হয়তো গ্রামবাসীরই ভীরু কল্পনায়, কিন্তু স্থানটি যে সাপের রাজ্য তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

দিনের আলো বজায় থাকিতে থাকিতে বাজিতপুরের দু-একটি সাহসী পথিক মাঠ ভাঙিয়া আসিয়া ঘাসের নিচে অদৃশ্যপ্রায় পথ-রেখাটির সাহায্যে পথ সংক্ষেপ করে। বলিয়া-কহিয়া কারো নৌকায় খাল পার হইলেই গাওদিয়ার সড়ক। গ্রামের পৌঁছিতে আর আধ মাইলও হাঁটিতে হয় না। চণ্ডীর মা মাঝে মাঝে দুপুরবেলা এদিকে কাঠ কুড়াইতে আসে। যামিনী কবিরাগের চেলা সপ্তাহে একটি গুল্মলতা কুড়াইয়া লইয়া যায়। কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে ভিনগাঁয়ের সাপুড়ে কখনো সাপ ধরিতে আসে। আর কেহ ভুলিয়াও এদিকে পা দেয় না।

বৃষ্টি থামিতে বেলা কাবার হইয়া আসিল। আকাশের একপ্রান্তে ভীরু লজ্জার মতো একটু রঙের আভাস দেখা দিল। বটগাছের শাখায় পাখিরা উড়িয়া আসিয়া বসিল এবং কিছু দূরে মাটির গায়ে গর্ত হইতে উইয়ের দলকে নবোদ্গত পাখা মেলিয়া আকাশে উড়িতে দেখিয়া হঠাৎ আবার সেই দিকে উড়িয়া গেল। হারুর স্থায়ী নিস্পন্দতায় সাহস পাইয়া গাছের কাঠবিড়ালীটি এক সময় নিচে নামিয়া আসিল। ওদিকে বুঁদিগাছের জালে একটা গিরগিটি কিছুক্ষণের মধ্যেই অনেকগুলি পোকা আয়ত্ব করিয়া ফেলিল। মরা শালিকের বাচ্চাটিকে মুখে করিয়া সামনে আসিয়া ছপ-ছপ করিয়া পার হইয়া যাওয়ার সময় একটা শিয়াল বার বার মুখ ফিরিয়া হারুকে দেখিয়া গেল। ওরা টের পায়। কেমন করিয়া টের পায় কে জানে!

শশী বলিল, নৌকা ওদিকে সরিয়ে নিয়ে যা গোবর্ধন। ওই শ্যাওড়াগাছটার কাছে। এখান দিয়ে নামানো যাবে না।

বটগাছটার সামনাসামনি খালের পাড় অত্যন্ত ঢালু। বৃষ্টিতে পিছলও হইয়া আছে। গোবর্ধন লগি ঠেলিয়া নৌকা পাশের দিকে সরাইয়া লাইয়া গেল! সাত মাইল তফাতে নদীর জল

চব্বিশ ঘণ্টায় তিন হাত বাড়িয়াছে। খালে স্রোতও বড় কম নয়। শ্যাওড়াগাছের একটা ডাল ধরিয়া ফেলিয়া নৌকা স্থির করিয়া গোবর্ধন বলিল, আপনি লায়ে বসবে এসো বাবু, আমি লাবাচ্ছি।

শশী বলিল, দূর হতভাগা, তোকে ছুঁতে নেই।

গোবর্ধন বলিল, ছুঁলাম বা কে জানছে? আপনি ও ধুমসো মড়াটাকে লাবাতে পারবে কেন?

শশী ভাবিয়া দেখিল, কথাটা মিথ্যা নয়। পড়িয়া গেলে হারুর সর্বাঙ্গ কাদামাখা হইয়া যাইবে। তার চেয়ে গোবর্ধন ছুঁইলে শবের আর এমন কী বেশি অপমান? অপঘাতে মৃত্যু হইয়াছে,-মুক্তি হারুর গোবর্ধন ছুঁইলেও নাই, না ছুঁইলেও নাই।

আয় তবে, দুজনে ধরেই নামাই। গাছের সঙ্গে টেনে নৌকা বাঁধ, সরে গেলে মুশকিল হবে। আচ্ছা, আলোটা আগে জেলে নে গোবর্ধন। অন্ধকার হয়ে এল।

আলো জ্বালিয়া শ্যাওড়াগাছের সঙ্গে নৌকা বাঁধিয়া গোবর্ধন উপরে উঠিয়া গেল। দুজনে ধরাধরি করিয়া হারুকে তাহারা সাবধানে নৌকায় নামাইয়া আনিল। শশী একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, দে, নৌকা খুলে দে গোবর্ধন। আর দ্যাখ ওকে তুই আর ছুঁসনে।

আবার ছোঁবার দরকার!

শশী শহর হইতে ফিরিতেছিল। নৌকায় বসিয়াই সে দেখিতে পায়, খালের মনুষ্যবর্জিত তীরে সন্ধ্যার আবছা আলোয় গাছে ঠেস দিয়া ভূতের মত একটা লোক দাঁড়াইয়া আছে। পাগল ছাড়া এসময় সাপের রাজ্যে মানুষ ওভাবে দাঁড়াইয়া থাকে না। শশীর বিস্ময় ও কৌতুহলের সীমা ছিল না। হাঁকডাক দিয়া সাড়া না পাইয়া গোবর্ধনকে সে নৌকা ভিড়াইতে বলিয়াছিল। গোবর্ধন প্রথমটা রাজি হয় নাই। ওখানে এমন সময় মানুষ আসিবে কোথা হইতে। শশীর ও চোখের ভুল। সত্য সত্যই সে যদি কিছু দেখিয়া থাকেও, ওই কিছুটির ঘনিষ্ঠ পরিচয় লইয়া আর কাজ নাই, মানে মানে এবার বাড়ি ফেরাই ভালো।

কিন্তু শশী কলিকাতার কলেজে পাস করিয়া ডাক্তার হইয়াছে। গোবর্ধনের কোনো আপত্তিই সে কানে তোলে নাই। বলিয়াছিল, ভূত যদি হয় তো বেঁধে এনে পোষ মানাব গোবর্ধন, নৌকা ফেরা।

তখনো আকাশে আলো ছিল। হারুর চারিপাশে কচুপাতায় আটকানো জলের রুপালি রূপ একেবারে নিভিয়া যায় নাই। কাছে গিয়া হারুকে দেখিবামাত্র শশী চিনিতে পারিয়াছিল।

ওরে গোবর্ধন, এ যে আমাদের হারু এখানে ও এল কী করে?

গোবর্ধনের মুখে অনেকক্ষণ কথা সরে নাই। সে সভয়ে চাপা গলায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, মরে গেছে নাকি ছোটবাবু?

মরে গেছে। বাজ পড়েছিল।

আহা চুলগুলো বেবাক জ্বলে গেছে গো!

হারুর বদলে আর কেহ হইলে, যে মানুষটা মরিয়া গিয়াছে তাহার চুলের জন্য গোবর্ধনকে শোক করিতে শুনিয়া শশীর হয়তো হাসি আসিত। কিন্তু গ্রামের বাহিরে হারুকে এ অবস্থায় আবিষ্কার করিয়া তাহার মনে অত্যন্ত আঘাত লাগিয়াছিল। হারুর ছেলেমেয়ে আছে, আত্মীয়বন্ধু আছে, সকলের চোখের আড়ালে একটা গাছের নিচে ওর একা-একা মরিয়া যাওয়া কী শোচনীয় দুর্ঘটনা! গোবর্ধনের কথায় তাহার মন আরও বিষন্ন হইয়া গেল।

গোবর্ধনের বুকের মধ্যে টিপচিপ করিতেছিল!

এখানে দাঁড়িয়ে থেকে আর কী হবে ছোটবাবু? গায়ে খপর দি গে চলো।

এমনিভাবে ফেলে রেখে চলে যাব গোবর্ধন?

তার আর করছ কী?

গাঁ থেকে লোকজন নিয়ে ফিরতে ফিরতে শেয়াল যদি টানাটানি আরম্ভ করে দেয়?

গোবর্ধন শিহরিয়া বলিয়াছিল, তবে কী করবে ছোটবাবু?

হাঁক তো, কেউ যদি আসে।

কিন্তু এই বাদল-সন্ধ্যায় আশেপাশে কে আছে যে হাঁকিয়ে ছুটিয়া আসিবে? নিজের হাঁক শুনিয়া গোবর্ধন নিজেই চমকাইয়া উঠিয়াছিল। আর কোনো ফল হয় নাই। রসুলপুরের হাটের দিন খালে অনেক নৌকা চলাচল করে; আজ কতক্ষণে আর-একটি নৌকার দেখা মিলিবে, একেবারে মিলিবে কী না, তাহারও কিছু স্থিরতা নাই।

হারুকে নৌকায় নামাইয়া লওয়ার কথাটা তখন শশীর মনে হয়।

নৌকা খুলিবামাত্র স্রোতের টানে গতিলাভ করিল। গলুই-এর উপর দাঁড়াইয়া লগিটা ঝপ করিয়া জলের মধ্যে ফেলিয়া গোবর্ধন হঠাৎ ঔৎসুক্যের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিল, একটা কথা কও ছোটবাবু। উহার মুক্তি নাই তো?

শশী হাল ধরিয়া বসিয়াছিল। হাই তুলিয়া বলিল, কি জানি গোবর্ধন, জানি না।

তাহার হাই তোলাকে বিরক্তির লক্ষণ মনে করিয়া গোবর্ধন আর কিছু বলিতে সাহস পাইল না।

শশী বিরক্ত হয় নাই, অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছিল। হারুর মরণের সংস্রবে অকস্মাৎ আসিয়া পড়িয়া শশীর কম দুঃখ হয় নাই। কিন্তু তার চেয়েও গভীরভাবে নাড়া খাইয়াছিল জীবনের প্রতি তাহার মমতা। মৃত্যু এক-এক জনকে এক-এক ভাবে বিচলিত করে। আত্মীয় পরের মৃত্যুতে যাহারা মর-মানবের জন্য শোক করে, শশী তাহদের মতো নয়। একজনকে মরিতে দেখিলে তাহার মনে পড়িয়া যায় না সকলেই একদিন মরিবে,-চেনা-অচেনা আপন-পর যে যেখানে আছে প্রত্যেকে-এবং সে নিজেও। শ্মশানে শশীর শ্মশান-বৈরাগ্য আসে না। জীবনটা সহসা তাহার কাছে অতি কাম্য উপভোগ্য বলিয়া মনে হয়। মনে হয়,

এমন একটা জীবনকে সে যেন এতকাল ঠিকভাবে ব্যবহার করে নাই। মৃত্যু পর্যন্ত অন্যমনস্ক বঁচিয়া থাকার মধ্যে জীবনের অনেক কিছুই যেন তাহার অপচয়িত হইয়া যাইবে। শুধু তাহার নয়, সকলের। জীবনের এই ক্ষতি প্রতিকারহীন।

মৃত্যুর সান্নিধ্য এইভাবে এইদিক দিয়া শশীকে ব্যথিত করে।

কিছুদূর সোজা গিয়া গাওদিয়ার প্রান্তভাগ ছুঁইয়া খাল পুবে দিক পরিবর্তন করিয়াছে। বাঁকের মুখে গ্রামের ঘাট। গাওদিয়া ছোট গ্রাম। ব্যবসা-বাণিজ্যের ধার বিশেষ ধারে না। ঘাটও আর কিছুই নয়, কোদাল দিয়া কয়েকটি ধাপ কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে মাত্র ঘাটের উপরে একটা টিনের চালা আছে। পাটের সময় সেখানে পাট জমাইয়া বাজিতপুরে শশীর ভগ্নিপতি নন্দলালের গুদামে চালান দেওয়া হয়। তিন চার ক্ষেপ চালান গেলেই গাওদিয়ার পাট চালানের পাঠ ওঠে। তারপর সারা বছর চালাটা পড়িয়া থাকে খালি। গোরু, ছাগল, মানুষ—যাহার খুশি ব্যবহার করে, কেহ বারণ করিতে আসে না। চালার সামনেই চণ্ডীর মার ছেলে চণ্ডী সারাদিন একটা কাঠের বাক্সের উপর কয়েক প্যাকেট লাল-নীল কাগজ মোড়া বিড়ি ও রেকাবিতে ভিজা ন্যাকড়ায় ঢাকা কয়েক খিলি পান সাজাইয়া বসিয়া থাকে।

ঘাটে কয়েকটি ছোট বড় নৌকা বাঁধা ছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে একটিতেও এখন না আছে আলো, না আছে মানুষ।

গোবর্ধনের মনে ভয় ছিল, তাহাকে নৌকায় পাহারা রাখিয়া শশী হয়তো নিজেই গ্রামে যাইতে চাইবে। ঘাটে নৌকা বাঁধিয়াই সে তাই বলিল, আমি তা হলে গাঁয়ে খপর দিগে ছোটবাবু?

শশী বলিল, যা। পা চালিয়ে যাস গোবর্ধন। আগে যাবি গোয়ালা পাড়ায়। নিতাই, সুদেব, বংশী-ওরা সবাই যেন ছুটে চলে আসে। বলিস, আমি অন্ধকারে মড়া আগলে বসে রইলাম। আলোটা তুই নিয়ে যা, যেতে যেতে ঘুরঘুটি অন্ধকার হবে। পিছল রাস্তা।

আলো লইয়া গোবর্ধন চলিয়া গেল। এতক্ষণে সন্ধ্যা হইয়াছে। আকাশ খুঁজিলে হয়তো এখনো একটু ধূসর আভা চোখে পড়ে কিন্তু অন্ধকার দ্রুত গাঢ় হইয়া আসিতেছে। শশী ভাবিল, আর পনেরো-বিশ মিনিট দেরি করিয়া বটগাছটার কাছে পৌঁছিলে হারুকে সে ঠাহর করিতে পারিত না। খাল দিয়া যাতায়াত করিবার সময় ভূত ও সাপের রাজ্যটির দিকে সে বরাবর চোখ তুলিয়া তাকায়। আজও তাকাইত। কিন্তু হারুকে তাহার মনে হইত গাছের গুড়িরই একটা অংশ। হয়তো মানুষের আকৃতির সঙ্গে গাছের অংশটির সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া আর হারুর পরনের কাপড়ের শ্বেতাভ রহস্যটুকুর মানে না বুঝিয়া তাহার একটু শিহরন জাগিত মাত্র। হারু ওইভাবে পড়িয়া থাকিত। কতদিন পরে শিয়ালের দাঁত ও শকুনির চঞ্চুতে সাফ-করা তাহার হাড় কয়খনি মানুষ আবিষ্কার করিত কে জানে! পঞ্চুকে চণ্ডীর-মা যেমন আবিষ্কার করিয়াছিল। সর্বাঙ্গে খাবলা খাবলা পচা মাংস, কোথাও হাড় বাহির হইয়া পড়িয়াছে। দুই হাতের মুঠার মধ্যে প্রকাণ্ড খরিস সাপটা শুকাইয়া হইয়া আছে একেবারে দড়ি।

স্রোতের বেগে নৌকা মৃদু মৃদু দুলিতেছিল। নৌকার গলুইএ সে দোলন একটা জীবন্ত প্রাণের অস্থিরতার মতো পৌঁছিতেছে। নড়িয়া চড়িয়া শশী একসময় সোজা হইয়া বসে। মনে একটা বিড়ি ধরাইবার ইচ্ছা জাগিতেছিল। কিন্তু সেটুকু উৎসাহও সে যেন পায় না। তাহার চোখের সামনে চারিদিক ক্রমে গাঢ় অন্ধকারে ঢাকিয়া যায়। তীরের গাছগুলি জমাটবাধা অন্ধকারের রূপ নেয়, জলের উপর জনহীন নৌকা কখানা হালকা ছায়ার মতো আলগোছে ভাসিতে থাকে। মাথার উপর দিয়া অদৃশ্যপ্রায় কতগুলি পাখি সাঁ-সাঁ শব্দ করিয়া উড়িয়া যায়। চারিদিকে জোনাকি ঝিকমিক করিতে আরম্ভ করে।

এত কাছেও হারুর মুখ ঝাপসা হইয়া যায়। তাহার মুখখানা ভালো করিয়া দেখিবার চেষ্টায় ব্যর্থ হইয়া সে যে মরিয়া গিয়াছে এই সত্যটা শশী যেন আবার নূতন করিয়া অনুভব করে। ভাবে, মরিবার সময় হারু কী ভাবিতেছিল কে জানে! কোন্ কল্পনা কোন অনুভূতির মাঝখানে তাহার হঠাৎ ছেদ পড়িয়ছিল?

মেয়ের জন্য পাত্র দেখিতে হারু বাজিতপুরে গিয়াছিল এটা শশী জানিত। পথ সংক্ষেপ করিবার জন্য ওই বিপথে সে পাড়ি জমাইয়াছিল। পথ তাহার সংক্ষিপ্তই হইয়া গেল। পাড়িও জমিল ভালোই।

ঘণ্টাদুই পরে গোটা তিনেক লণ্ঠন সঙ্গে করিয়া হারুর সাত-আট জন স্বজাতি আসিয়া পড়িল। নিস্তব্ধ ঘাটটি মুহূর্তে হইয়া উঠিল মুখরিত।

শশী সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল, নিতাই এসেছে, নিতাই?

নিতাই সাড়া দিল—আজ্ঞে, এই যে আমি ছোটবাবু।

নিতাইয়ের দায়িত্বজ্ঞান প্রসিদ্ধ। শশী আনেকটা ভরসা পাইল।

হারুর বাড়িতে খবর দেওয়া হয়েছে নিতাই?

হয়েছে ছোটবাবু।

আলো উঁচু করিয়া ধরিয়া সকলে তাহারা ভিড় করিয়া হারুকে দেখিতে লাগিল। গোবর্ধনের কাছে ব্যাপারটা আগাগোড়া শুনিয়াছিল। শশীর কাছে আর একবার শুনিল।

তারপর ঘাটের খাঁজের উপর উবু হইয়া বসিয়া আরম্ভ করিয়া দিল জটলা।

কিছুক্ষণের মধ্যে শশীর মনে হইল, হারুর পরলোক-গমন ওদের কথার মধ্যেই এতক্ষণে শোচনীয় হইয়া উঠিতেছে। বর্ষণক্ষান্ত বিষন্ন রাত্রে কালিপড়া লণ্ঠনের মৃদু রঙিন আলোয় হারুর জীবনের টুকরো-টুকরো ঘটনাগুলি যেন দৃশ্যমান ছায়াছবির রূপ গ্রহণ করিয়া চোখের সামনে ভাসিয়া আসিতে লাগিল। হারুর পরিবারের ক্ষতি ও বেদনার প্রকৃতি উপলব্ধি যেন এতক্ষণে শশী আয়ত্ত করিতে পারিল। সে বুঝিতে পারিল, সংসারে হারু যে কতখানি স্থান শূন্য রাখিয়া গিয়াছে-এই অশিক্ষিত মানুষগুলির মনের মাপকাঠি দিয়াই তাহার পরিমাণ সম্ভব। এতক্ষণ হারুর অপমৃত্যুকে সে বুঝিতে পারে নাই। হারুকে সে

আপনার জগতে তুলিয়া লাইয়াছিল। সেখানে শূন্য করিয়া রাখিয়া যাওয়ার মতো স্থান হারু কোনোদিন অধিকার করিয়া ছিল কি না সন্দেহ।

নীরবে শশী অনেক্ষণ তাহাদের আলোচনা কান পাতিয়া শুনিল। শেষে রাত বাড়িয়া যাইতেছে খেয়াল করিয়া বলিল, তোমরা তাহলে আর বসে থেক না নিতাই। রসিকবাবুর বাগান থেকে বাঁশ কেটে এলে একটা মাচা বেঁধে ফেল।

নিতাই প্রশ্ন করিল, সোজা মশানবিলে নিয়ে যাব কি ছোটবাবু?

শশী বলিল, না। ওর বাড়িতে একবার নামাতে হবে।

হারুকে সোজাসুজি শ্মশানে লইয়া গেলে অনেক হাঙ্গামা কমিত। কিন্তু হারুর মেয়ে মতির জ্বর। সকালে শ্মশানে আসিলেও সে আসিতে পারবে না। তাহাকে একবার না দেখাইয়া হারুকে পোড়াইয়া ফেলিবার কথাটা শশী ভাবিতেও পারিতেছিল না। মতির কাছে খবরটা এখন কয়েক দিনের জন্য চাপিয়া যাওয়ার বুদ্ধিও বাড়ির কাহারও হইবে কি না সন্দেহ। মতি জানিতে পরিবে তাহারই জন্য বর খুঁজিতে গিয়া ফিরিবার পথে হারু অপঘাতে প্রাণ দিয়াছে। জ্বর গায়ে এই বর্ষার রাত্রে হয়তো সে শ্মশানে ছুটিয়া আসিবে। জোর করিয়া বাড়িতে আটকাইয়া রাখিলে আর সকলকেই হয়তো সে ক্ষমা করিবে, নিয়তিকে পর্যন্ত, কিন্তু শশীকে সে সহজে মার্জনা করিবে না। বলিবে, আপনি থাকতে আমাকে একটিবার না দেখিয়ে বাবাকে ওরা পুড়িয়ে ফেলেছিল গো!

রসিকবাবুর বাগান হইতে বাঁশ কাটিয়া আনিয়া মাচা বাঁধা হইল। তারপর হারুকে মাচায় শোয়াইয়া হরিবোল দিয়া মাচাটা তাহারা কাঁধে তুলিয়া লইল।

শশী কহিল, এখন তোমরা হরিবোল দিও না। হারু শ্মশান-যাত্রা করেনি, বাড়ি যাচ্ছে।

কথাটা এমন করিয়া শশী ইচ্ছা করিয়া বলে নাই। নিজের কথায় নিজেরই চোখদুটি তাহার সজল হইয়া উঠিল।

রাস্তাটি চওড়া মন্দ নয়, কিন্তু কাঁচা। বর্ষাকালে কোথাও একহাঁটু কাদা হয়, কোথাও এঁটেল মাটিতে বিপজ্জনক রকমের পিছল হইয়া থাকে। গোরুর গাড়ির চাকাতেই রাস্তাটির সর্বনাশ করে সবচেয়ে বেশি। বর্ষার পর কাদা শুকাইয়া মনে হয় আগাগোড়া যেন লাঙল দিয়া চষিয়া ফেলা হইয়াছে। শীত পড়িতে পড়িতে পথটি আবার সমতল হইয়া যায় সত্য, কিন্তু লক্ষ লক্ষ ক্ষতের উঁচু সীমানগুলি গুড়া হইয়া এত ধুলা হয় যে পায়ের পাতা ডুবিয়া যায়। ফাল্গুন-চৈত্র মাসে বাতাসে ধুলা উড়িয়া দুপাশের গাছগুলিকে বিবর্ণ করিয়া দেয়।

গ্রামে ঢুকিবার আগে খালের সঙ্গে সংযুক্ত নালার উপর একটি পুল পড়ে। পুলের নিচে স্রোতের মুখে জালি পাতিয়া নবীন মাঝি সেই অপরাহ্ণ হইতে বুকজলে দাঁড়াইয়া আছে।

নিতাই ডাকিয়া বলে, কী মাছ পড়ল মাঝি?

নবীন বলে, মাছ কোথা ঘোষ মশাই? জল বড় বেশি গো!

মাগুরটাগুর পেলি নবীন? পেলে আমাকে একটা দিস। ছেলেটা কাল পথ্যি করবে।

নবীন মিথ্যা জবাব দেয়। বলে, জলে দেঁড়িয়ে কি মিছা কথা কইছি। এত জলে মাছ পড়ে না। ইদিকে তিন হাত ফাঁক রইছে দেখছ নি?

হারুর মরণের খবরটা সে শান্তভাবে গ্রহণ করে।

বলে, লোক বড় ভালো ছিল গো। জগতে শত্তুর নেই।

তারপর বলে, ই বছর, জান ঘোষ মশায়, অদৃষ্ট সবার মন্দ। তিন বর্ষা নাবল না, এর মধ্যে জল কামড়াতে নেগেছে।

দিন নাই রাত্রি নাই, জলে স্থলে নবীনের কঠোর জীবনসংগ্রাম। দেহের সঙ্গে মনও তাহার হাজিয়া গিয়াছে। হারুর অপমৃত্যুতে বিচলিত হওয়ার সময় তাহার নাই।

অথচ এদিকে মমতাও জানে। দশবছরের ছেলেটা বিকাল হইতে পুলের উপর ঠায় দাঁড়াইয়া আছে। জলে নামিয়া বাপের মতো সেও মাছ ধরিতে চায়। কিন্তু নবীন কোনোমতে অনুমতি দিবে না।

রেতে লয় বাপ, জ্বর হবে। কাল বিহানে আসিস।

বিহানে জল রইবে নি বাবা।

হু, রইবে নি আবার! তোর ডুবজল হবে, জনিস্।

পুল পার হইয়া কিছুদূর অবধি রাস্তার দুপাশে শুধু চষা ক্ষেত। তারপর গ্রাম আরম্ভ হইয়াছে। এদিকে বসতি কম। রাস্তার দক্ষিণে ঝোপঝাপের বেষ্টনীর মধ্য পৃথক কয়েকটা ভাঙাচোরা ঘর বৃষ্টিতে ঘর-বাইরে ভিজিয়াছে। ওখানে সাত ঘর বাগদী বাস করে গ্রামের ছেলেমেয়েদের মধ্যে ওরাই সবচেয়ে গরিব, সবচেয়ে ছোটলোক, সবচেয়ে চোর। দিনে ওরা যে-গৃহস্থের চাল মেরামত করে, রাত্রে সুযোগ পাইলে তাহারই ভিটায় সিঁধ দেয়। কেহ-না-কেহ ওদের মধ্যে ছ মাস এক বছর জেলেই পড়িয়া আছে।

ছাড়া পাইবার পর গ্রামে ফিরিয়া বলে, শ্বশুর-ঘর থে ফিরলুম দাদা। বেশ ছিলাম গো!

একটুকু পার হয়ে গেলে বসতি ঘন হইয়া আসে। বাড়িঘরের উন্নত অবস্থা চোখে পড়ে। পথের দুইদিকেই দুটি-একটি শাখা-পথ পাড়ার দিকে বাহির হইয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছে দেখা যায়। মাঝে মাঝে কলাবাগান সুপারিবাগান ও ছোট ছোট বাঁশঝাড় ডাইনে বায়ে আবির্ভূত হয়। আমবাগানকে অন্ধকারে মনে হয় অরণ্য। কোনো কোনো বাড়ির সামনে কামিনী গন্ধরাজ ও জবাফুলের বাগান করিবার ক্ষীণ চেষ্টা চোখে পড়ে। ক্রমে দু একটি পাকা দালানের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। বাড়িগুলি আগাগোড়া দালান নয়, এক ভিটায় দুখানা ঘর হয়তো ইটের, বাকিগুলি শণে ছাওয়া চাচের বেড়ায় গ্রামেরই চিরন্তন নিজস্ব নীড়।

নির্জন স্তব্ধ পথে শববাহী তাহারাই জীবনের সাড়া দিয়া চলিয়াছে। শশীর বিষন্নতা ঘুচিবার নয়। আলো হাতে সকলের আগে আগে সে যাইতেছিল। নিতাই, সুদেব ওরা কথা কহিতেছে সকলেই, কথা নাই কেবল শশীর মুখে। পথের ধারে কোনো বাড়িতে আলো জ্বলিতেছে দেখিলে তাহার ইচ্ছা হয় হাঁক দিয়া বাড়ির লোকের সাড়া নেয়। এক মিনিট দাঁড়াইয়া অকারণে বাড়ির সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করে। তাহার সাড়া পাইয়া কান্নার রোল তুলিবে না এমন একটি পরিবারের খবর না লইয়া হারুর বাড়ির দিকে চলিতে সে যেন জোর পাইতেছিল না।

খানিক আগাইয়া বাজার।

এখানে গ্রাম জমাট বাঁধিয়াছে। দোকানটাটের সংখ্যা কম নয়। কিন্তু বাদলের রাত্রি গভীর হওয়ার আগে সবগুলি দোকানই এখন বন্ধ হইয়া গিয়াছে। রাস্তার বাঁ দিকে একটা ফাঁকা জায়গায় কতকগুলি টিনের চালা। একদিন অন্তর

ওখানে বাজার বসে।

কোথা হইতে এক সন্ন্যাসী আসিয়া একটা চালার নিচে আশ্রয় লইয়াছে। সম্মুখে তাহার ধুনির আগুন। আগুনে সন্ন্যাসী মোটা রুটি সেকিতেছিল। ওদিকের চালাটায় লোম-ওঠা শীর্ণ কুকুরটা থাবায় মুখ রাখিয়া তাহাই দেখিতেছে। শশী তাড়াতাড়ি আগাইয়া গেল। তার পা বারবার জলকাদা-ভরা গর্তে গিয়া পড়িতেছিল! মনের গতির আজ সে ঠিক-ঠিকানা পাইতেছিল না।

শ্রীনাথ দাসের মুদিখানার পাশ দিয়া কায়েত পাড়ার পথটা বাহির হইয়া গিয়াছে। হারুর বাড়ি এই পথের শেষ সীমায়। তারপর আর বাড়িঘর নাই। ক্রোশব্যাপী মাঠ নিঃসাড়ে পড়িয়া আছে!

পথের মোড়ে বকুলগাছটির গোড়া পাকা বাঁধানো। বিকালের দিকে এখানে প্রত্যহ সরকারি আড্ডা বসে। আলোটা ওখানে নামাইয়া রাখিয়া শশী একটা বিড়ি ধরাইল। চাহিয়া দেখিল গাছের নিচে শুকনো ডাল ও কাঁচা-পাকা পাতার সঙ্গে পাতার উপর ন্যাকড়া-জড়ানো একটা পুতুল পড়িয়া আছে। পুতুলটা শশী চিনিতে পারিল। বৈশাখ মাসে বাজিতপুরের মেলায় শ্রীনাথের দোকানে বসিয়া একঘণ্টা বিশ্রাম করার মূল্যস্বরূপ তাহার মেয়েকে পুতুলটা কিনিয়া দিয়াছিল। বিকালে বৃষ্টি থামিলে এখানে খেলিতে আসিয়া শ্রীনাথের মেয়ে পুতুলটা ফেলিয়া গিয়াছে।

রাত্রে পুতুলের শোকে মেয়েটা কাঁদিবে। সকালে বকুলতলা খুঁজিতে আসিয়া দেখিবে পুতুল নাই। পুতুল কে লইয়াছে মেয়েটা তাহা জানিতে পারবে না।

শশী কেবল অনুমান করিতে পারিবে যামিনী কবিরাজের বৌ ভোর ভোর বকুলতলা ঝাঁট দিয়া আসিয়া দেখিতে পাইয়া তুলিয়া লইয়া গিয়াছে।

যামিনী কবিরাজের বৌ চোরও নয় পাগলও নয়; মাটির পুতুলে সে লোভ করে না। কিন্তু প্রণাম করিয়া (যে গাছের তলা বাঁধানো, সেটি দেবধর্মী) মুখ তুলিতেই সামনে অত বড় একটা পুতুল পড়িয়া থাকিতে দেখিলে একথা মনে হওয়ার মধ্যে বিস্ময়ের কী আছে যে এ কাজ দেবতার, এই তাঁহার ইঙ্গিত।

পুতুলটিকে আরও খানিকটা গাছের গোড়ার দিকে ঠেলিয়া দিয়া আলোটা তুলিয়া লইয়া শশী আগাইয়া গেল। বলিল, সাবধানে পা ফেলে চলো নিতাই, আস্তে পা ফেলে চলো। ফেলে দিয়ে হারুকে কাদা মাখিও না যেন। কী রাস্তা!

কায়েতপাড়ার সংকীর্ণ পথটির দুদিকে বাঁশঝাড়ে মশা ভন-ভন করিতেছিল। যামিনী কবিরাজের গোয়ালের পিছনটাতে তিন মাসের জমানো গোবর পচিয়া উঠিয়াছে। ডোবার মধ্যে সারাবছর ধরিয়া গজানো আগাছার জঙ্গল এখন বর্ষার টুবু টুবু জলের তলে হাঁপাইয়া হাপাইয়া বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

খানিক দূর আগাইয়া হারুর বৌ এর মড়াকান্না তাহদের কানে ভাসিয়া আসিল।

২. শশীর চরিত্র

শশীর চরিত্রে দুই সুস্পষ্ট ভাগ আছে। একদিকে তাহার মধ্যে যেমন কল্পনা, ভাবাবেগ ও রসবোধের অভাব নাই, অন্যদিকে তেমনি সাধারণ সাংসারিক বুদ্ধি ও ধনসম্পত্তির প্রতি মমতাও তাহার যথেষ্ট। তাহার কল্পনাময় অংশটুকু গোপন ও মূক। অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে তাহার সঙ্গে না মিশিলে একথা কেহ টের পাইবে না যে তার ভিতরেও জীবনের সৌন্দর্য ও শ্রীহীনতার একটা গভীর সহানুভূতিমূলক বিচার-পদ্ধতি আছে। তাহার বুদ্ধি, সংযম ও হিসাবি প্রকৃতির পরিচয় মানুষ সাধারণত পায়। সংসারে টিকিবার জন্য দরকারি এই গুণগুলির জন্য শশীকে সকলে ভয় ও খাতির করিয়া চলে।

শশীর চরিত্রের এই দিকটা গড়িয়া তুলিয়াছে তাহার বাবা গোপাল দাস।

গোপাল দাসের কারবার লোকে বলে গলায় ছুরি দেওয়া। আসলে সে করে সম্পত্তি কেনাবেচা ও টাকা ধার দেওয়া। অর্থাৎ দালালি ও মহাজনি। শোনা যায়, এককালে সে নাকি বার-তিনেক জীবন্ত মামুষের কেনাবেচার ব্যাপারেও দালালি করিয়াছে–তিনটি বৃদ্ধের বউ জুটাইয়া দেওয়া। সে আজকের কথা নয়। বৃদ্ধ তিনজনের মধ্যে দুজনের মৃত্যু হইয়াছে। এখন যামিনী করিরাজের মরণ হইলেই ব্যাপারটা পুরোপুরি ইতিহাসের গর্ভে তলাইয়া যাইতে পারে। কিন্তু যামিনী কবিরাজের বউ, শশী যাহাকে সেনদিদি বলিয়া ডাকে এবং শশীকে যে অপুত্রবতী রমণী গভীরভাবে স্নেহ করে, স্বামীকে সে এত যত্নে এত সাবধানে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে যে শীঘ্র যামিনী কবিরাজের মরিবার সম্ভাবনা নাই। যামিনী কিন্তু মরিতে চায়। গ্রামের কলঙ্ক রটানোর কাজে উৎসাহী নিষ্কর্মা ব্যক্তির সংখ্যা এত বেশি যে, এতটুকু এদিক ওদিক হইলে গ্রামের বউ-ঝিদের কলঙ্ক দিগদিগন্তে রটিয়া যায়। কেহ বিশ্বাস করে, কেহ করে না। যে বিশ্বাস করে সেও সত্যামিথ্যা যাচাই করে না, যে অবিশ্বাস করে, সেও নয়। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের প্রশ্নটা নির্ভর করে মানুষের খুশির উপর। গ্রামের কলঙ্কিনীদের মধ্যে শশীর সেনদিদির প্রসিদ্ধিই বেশি। গোপালের সঙ্গেই তার নামটা জড়ানো হয় বেশি সময়। লোকে নানা কথা বলাবলি করে। শশী বিশ্বাস করে না।

যামিনী করে। সে খুড়খুড়ে বুড়া। সন্দেহের তীব্র বিষে সে দগ্ধ হইয়া যায়। স্ত্রী পাড়ার কারো বাড়ি গেলে রাগে-দুঃখে এক-একদিন সে কাদিয়াও ফেলে। স্ত্রীর কায়েতবাড়ি কাসুন্দি বানাইয়া আসার কৈফিয়তটা সে বিশ্বাস করে না। অথচ শশীর সেনদিদি সত্য কৈফিয়তই দেয়। অতীতে কখনও সে যদি কোনো অন্যায় করিয়া থাকে, তাহা অতীতের সত্যমিথ্যা পাপপুণ্যে মিশিয়া আছে। উন্মাদ ছাড়া আজ শশীর সেনদিদিকে কেহ অবিশ্বাস করিবে না। বুড়া হইয়া যামিনীর মাথাটা খারাপ হইয়া গিয়াছে।

দেখা হইলে গোপালকে শাপ দেয়। বলে, এক কাঁড়ি টাকা নিয়ে তুই আমার খুব উপকার করেছিলি গোপাল। উচ্ছন্ন যাবি তুই, তোর সর্বনাশ হবে, ঘরবাড়ি তোর শ্মশান হয়ে যাবে!

যামিনী কবিরাজের বউ-এর সম্বন্ধে গোপালের বদনাম হয়তো মিথ্যা তবু লোক গোপাল ভালো নয়। তুচ্ছ কতগুলি টাকার জন্য সে-ই তো প্রতিমার মতো কিশোরীকে বুড়ো, পাগলা যামিনী কবিরাজের বউ করিয়াছিল।

শশীই গোপালের একমাত্র ছেলে, মেয়ে আছে তিনটি। বড়মেয়ের নাম বিন্ধ্যবাসিনী। বড়গার নায়েব শ্যামাচরণ দাসের বড়ছেলে মোহনের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইয়াছে। মোহনের একটা পা খোড়া। মেজমেয়ে বিন্দুবাসিনীর বিবাহ হইয়াছে খাস কলিকাতায় বড়বাজারের নন্দলাল অ্যান্ড কোং-এর নন্দলালের সঙ্গে।

গোপালের সে এক স্মরণীয় কীর্তি।

নন্দলালের কারবার পাটের। চারিদিক হইতে পাট সংগ্রহ করিয়া জমা করিবার সুবিধা হয় এবং চালান দিবার ভালো ব্যবস্থা থাকে এমন একটি মধ্যবর্তী গ্রাম খুঁজিয়া বাহির করিবার উদ্দেশ্যে বছর-সাতেক আগে সে একবার এদিকে আসিয়াছিল। গোপাল তাহাকে ডাকিয়া লইয়া গিয়াছিল নিজের বাড়ি, আদর-যত্ন করিয়াছিল ঘরের লোকের মতো। তারপর কোথা দিয়া কী হইয়া গেল কে জানে,-হয়তো নন্দলালের দোষ ছিল, হয়তো ছিল না,-তিন দিন পরে গোপালের অনুগত গ্রামবাসীরা লাঠি হাতে দাঁড়াইয়া বিন্দুর সঙ্গে নন্দলালের বিবাহ দিয়া দিল। নন্দলালের চাকরটা রাতারাতি বাজিতপুরে পলাইয়াছিল।

পরদিন মনিবের উদ্ধারে সে একেবারে পুলিশ লইয়া হাজির! নন্দলাল ইচ্ছা করিলে কিছু কিছু শাস্তি অনেককেই দিতে পারিত,-গম্ভীর বিষন্ন মুখে পুলিশকে সে-ই বিদায় করিয়া দিল। তারপর বউ লইয়া সেই-যে সে কলিকাতায় গেল,-গাওদিয়ার সঙ্গে আর কোনো সম্পর্ক রাখিল না।

যাই হোক, নন্দলালের কাছে বিন্দুবাসিনী হয়তো সুখেই আছে। গ্রামের লোক সঠিক খবর রাখে না। সাত বছরের মধ্যে বিন্দু একবার মাত্র তিনদিনের জন্য বাপের বাড়ি আসিয়াছিল। গ্রামের ছেলে-বুড়ো তখন ঈর্ষার চোখে চাহিয়া দেখিয়াছিল,–অলঙ্কারে অলঙ্কারে বিন্দুর দেহে তিল ধারণের স্থান নাই, একেবারে যেন বাইজি। তবু, হয়তো বিন্দু সুখে নাই! নন্দর তো বয়স হইয়াছে, আর একটা স্ত্রী তো তাহার আছে, চরিত্রও সম্ভবত তাহার ভালো নয়। গাওদিয়াবাসী যাহাদের বিবাহিত কন্যাগুলি সারি সারি দাঁড়াইয়া চোখের জলে ভাসে, তারা ভাবে, হয়তো বিন্দু সুখে নাই! ভাবিয়া তাহারা তৃপ্তি পায়। কেহ মুখ ফুটিয়া মনের কথা বলিয়াও ফেলে। গোপাল শুনিতে পাইলে অস্ফুট স্বরে বলে লক্ষ্মীছাড়ার দল!

এমনি বাপের শাসনে শশী মানুষ হইয়াছিল। কলিকাতায় মেডিকেল কলেজে পড়িতে যাওয়ার সময় তাহার হৃদয় ছিল সংকীর্ণ, চিন্তাশক্তি ছিল ভোঁতা, রসবোধ ছিল স্থূল। গ্রাম্য গৃহস্থের স্বকেন্দ্রীয় সংকীর্ণ জীবনযাপনের মোটামুটি একটা ছবিই ছিল ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে তাহার কল্পনার সীমা। কলিকাতায় থাকিবার সময় তাহার অনুভূতির জগতে মার্জনা আনিয়া দেয় বই এবং বন্ধু। বন্ধুটির নাম কুমুদ, বাড়ি বরিশালে, লম্বা কালো চেহারা, বেপরোয়া খ্যাপাটে স্বভাব। মাঝে মাঝে কবিতাও কুমুদ লিখিত। কলেজে সে প্রায়ই যাইত না, হোস্টেলে নিজের ঘরে বিছানায় চিত হইয়া শুইয়া যত রাজ্যের ইংরেজি বাঙলা নভেল পড়িত, কথকতার মতো হৃদয়গ্রাহী করিয়া ধর্ম, সমাজ, ঈশ্বর ও নারীর (ষোলো-সতেরো বছরের বালিকাদের) বিরুদ্ধে যা মনে আসিত বলিয়া যাইত আর টাকা ধার করিত শশীর কাছে। শশী প্রথমে মেয়েদের মতোই কুমুদের প্রেমে পড়িয়া গিয়াছিল; ওকে টাকা ধার দিতে পারলে সে যেন বর্তিয়া যাইত। কুমুদ প্রথমে তাহাকে বিশেষ আমল

দিত না, কিন্তু অনেক দুঃখ, অপমান ও অভিমান চুপচাপ সহ্য করিয়া শশী তাহার অন্তরঙ্গতা অর্জন করিয়াছিল।

সেটা তাহার অনুকরণ করার বয়স। এই একটি মাত্র বন্ধুর প্রভাবে শশী একবারে বদলাইয়া গেল। যে দুর্গের মধ্যে গোপাল তাহার মনকে পুরিয়া সিল করিয়া দিয়াছিল, কুমুদ তাহা একেবারে ভাঙিয়া ফেলিতে পারিল না বটে কিন্তু অনেকগুলি জানালা দরজা কাটিয়া দিয়া বাহিরের আলো বাতাস আনিয়া দিল, অন্ধকারের অন্তরাল হইতে মনকে তাহার বাহিরের উদারতায় বাড়াইতে যাইতে শিখাইয়া দিল।

প্রথমটা শশী একটু উদভ্রান্ত হইয়া গেল। মাথা ঘামাইয়া ঘামাইয়া জীবনকে ফেনাইয়া, ফাঁপাইয়া মানুষ এমন বিরাট ব্যাপার করিয়া তুলিয়াছে? জানিবার এত বিষয়, উপভোগ করিবার এত উপায়; বিজ্ঞান ও কাব্য মিশিয়া এমন জটিল, এমন রসালো মানুষের জীবন? তারপর গ্রামে ডাক্তারি করিতে বসিয়া প্রথমে সে যেন হাঁপাইয়া উঠিল। জীবনটা কলিকাতায় যেন বন্ধুর বিবাহের বাজনার মতো বাজিতেছিল, সহসা স্বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এইসব অশিক্ষিত নরনারী, ডোবা পুকুর, বন জঙ্গল মাঠ, বাকি জীবনটা তাহাকে এখানেই কাটাইতে হইবে নাকি? ও ভগবান, একটা লাইব্রেরি পর্যন্ত যে এখানে নাই! ক্রমে ক্রমে শশীর মন শান্ত হইয়াছে। সে তো গ্রামেরই সন্তান, গ্রাম্য নরনারীর মধ্যে গ্রামের মাটি মাখিয়া গ্রামের জলবায়ু শুষিয়া সে বড় হইয়াছে। হৃদয় ও মনের গড়ন আসলে তাহার গ্রাম্য। শহর তাহার মনে যে ছাপ দিয়াছিল তাহা মুছিবার নয়, কিন্তু সে শুধু ছাপ, দাগা নয়। শহরের অভ্যাস যতটা পারে বজায় রাখিয়া বাকিটা সে বিসর্জন করিতে পারিল, কুমুদও বইয়ের কল্যাণে পাওয়া বহু বৃহত্তর আশা-আকাঙ্ক্ষাও ক্রমে ক্রমে সে চিন্তা ও কল্পনাতে পর্যবসিত করিয়া ফেলিতে পারিল।

এ সুদূর পল্লিতে হয়তো সে-বসন্ত কখনও আসিবে না যাহার কোকিল পিয়ানো, সুবাস এসেল, দখিনা ফ্যানের বাতাস। তবু, শশীর মনকে কে বাঁধিয়া রাখিবে? দীর্ঘ জীবন পড়িয়া আছে, পড়িয়া আছে বিপুল পৃথিবী। আজ শশী কামিনীঝোপের পাশে ক্যাম্পচেয়ারে বসিয়া বাঁশঝাড়ের পাতা-কাঁপানো ডোবার গন্ধ ভরা ঝিরঝির বাতাসে

উন্মনা হোক, কোলের উপর ফেলিয়া-রাখা বইখানার দুটি মলাটের মধ্যে কাম্য জীবনটি তাহার আবদ্ধ থাক, একদিন কেয়ারি-করা ফুলবাগানের মাঝখানে বসানো লাল টাইলে ছাওয়া বাংলোয় শশী খাঁচার মধ্যে কেনারি পাখির নাচ দেখিবে, দামি ব্লাউজে ঢাকা বুকখানা শশীর বুকের কাছে স্পন্দিত হইবে,–আলো পান হাসি আনন্দ আভিজাত্য–কিসের অভাব তখন থাকিবে শশীর?

কায়েতপাড়ার পথটি তিন ভাগ অতিক্রম করিয়া গেলে শশীর বাড়ি। হারুর বাড়ি পথের একেবারে শেষে। এই হারু ঘোষ-খালের ধারে বটগাছের তলে যে সেদিন অপরাহ্ণে বজ্রাঘাতে মরিয়া গিয়াছে।

মতির জ্বর কমে নাই। সন্ধ্যার সময় শশী তাহাকে দেখিতে গেল। সারাদিন শশীর সময় ছিল না।

সন্ধ্যার সময় হারুর বাড়িতে প্রদীপ জ্বলে নাই। হারুর বউ মোক্ষদা হারুর ছেলে পরাণের বউ কুসুমের উপর ভারি খাপ্পা হইয়া উঠিয়াছিল। ব্যাপারটা বুঝিয়া দাখো গৃহস্থবাড়ি। সন্ধা আসিয়াছে। বাড়িতে একটা বউ আছে। অথচ সন্ধ্যাদীপ জ্বলে নাই। গলায় গড়ি দিয়া বউটা মরিয়া যায় না কেন?

সে কাপড় ছাড়িল। তারপর জ্বলিতে গেল প্রদীপ। তাহার নির্লজ্জ ধীরতা মোক্ষদাকে একেবারে খেপাইয়া তুলিল। কুসুমের হাত হইতে প্রদীপটা ছিনাইয়া লইয়া রান্নাঘরে গিয়া উনানে পাটখড়ি ধরাইয়া সে প্রদীপ জ্বলিল। তারপর তাড়াতাড়ি পার হইতে গিয়া শুকনো উঠানে সে কেমন করিয়া পড়িয়া গেল কে জানে!

কুসুম হাসিয়া উঠিল সশব্দে। তারপর আঁচলটা কোমরে জড়াইয়া মোক্ষদাকে আড়কোলে শূন্যে তুলিয়া শোবার ঘরের সামনে দাওয়ায় নামাইয়া দিল। তেইশ বছরের বাজা মেয়ে, গায়ে তাহার জোর কম নয়।

কিছুক্ষণ বাড়িতে আর কান পাতা যায় না। মোক্ষদা গলা ফাটাইয়া শাপিতে থাকে। ছেলে-কোলে বুঁচি ব্যাপার জানিতে আসিলে ছেলেটা তাহার জুড়িয়া দেয় কান্না। ওদিকের ঘরে বুঁচির মুমূর্ষ পিসি বিছানায় উঠিয়া বসিয়া আর্তস্বরে বলিতে থাকে কী হল রে? ও বুঁচি, ওলো কুসুম, কী হল রে? হেই ভগবান, কেউ কি সাড়া দেবে!

বড় ঘরের অন্ধকারে মতি শুইয়া ছিল, সেও তাহার ক্ষীণকণ্ঠ যতটা পারে উঁচুতে তুলিয়া ব্যাপার জানিতে চায়।

অবিচলিত থাকে শুধু কুসুম। দাওয়ার নিচে খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়াইয়া সে মোক্ষদার গাল শোনে।

তারপর রান্নাঘর হইতে একটা জ্বলন্ত কাঠ আনিয়া ঢুকিতে যায় শোবার ঘরে।

আঘাতের বেদনা তুলিয়া মোক্ষদা হাউমাউ করিয়া উঠে।

ও কী লো বউ, ও কী? ঘরে-দোরে আগুন দিবি না কি?

আগুন দেব কেন মা? পিলসুজের দীপটা জ্বালব।

উনুনের কাঠ এনে দীপ জ্বালাবি? দ্যাখ বুঁচি, দ্যাখ মেলেচ্ছ হারামজাদি ঘরের মধ্যে চিতা জেলে দিতে চলল, চেয়ে দ্যাখ!

কুসুম চোখ পাকাইয়া বলে, গাল দিও না বলছি অত করে, দিও না। আমপাতা দেখছ না হাতে? কাঠ থেকে যদি দীপ জ্বালাব, পাতা নিয়ে যাচ্ছি কি চিবিয়ে খাব বলে নাকি?

মোক্ষদা গলা নামাইয়া বলে, গাল তোমায় আমি দেইনি বাছা–বুঁচিকে।

কুসুমকে এ বাড়ির সকলে ভয় করে। এই বাস্তুভিটাটুকু ছাড়া হারু ঘোষের সর্বস্ব কুসুমের বাবার কাছে আজ বাধা আছে সাত বছর। একবার গিয়া কাদিয়া পড়িলেই সে দিবে নালিশ কিয়া, এরা সব তখন যাইবে কোথায়? তাই বলিয়া কুসুম যে সবসময় বাড়ির

লোকগুলিকে শাসন করিয়া বেড়ায়, তা নয়। বরং সে অনেকটা নিরীহ সাজিয়াই থাকে। বকবিকি করিলে সবসময় কানেও তোলে না, নিজের মনে ঘরের কাজ করিয়া যায়। কাজ করিতে ভালো না লাগিলে খিড়কির দরজা দিয়া বাহির হইয়া গিয়া তালবনে তালপুকুরের ধারে ভূপতিত তালগাছটার গুঁড়িতে চুপচাপ বসিয়া থাকে।

উনানে ডাল-ভাত একটা কিছু চাপাইয়া হয়তো যায়। বাড়ির লোকে তাহার অনুপস্থিতি টের পায় পোড়া গন্ধে।

মেজাজের কেহ তার হদিস পায় না। কতখানি সে সহ্য করবে, কখন রাগিয়া উঠিবে, আজ পর্যন্ত তাহা ঠিকমতো বুঝিতে না পারিয়া সকলে একটু বিপদগ্রস্ত হইয়া থাকে।

পাড়ার লোক বলে, বউ তোমাদের যেন একটু পাগলাটে, না গো পরাণের মা?

মোক্ষদা বলে, একটু কেন মা, বেশ পাগল-পাগলের বংশ যে। ওর বাপ ছিল না পাগলা হয়ে, দু বছর-শেকল দিয়ে বেঁধে রাখত?

ঘরে ঢুকিয়া কুসুম প্রদীপ জ্বলিল। গাল ফুলাইয়া সবে সে শাখে তিনবার স্কু দেওয়া শেষ করিয়াছে, উঠানে শোনা গেল শশীর গলা।

বিছানার কাছে গিয়া কুসুম বলিল, সন্ধে হতে না-হতে খোঁজ নিতে এসেছে মতি।

মতি কোনো জবাব দিল না। কুসুম আবার বলিল, ওলো মতি, শুনছিস? সন্ধেদীপ জ্বালাতে-না-জ্বালাতে দেখতে এসেছে–দরদ কত?

ভারী জলচৌকিটা অবলীলাক্রমে তুলিয়া লইয়া গিয়া সে দাওয়ায় পাতিয়া দিল। বলিল, জ্বর কমেছে, ঘুমোচ্ছে এখন।

মোক্ষদা বলিল, মতি আবার ঘুমোল বো? এই মাত্তর সাড়া পেলাম যে?

শশী বলিল তোমার শাঁখের শব্দেও মতির ঘুম ভাঙল না পরাণের বউ?–সে জলচৌকিতে বসিল, ঘরের ভিতরে এক নজর চাহিয়া বলিল, পরাণ বিকেলে গিয়ে বলে এল জ্বর নাকি এবেলা খুব বেড়েছে?

কুসুম বলিল, মিথ্যে বলেছে ছোটোবাবু,–একটুতে অস্থির তো? জ্বর কই?

মোক্ষদা বলিল, কী সব বলছ তুমি আবোলতাবোল, যাও না বাছা রান্নাঘরে।

কুসুম বিনা প্রতিবাদে রান্নাঘরে চলিয়া গেল। মুখে কৌতুকের হাসি নাই, গাম্ভীর্যও নাই।

শশী বলিল, সকালে যে ওষুধ পাঠিয়েছিলাম খাওয়ানো হয়নি?

মোক্ষদা বলিল, তা তো জানি না বাবা, দেখি শুধোই মেয়েকে।

রান্নাঘর হইতে কুসুম বলিল, ওষুধ খাওয়ানো হয়েছে গো হয়েছে। চেঁচামেচি করে মেয়েটার ঘুম ভাঙাচ্ছ কেন?

ঘরের ভিতর হইতে ক্ষীণকণ্ঠে মতি বলিল, আমি ওষুধ খাইনি মা।

মোক্ষদা চোখ পাকাইয়া রান্নাঘরের দিকে চাহিয়া বলিল, শুনলে বাবা, দিবি কেমন মিথ্যে কথাগুলি বলে গেল বউ, শুনলে?

শশী একটু হাসিল, কিছু বলিল না। কুসুমের এরকম সরল মিথ্যাভাষণ সে মাঝে মাঝে লক্ষ করিয়াছে। ধরা পড়িবে জানিয়া শুনিয়াই সে যেন এই মিথ্যাকথাগুলি বলে। এ যেন তাহার একধরনের পরিহাস। কালোকে সাদা বলিয়া আড়ালে সে হাসে।

ঘরে গিয়া শশী মতিকে জিজ্ঞাসা করিল, কি, কষ্ট হচ্ছে রে মতি? মতি তাহা জানে মা। সে আন্দাজে বলিল, গা ব্যথা কচ্ছে ছোটোবাবু, তেষ্টা পেয়েছে।

পিসিকে শান্তি করিয়া বুঁচি আসিয়াছিল, বলিল, আজ বড়ো কেশেছে ছোটোবাবু সারাদিন।

কানে নল লাগাইয়া শশী মতির বুকটা পরীক্ষা করিয়া দেখিল। এ পরীক্ষায় মতির বড় লজ্জা করে, বুকের মধ্যে টিপটিপ করিতে থাকে। স্টেথোস্কোপের নল বাহিয়া তাহা । শশীর কানে পৌঁছায়, সে অবাক হইয়া বলে, নিশ্বাস বন্ধ করে থাকতে তোকে কে বলেছে মতি, জোরে জোরে নিশ্বাস নে! –বুঁচি আলোটা উঁচু করিয়া ধরিয়াছে, শশী মতির মুখের দিকে তাকায়।

ভাঙা লণ্ঠনের রাঙা আলোতে মতির রঙ যেন মিশিয়া গিয়াছে।

নিঃশব্দ পদে কুসুম যে কখন পিছনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল!

বুকে ওর হয়েছে কী? এত পরীক্ষে কিসের?

একটু সর্দি বসেছে বলে মনে হচ্ছে পরাণের বউ। গরম তেল মালিশ করে দিও।

কুসুম ভীরুকণ্ঠে বলে, সর্দি ঠিক তো ছোটোবাবু? পরীক্ষের রকম দেখে ভয়ে বুকে কাপন লেগেছে মা, ক্ষয়রোগেই বা ধরল-গুলো মতি, বলিনি তোকে? বলিনি জ্বরগায়ে হাওয়ায় গিয়ে বসিস নে, ঠাণ্ড লেগে মরবি?

শশী বাহিরে গিয়া একটু বসে। মোক্ষদা তখন সবিস্তারে তাহাকে শোনায় তাহার আছাড় খাওয়ার বৃত্তান্ত। বলে, বউ আমাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে বাবা, বউ নিয়ে হয়েছে আমার মরণ।-নিচুগলায় আবোলতাবোল অনেকক্ষণ মোক্ষদা বকে। হারু আজ মরিয়াছে দিনসাতেক, তার কথা উল্লেখ করিয়া সে এখন আর সুর করিয়া কাঁদে না, বারবার শুধু চোখ করে সে কুসুমের,–শুনিয়া মনে হয় সবই বুঝে সত্য বলিতেছে। বুঁচি চুপ করিয়া শোনে, কথাটি বলে না; না দেয় সায়, না করে প্রতিবাদ। আর রান্নাঘরে শশীকে শোনাইয়া কুসুম করে যাত্রার দলের গান, টানা গুনগুনানো সুরে, অস্পষ্ট ভীরু গলায়। সত্য সত্যই পাগল নাকি কুসুম?

তারপর রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া কুসুম কোথায় যায় কে বলিবে।

শশী খানিক পরে বিদায় নেয়। হারুর বাড়ি কায়েতপাড়ার পথটার ঠিক উপরে নয়, দুপাশে বেগুনক্ষেতের মাঝখান দিয়ে হাত তিনেক চওড়া খানিকটা পথ পার হইয়া রাস্তায় পড়িতে হয়।

শশী তাড়াতাড়ি এইটুকু পার হইয়া যাইতেছিল, ডাইনে বেগুনক্ষেতের বেড়ার ওপাশ হইতে কুসুম বলিল, ছোটোবাবু, শুনুন!

শশী অবাক হইয়া বলিল, তুমি ওখানে কী করছ বউ? সাপে কামড়াবে যে?

কুসুম বলিল, সাপে আমাকে কামড়াবে না ছোটোবাবু, আমার অদৃষ্ট মরণ নেই।

শশী হাসিয়া বলিল, কী আবার হল তোমার?

পরাণের বউ বলে যে ডাকলেন আজ? পরাণের বউ বললে, আমার গোসা হয় ছোটোবাবু। পিসি বলত,–বুঁচির ছোট পিসি, ও বছর যে সগ্যে গেল, অমনি গাল তাকে একদিন দিলাম দিলাম–

আমাকেও নাহয় দাও দুটো গাল।

তাই বললাম? হাঁ ছোটোবাবু, তাই বললাম? পূজ্য মানুষ আপনি, আপনাকে পুজো করে আমাদের পুণ্যি হয়–

গড়গড় করিয়া মুখস্থ বুলির মতো একরাশ তোষামোদের কথা কুসুম বলিয়া যায়, শুনিতে মন্দ লাগে না শশীর। কত বছর আজ সে কুসুমের এমনি পাগলামি দেখিতেছে। ওর এইসব খাপছাড়া কথায় ব্যবহারে একটি যেন মিষ্টি ছন্দ আছে।

বাড়ি যাও বউ, ভাত পোড়া লাগবে।

কাল আসবেন ছোটোবাবু মতিকে দেখতে?

আসব। কেমন থাকে সকালে একবার খবর পাঠিও, অ্যাঁ।

রোজ একবার এলেই হয়! জ্বর ভুগছে মেয়েটা, দেখে তো যাওয়া উচিত? কদিন আসেননি বলে বাড়ির সবাই কত কথা বললে ছোটোবাবু। বললেন, শশী আমাদের মস্ত ডাক্তার হয়েছে, না ডাকলে আর আসা হয় না। মতি কী বললে জানেন?–ছোটোবাবুর অহংকার হয়েছে!

শশী আগাইয়া যায়, বলে, আমার কাজ আছে বউ, কাল এসে তোমার মিছে কথা শুনব।

মিছে কথা নয়, সত্যি মিছে নয় ছোটোবাবু!

শশী চলিয়া গেলে অন্ধকারে বেগুনক্ষেতে দাঁড়াইয়া কুসুম একটু হাসিল। সামনে গাছের মাথার কাছে একটু আলো হইয়াছে কুসুম জানে এখানে চাঁদ উঠবে। চাঁদ উঠিবে, চাঁদ উঠিবার আভাস দেখিলে কুসুম যেন শুনিতে পায়।

ভিনদেশী পুরুষ দেখি চাঁদের মতন
লাজরক্ত হইলা কন্যা পরথম যৌবন।

কে সে কিশোরী, ভিনদেশী পুরুষ দেখিয়া যার লজ্জাতুর প্রেম জাগিত? সে কুসুম নয়, হে ভগবান, সে কুসুম নয়।

অন্ধকারে ঠাহর করিয়া দেখিয়া বাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, শশী না? ও বাবা শশী তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছি যে ভুতো যেন কেমন করছে শশী। ওর মা কাদা-কাটা লাগিয়েছেন। তুমি এসে একটিবার দেখে যাও।

তো বাড়ুজ্যে-বাড়ি গেলি শশী, পয়সা-কড়ি দিয়েছে কিছু? দুটো একটা কলের টাকা না দিলে তো বিপদে পড়ি ককা? কত মিথ্যে বলব বাবার কাছে? পয়সাকড়ির ব্যাপার জানেন তো বাঘার, একটি পয়সা এদিকে ওদিকে হবার যো নাই।

বাসুদেব লজ্জা পাইয়া বলেন, শশীর টাকা কালই পৌঁছিয়া দিয়া আসিবেন শশীর বাড়িতে, নিজে যাইবেন। শশী ভাবে, আজ নয় কেন? মুখে সে কিছু বলে না বাসুদেবের বাড়ি কম দূর নয়। শ্রীনাথের দোকান ছাড়াইয়া, রজনী সরকারের পাকা দালানের পাশ দিয়া বামুনপাড়া পর্যন্ত গড়ানো সাপের মতো আঁকাবাঁকা পথের মাঝখান হইতে দক্ষিণদিকে ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়া পায়ে-চলা যে সংকীর্ণ রাস্তাটুকু পোয়াটক গিয়া মাঠের মধ্যে হারাইয়া গিয়াছে, তার শেষাশেষি। কদিন বৃষ্টি হয় নাই, এ বছরের মতো বর্ষা বোধহয় শেষ হইয়াছে পথের কাদা কিন্তু শুকায় নাই। জুতা হাতে করিয়া বাসুদেবের বাড়ি পৌঁছিয়া শশী পা ধুইল। বাসুদেবের ছোটছেলে ভুতোর বয়স বছর-দশেক, সাত-আট দিন আগে গাছের মগড়াল হইতে পড়িয়া গিয়া হাত-পা দুইই ভাঙিয়াছিল। তার পর জ্বরে-বিকারে অজ্ঞান হইয়া জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে আসিয়া পড়িয়াছে। শশী তাহাকে সদর হাসপাতালে পাঠাইতে বলিয়াছিল, এরা রাজি হয় নাই। হাসপাতালের নামে ভুতোর মা ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছিল, ছেলেকে চৌকাঠের বাহিরে নিলে সে বিষ খাইয়া মরিবে। তারপর শশীই প্রাণপণে ভুতোর চিকিৎসা করিতেছে, দিনে দুইবার তিনবার আসে।

ভূতোর শিয়রে তার মা লক্ষ্মমণি মৃদুস্বরে কাঁদিতেছিলেন। বড় দুটি ছেলে, দুটি বিবাহিতা মেয়ে, তিনটি বউ ঘরের মধ্যে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। বড় বৌঁটি বিধবা, ঘোমটা দিয়া ভূতোকে সে বাতাস করিতেছিল। মায়ের পরে এ বাড়িতে দুরন্ত ছেলেটাকে সেই হয়তো ভালোবাসে সকলের চেয়ে বেশি,–চোখ দিয়া তাহার দরদর করিয়া জল পড়িতেছে।

ভুতোর অবস্থা দেখিয়া শশীর মুখ ম্লান হইয়া গেল। ছেলেটা বাঁচিবে না এ সন্দেহ তাহার ছিল; তবু দুপুরবেলা ওকে দেখিয়া গিয়া একটু আশা তাহার হইয়াছিল বইকী। একবেলায় অবস্থাটা যে এরকম দাঁড়াইবে সে তাহা ভাবিতেও পারে নাই। ছেলেটার সর্বাঙ্গে সে জড়াইয়া জড়াইয়া ব্যান্ডেজ বাঁধিয়াছিল। নড়িবার উপায় তাহার নাই, এখন থাকিয়া

থাকিয়া মুখ শুধু বিকৃত করিতেছে। শশীর গলা এমনি মৃদু, এখন আরও মৃদু শোনাইল- একটু আগুন চাই সেঁক দেবার-গরম কাপড় যদি একটুকরো থাকে?

বিধবা বউটি মালসায় আগুন আনিল। একটা আলোয়ান ভাঁজ করিয়া শশীর নির্দেশমতো ভুতোর বুকে সেক দিতে লাগিল। শশী তাহকে একটা ইনজেকশন দিয়া একটু অপেক্ষা করিল। বারবার চোখের ভিতরটা লক্ষ করিয়া দেখিল, নাড়ি টিপিল, তারপর নীরবে উঠিয়া আসিল। সকলে এতক্ষণ শ্বাসরোধ করিয়া ছিল, শশীর উঠিয়া আসার ইঙ্গিতে ঘরে তাহাদের সমবেত কান্না একেবারে ভাঙিয়া পড়িল।

বিধবা বউটি পাগলের মতো ছুটিয়া আসিয়া শশীর পথ রোধ করিয়া বলিল, না, তুমি যেতে পাবে না শশী, আমার ভূতোকে বাঁচিয়ে যাও! যাও আমার ভূতোকে বাঁচিয়ে? ও যে আমার জন্যে জাম আনতে পাছে উঠেছিল শশী!

শশী কী বলিবে? সে গম্ভীর হইয়া থাকে। তারপর পথ পাইলে বাহির হইয়া যায়। জুতা হাতে করিয়া সে নামিয়া যায় পথে। পায়ে-চলা পথটির শেষেও সে কান্নার শব্দ শুনিতে পায়।

শ্রীনাথ দাশের মুদি দোকানের সামনে বাঁশের তৈরি বেঞ্চিতে বসিয়া কয়েকজন জটলা করিতেছিল। বোধ হয় গল্পে মশগুল থাকায় বাসুদেবের সঙ্গে যাওয়ার সময় শশীকে তাহারা দেখিতে পায় নাই। এবার শ্রীনাথ দেখিতে পাইয়া ডাকিয়া বলিল, একটু বসে যান ছোটোবাবু,-টুলটা ছাড় দেখি নিয়োগীমশায়, ছোটোবাবুকে বসতে চাও।

পঞ্চানন চক্রবর্তী জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় গিয়েছিলে শশী?

শশী বলিল, বাসুদেব বাড়ুজ্যের বাড়ি, ভূতো এইমাত্র মারা গেল।

বটে? বাঁচল না বুঝি ছেলেটা? তবে তোমাকে বলি শোনো শশী, ভুতো যেদিন পড়ল আছাড় খেয়ে, দিনটা ছিল বিযুযদবার। খবর পেয়ে মনে কেমন খটকা বাধল। বাড়ি গিয়ে দেখলাম পাঁজি–যা ভবেছিলাম। ছেলেটাও পড়েছে, বারবেলাও হয়েছে খতম্! লোকে বলে বারবেলা, বারবেলা কী সবটাই সর্বনেশে বাপু? বিপদ যত ওই খতম হবার বেলা। বারবেলা যখন ছাড়ছে, পায়ে কাঁটাটি ফুটলে দুনিয়ে উঠে অক্কা পাইয়ে দেবে।--নবীন জেলের বড়ো ছেলেটাকে সেবারে কুমিরে নিলে, সেদিনও বিষ্ণুদবার, সেবারও ছেলেটা খালে নামল, বারবেলাও অমনি ছেড়ে গেল–গাওদিয়ার খালে নইলে কুমির আসে?

খালের কুমির শুধু নয়, ভূতোর কথার ভূতের কথাও আসিয়া পড়িল। তার পর বাজারের সন্ন্যাসী, বাজারদর, একাল-সেকালের পার্থক্য, নারীহরণ, পূর্ণ তালুকদারের মেয়ের কলঙ্ক, বিদেশবাসী গাঁয়ের বড়ো চাকুরে সুজন দাস, এই সব আলোচনা। শশী কি এত উঁচুতে উঠিয়া গিয়াছে যে এইসব গ্রাম্য প্রসঙ্গে তাহার মন বসিল না, শান্ত অবহেলার সঙ্গে নীরবে শুনিয়া গেল? তা তো নয়। শুধু আধখানা মন দিয়া সে ভাবিড়েছিল, এতগুলি মানুষের মনে মনে কী আশ্চর্য মিল। কারো স্বাতন্ত্রা নাই, মৌলিকতা নাই, মনের তারগুলি এক সুরে বাঁধা। সুখ-দুঃখ এক, রসানুভূতি এক, ভয় ও কুসংস্কার এক হীনতা ও উদারতার হিসেবে কেউ কারও চেয়ে এতোটুকু ছোট বা বড় নয়। পঞ্চানন জমিদার সরকারের মুহুরি, কীর্তি নিয়োগী, পেনশনপ্রাপ্ত হেডপিয়ন, শিবনারায়ণ গায়ের বাঙলা স্কুলের মাস্টার, গুরুগতির চাষ-আবাদ-ব্যবসা ইহাদের পৃথক,-মনগুলি এক ধাঁচে গড়িয়া উঠিল কী করিয়া? স্বতন্ত্র মনে হয় শুধু ভুজঙ্গধরকে, বাজিতপুরে সি ছিল এক উকিলের মুহুরি, টাকার গোলমালে দুবছর জেল খাঁটিয়া আসিয়াছে। বেশি কথা ভূজঙ্গধর বলে না, ছোট ছোট কুটিল চোখের চাহনি চঞ্চলভাবে । এদিক-ওদিক ঘুরিয়া বেড়ায়, মনে হয় কী যেন সে মতলব আঁটিতেছে, গোপন ও গভীর। কীর্তি নিয়োগীর মাথা জুড়িয়া চকচকে টাক, এতদিন পিয়নের হলদে পাগড়িতে ঢাকা থাকিত, এখন টাকের উপর আলুর মতো বড় আবটি দেখিয়া হাসি পায়। ইহার প্রতি শ্রীনাথের শ্রদ্ধা গভীর, কেন সেকথা কেহ জানে না। কীর্তির কথাগুলি শ্রীনাথ যেন গিলিতে থাকে। কীর্তি একটি পয়সা বাহির করিয়া । বলে ও ছিদাম, সাবু দিও দিকি এক পয়সার। শ্রীনাথ এক পয়সার যতটা সাগু কাগজে

মুড়িয়া তাহকে দেয় তাহ দেখিয়া সকলে যেন ঈর্ষ বোধ করে, ভূজলধরের সাপের মতো চোখদুটিতে কয়েকবার পলক পড়ে না। উপরে ঝোলানো কেরোসিনের আলোটাতে শ্রীনাথের দোকানে আলো মস্ত হয় না, দোকানের সাজানো জিনিসগুলিতে যেন একটি লক্ষ্মীশ্রী ছড়ানো থাকে। ছোট ছোট চৌকা কাঠের খোপে চাল, ডাল, একটা ময়দার বস্তা, বারকোশ বসানো তেলের গাদমাখা পাত্র, মুড়ি-মুড়কির দুটি জালা, হরিণের ছবি আটা দেশলাই এর প্যাক, একদিকে কাঁচ বসানো হলদে টিনে সাগু-বালি গোল গোল লজেন্স,- ভুজঙ্গধর চারিদিকে চোখ বুলায়, শ্রীনাথের বসিবার ও পয়সা রাখিবার চৌকো ছোট চোকিটি ভালো করিয়া দেখিবার ভূমিকার মতো। সামনে পথ দিয়া আলো হাতে কেহ ছুটিয়া যায়, কেহ যায় বিনা আলোতে, শ্রীনাথের একটি দুটি খদের আসে। উপস্থিত একজন খদেরকে সে ভূতোর মৃত্যুসংবাদ শোনায়। –না, যে । বিষয়েই আলোচনা চলুক ভূতোর কথাটা তাহারা ভোলে নাই।

শশী উঠি-উঠি করিতেছিল, এমন সময় সকলকে অল্পবিস্তর অবাক করিয়া এক হাতে ক্যাম্বিশের ব্যাগ, এক হাতে লাঠি, বগলে ছাতি, পায়ে চটি, গায়ে উড়ানি যাদব পণ্ডিত পথ হইতে শ্রীনাথের দোকানের সামনে উঠিয়া আসিলেন। মানুষ বুড়া, শরীরটা শীর্ণ, কিন্তু হাড় কখানা মজবুত।

বিদ্যা যাদবের বেশি নয়, পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতিও তাহার নাই, ধার্মিক ও অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বলিয়াই তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। গৃহস্থ যোগী তিনি, সংসারী সাধক। স্পর্শ করিবার অধিকার যাহাদের আছে, দেখা হইলে পায়ের ধুলা নেয়, অপরে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করে। সাধনপথের কতকগুলি স্তর যাদব অতিক্রম করিয়াছেন কেহ জানে না; ভক্তি যাদের উচ্ছসিত, তারা সোজাসুজি সিদ্ধি লাভের কথাটাই বলে। যাবদ নিজে কিছু স্বীকার করেন না, প্রতিবাদও করেন না। কায়েতপাড়ার পথের ধারে, যামিনী কবিরাজের বাড়ি ও শশীদের বাড়ির মাঝামাঝি একটি ছোট একতলা বাড়িতে যাদব বাস করেন। এত পুরাতন, এমন জীর্ণ বাড়ি এ-অঞ্চলে আর নাই। বাড়ির খানিকটা অংশ ভাঙিয়া পড়িয়াছে। এককালে চারিদিকে বোধহয় প্রাচীর ছিল। এখন ছড়ানো পড়িয়া আছে শ্যাওলাধরা কালো

ইট। যাদব বাস না করিলে বাড়িটা অনেক দিন আগেই ভূতের বাড়ি বলিয়া খ্যাতিলাভ করিত। স্ত্রী ছাড়া সংসারে যাদবের কেহ নাই। পাগলাটে স্বভাবের জন্য গ্রামের ছেলে-বুড়ো যাদবের স্ত্রীকে পাগলদিদি বলিয়া ডাকে।

কয়েক দিন আগে যাদব কলিকাতায় গিয়াছিলেন। আজ তাহার ফিরিবার কথা নয়। সকলে শশব্যস্তে প্রণাম করিয়া বসিতে দিল। পঞ্চানন জিজ্ঞাস করিল, হঠাৎ ফিরে এলেন পণ্ডিত মশায়?

যাদব বলিলেন, গেঁয়ো মানুষ, শহরে মন টিকল না বাবা।

শ্রীনাথ উচ্ছ্বসিতভাবে বলিল, আপনারও মন টেকাটেকি দেবতা!

একথায় যাদব হাসিলেন। উচ্ছ্বসিত ভক্তিকে গ্রহণ করিবার পদ্ধতি তাহার এই ! একে একে সকলের তিনি কুশল প্রশন করিলেন। ভূতোর মৃত্যুসংবাদে দুঃখিত হইয়া বলিলেন, আহা! কিন্তু বিশেষ বিচলিত হইলেন না। জীবন-মরণ যাহার নিকট সমান, দুরন্ত একটা বালকের মৃত্যুতে বিচলিত হওয়ার কথাও তার নয়। তবু শশীর মনে হইল সাধারণভাৰে আরও একটু ব্যথিত হওয়া যাদবের যেন উচিত ছিল! কানে না শুনিতে পান, একটা পরিবারে এখন যে বুকভাঙা হাহাকার উঠিয়াছে, যাদবের কি সে কল্পনা নাই! মিনিট দশেক বসিয়া যাদব উঠিলেন। বলিলেন, যাবে নাকি শশী বাড়ির দিকে?

শশী বলিল, চলুন।

লাঠি ঠুকিয়া যাদব পথ চলেন। শশী জানে এত জোরে লাঠির শব্দ করা সাপের জন্য মরিতে যাদব কি ভয় পান,-জীবন-মৃত্যু যার কাছে সমান হইয়া গিয়াছে? অথবা শুধু সাপের কামড়ে মরিতে তাঁর ভয়!

চলিতে চলিতে যাদব বলিলেন, তুমি তো ডাক্তার মানুষ শশী, চরক সুশ্রুত ছেড়ে বিলাতি বিদ্যে ধরেছে, কেটে ছিঁড়ে গা ফুঁড়ে মরা মানুষ বাঁচাও,-ব্যাপারটা কী বলো দেখি তোমাদের? সত্যি সত্যি কিছু আছে না কি তোমাদের চিকিৎসাশাস্ত্রে?

শশী বলল, আজ্ঞে আছে বইকী পণ্ডিত মশায়,-কারো একার খেয়ালে তো ডাক্তারিশাস্ত্র হয়নি। হাজার হাজার বৈজ্ঞানিক সারাজীবন পরীক্ষা করে করে সব আবিষ্কার করেছেন, নইলে জগৎসুদ্ধ লোক–

যাদব বললেন, সূর্যবিজ্ঞান না জানা সব বৈজ্ঞানিক তো? আদিজ্ঞান যার নেই পরবর্তী জ্ঞান সে পাবে কোথায় শশী? যেমন তোমরা সব একালের ডাক্তার, তেমনি সব কবিরাজ-দৃষ্টিহীন অন্ধ সব। গাছের পাতার রস নিংড়ে ওষুধ করলে, গাছের পাতায় ওষুধের গুণ এল কোথা থেকে? সূর্যবিজ্ঞান যে জানে সে শেকড়পাতা খোঁজে না শশী, একখানা আতশি কাঁচের জোরে সূর্যরশ্মিকে তেজস্কর ওষুদে পরিণত করে রগীর দেহে নিক্ষেপ করে,-মুহূর্তে নিরাময়। মোটা মোটা বই পড়ে ছুরি কাঁচি চালাতে শিখে কী হয়?

মনে মনে শশী রাগে। গ্রাম্য মনের অপরিত্যাজ্য সংস্কারে সেও যাদবকে ভক্তি কম করে না, তাই সায় না দিলেও তর্ক সে করিতে পারে না। বাড়ির সামনে আসিয়া যাদব বলেন, কলিকাতা থেকে আঙুর এনেছি, দুটি খেয়ে যাও শশী-মুখে বিরুদ্ধ সমালোচনা করিলেও শশীকে যাদব কি স্নেহ করেন, স্নেহ ও বিদ্বেষ যার আছে সমান শশী বলিতে পারে না আঙুর খাওয়ার শখ তাহার নাই। যাদবের সঙ্গে ভিতরে যায়।

ডাইনে বাড়ির ভাঙা অংশের স্তুপ, তার পিছনে সাহাদের দশবছরের পরিত্যক্ত ভিটা। ভারী কাষ্ঠের জীর্ণ কপাটে যাদব লাঠি ঠোকেন। ভিতর হইতে সাড়া লইয়া পাগলদিদি দরজা খুলিয়া বলেন, আজ ফিরলে কেন গো? শশী এয়েছ নাকি সাথে? এসো, ভেতরে এসো।

মুখে একটাও দাঁত নাই, তোবড়ানো গাল, পাকা চুল,-পাগলদিদিকে যাদবের চেয়েও বুড়ো দেখায়। পিঠটাও পাগলদিদির একটু বাকিয়া গিয়াছে। তবু, শীর্ণ জরাগ্রস্ত দেহে ক্ষীণ প্রাণটুকু লইয়া পাগলদিদি ফোকলামুখে অনবরত হাসেন,–এই ভাঙা বাড়ি, । ডোবাজঙ্গল

ভরা এই গাওদিয়া গ্রাম, এখানে তাহার বার্ধক্যপীড়িত জীবন, সব যেন কৌতুকময়-ঘনানো মৃত্যুর স্বাদে পাগলাদিদি কৌতুকময়ী।

শশী বসিলে চিবুক ধরিয়া বলেন, বড়কর্তা বাড়ি ছিল না জানতে না বুঝি ছোটকর্তা? এলে না কেন গো? ডুবে শাড়িটি পরে, চুলটি বেঁধে কনেবউটি সেজে যে বসেছিলাম তোমার জন্যে?

আঙুরগুলি যাদব ব্যাগে ভরিয়া আনিয়াছেন। বাহির করিয়া দেখা গেল চাপ লাগিয়া অর্ধেক ফল গলিয়া গিয়াছে। ব্যাগে একটি জামা, দুখানা কাপড়, গামছা এইসব ছিল, আঙুরের রসে সব ভিজিয়া গিয়াছে। যাদব অপ্রতিভ হইয়া হাসেন। পাগলদিদি বলেন : দ্যাখে দাদা বুড়োর বুদ্ধি, ব্যাগে ভরে ফল এনেছেন কেন, গামছাখানা খুলে বেঁধে আনতে পারলে না?–পাগলাদিদিও হাসেন, মুখের চামড়া কুঞ্চিত হইয়া হাজার রেখার সৃষ্টি হইয়া যায়! আঙুর খাইতে খাইতে শশী পাগলদিদির মুখখানা নীরবে দেখিতে থাকে। রেখাগুলিকে তাহার মনে হয় কালের অঙ্কিত চিহ্ন-সাংকেতিক ইতিহাস। কী জীবন ছিল পাগলদিদির যৌবনে? শশী তখন জন্মে নাই। নৃজ বিশীর্ণ দেহটি তখন সুঠাম ছিল, মুখের টান-করা ত্বকে যখন লাবণ্য ছিল, কেমন ছিল তখন পাগলদিদি-মুখের রেখায় আজ কি তাহলে পড়িতে পারবে?

গুছানো সংসার পাগলদিদির। উপুড়-করা বাসনগুলি সাজানো, হাড়ি-কলসীর মুখগুলি ঢাকা, আমকাঠের সিন্দুকটায় গায়ে ধৌত পরিচ্ছন্নতা, পিলসুজে দীপটির শিখা উজ্জ্বল। এখনো ধূপের মৃদু গন্ধ আছে আর শান্ত-সব এখানে শাস্ত। মৃদু মোলেয়েম প্রশান্তি ঘরে ব্যাপ্ত হইয়া আছে। এ ঘরের আবহাওয়ার অমায়িকতা যেন নিশ্বাসে গ্রহণ করা যায়। ভাঙা হাটে যে বিষণ্ন স্তব্ধতা ঘনাইয়া থাকে এ তা নয়। এ ঘরে বহুযুগ ধরিয়া যেন মানুষের জ্বালা-করা বেদনার হল্লা প্রবেশ করে নাই। এ ঘরে জীবন লইয়া কেহ যেন কোনোদিন হৈচৈ করিয়া বাঁচে নাই,-আজীবন শুধু ঘুমাইয়া এ ঘরকে কে যেন ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়াছে। বড় ভালো লাগে শশীর। সে তো ডাক্তার, আহত ও রুগ্ণের সঙ্গে তার সারাদিনের কারবার,-দিন ভরিয়া তাহার শুধু মাটি-ছোঁয়া বাস্তবতা,-শ্রান্ত মনে সন্ধার জনহীন মন্দিরে

বসার মতো বুড়োবুড়ির এই নীড়ে সে শান্তি বোধ করে। শুধু আজ নয়, এখানে আসিলেই তাহার মন যেন জুড়াইয়া যায়। অথচ আশ্চর্য এই এই ঘরখানার এতটুকু আকর্ষণ বাহিরে সে বোধ করে না। এখানে আসিলে সে তো বুঝিতে পারে না মনে তাহার জ্বালা বা অসন্তোষ আছে। এখানে আসিয়া যে সন্তাপ তাহার ধীরে ধীরে জুড়াইয়া আসে, এই ঘরের বাহিরে তাহার দিন সপ্তাহমাসব্যাপী জীবনে তাহা এমনভাবে খাপ খাইয়া মিশিয়া থাকে যে, সন্তাপ সে টেরও পায় না।

৩. মতির জন্য পাত্র দেখিতে গিয়া

মতির জন্য পাত্র দেখিতে গিয়া কালের ধারে বটগাছের তলে হারু ঘোষ অপঘাতে প্রাণ দিয়াছিল। গ্রামে কি মতির পাত্র মিলিত না? হারুর ছিল উচ্চ আশা। ছেলেবেলা হারু স্কুলে পড়িয়াছিল, বড় হইয়া হার বড়লোক হইয়াছিল। তারপর গরিব হইয়া পড়িলেও মনটা হারুর বিশেষ বদলায় নাই। গাওদিয়ার গোপ-সমাজ পরিহাস করিয়া তাহাকে বলিত ভস্বরলোক। বিশেষ করিয়া বলিত নিতাই। নিতাইয়ের অবস্থা ভালো, চালচলনও তাহার অনেকটা ভদ্রলোকের মতো, তবু হারু তো তাহাকে খাতির করিত না। নিতইয়ের এক ভাগ্নে আছে, তার নাম সুদেব। সুদেবের ঘরবাড়ি জমিজমা আছে, পেটে ইংরেজি বাংলা বিদ্যাও কিছু আছে, বয়সটা কেবল একটু বেশি, প্রায় ছত্রিশ। সুদেবের সঙ্গে মতির বিবাহ দিবার কত চেষ্টাই যে নিতাই করিয়াছিল বলিবার নয়। হারু রাজি হয় নাই। বাজিতপুরে ম্যাট্রিকুলেশন-পাস পত্রিটি দেখিতে গিয়া তাই না অকালে হারু স্বর্গে গেল।

হারু নাই, হারুর ছেলে পরাণ বাপের মতো চালাকও নয়, গোয়ারও নয়। গাওদিয়ার গোপ-সমাজ মতির বিবাহের জন্য আবার একটু ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। পরাণকে তাহারা অনেক কথা বুঝায়। বলে গায়ের মেয়ে গায়ে থাকাই তো ঠিক। জানাশোনা ঘরে দিলে মেয়ে সুখে থাকিবে। দুধ-বেচা গোপের ঘরেও তো বোনকে দিবার কথা তাহারা বলিতেছে না, সুদেবের ঘর তো বনেদি ঘরের মতো। কেন দোমনা হচ্ছিস বল তো পরাণ? বাজিতপুরের ছেলেটা তো ফসকে গেছে।

সুদেবের সঙ্গে মতির বিবাহ? রসালো ফলের মতো অমন কোমল রঙ যে মতির, প্রতিমার মতো অমল নিখুঁত মুখ? প্রস্তাবটা পরাণের পছন্দ হয় না। কিন্তু অত লোকের কাছে স্পষ্ট না বলিবার মতো মনের জোরও তাহার নাই। নিমরাজি হইয়া সে বলিয়াছে, বাড়িতে আর শশীর মত থাকিলে সে আপত্তি করিবে না।

শশীর মতামতের প্রশ্নটা তাহারা পছন্দ করে নাই। নিতাই হাসিয়া বলিয়াছে, ছোটোবাবু লোক ভালো। কিন্তু নিজের সমাজে হিতৈষী গণ্যমান্য লোক থাকতে ছোটোবাবুকে মুরুব্বি ঠাওরালে পরাণ? ঘরের কথায় পরকে ডাকলে?

আজ একজন বলিয়াছে, ছোটোবাবু হরদম আসেন যান, না বটে?

একথাটা পছন্দ করে নাই পরাণ দুপক্ষের পছন্দ শেষপর্যন্ত কিসে গিয়া ঠেকিত বলা যায় না। কিন্তু হারুর আকস্মিক মৃত্যুর পর পরাণ বড় দমিয়া গিয়াছিল। কলহ না করিয়া বাড়িতে অসুখের ছুতা দিয়া সে উঠিয়া আসিয়াছে।

মতির জ্বর কিন্তু কমিয়া গিয়াছে। বর্ষার গোড়ার দিকে তাহাকে ম্যালেরিয়ায় শশীর দামি কুইনাইন জ্বরটা একেবারে ঠেকাইতে পারে নাই। এবার গা ষ্টুড়িয়া কয়েকবার তাহাকে ওষুধ দিয়া শশী আশ্বাস দিয়াছে, আর জ্বর হইবে না। জ্বরে ভুগিয়া মতির বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে মনে হয় না। ম্যালেরিয়া ধরিবার আগে হঠাৎ সে মোটা হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। মাঝে মাকে জ্বরে পড়িয়া এটা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। মতির সুন্দর গড়নটি চর্বিতে ঢাকিয়া গেলে বড় আপসোসের কথা হইত।

এখনো প্রতি সপ্তাহে মতিকে শশী একটা করিয়া ইনজেকশন দেয়। সকালে বাড়িতে যে কজন রোগী আসে তাদের ব্যবস্থা করিয়া, কালো ব্যাগটি হাতে করিয়া সে যখন হারু ঘোষের বাড়ি যায়, হয়তো তখন বেলা হইয়াছে, সমস্ত উঠান ভরিয়া গিয়াছে রোদে। মতির ভীত শুকনা মুখ দেখিয়া শশী হাসিয়া বলে, এতবার দিলাম এখনো তোর ভয় গেল না মতি? কোন হাতে নিবি আজ? স্পিরিট দিয়া ঘসিলে মতির বাহুতে ময়লা ওঠে। শশী বলে, বড় নোংরা তুই মতি, -গায়ে সাবান দিতে পারিস না?

ইনজেকশন দিয়া শশী দাওয়ায় বসে। পরাণ বলে, একটা পরামর্শ আছে ছোটোবাবু। বিষয়টা মতির বিবাহ-সংক্রান্ত শুনিয়া শশী জাকিয়া বসিয়া একটা বিড়ি ধরায়। ছেলের ইশারায় মোক্ষদা সরিয়া আসে কাছে। বুঁচিও আসিয়া ছেলে-কোলে কাছে দাঁড়ায়।

কুসুমকে দেখিতে না পাইয়া শশী মনে-মনে আশ্চর্য হয়। পুবের ভিটার ঘরখানার ছায়া ঘরের মধ্যেই সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে। পরাণের কথা শুনিতে শুনিতে প্রতিমুহূর্তে সঞ্চয় করিয়া কুসুম হঠাৎ বাহির হইয়া আসিবে,পরমাত্রীয়দের এই সভার একপ্রান্তে দাঁড়াইয়া থাকিবে পরের মতো।

তার সাড়া পাইয়া কুসুম যে কলসিটা তুলিয়া ঘাটে চলিয়া গিয়াছিল, শশী তাহা কেমন করিয়া জানিবে? পরাণের বক্তব্য শেষ হইয়া আসিলে কুসুম ভিজা কাপড়ে উঠানের রোদে পায়ে দাগ আকিয়া পুবের ঘরের ছায়ার মধ্যে ডুবিয়া যায়। রান্নাঘরের পোড়া ডালের গন্ধে চারিদিক ভরিয়া যাওয়ার পর ঘর হইতে সে আর বাহির হয় না।

মোক্ষদার রূঢ় বাক্যস্রোতে তারপর কিছুক্ষণের জন্য মতির বিবাহের সমস্যা ভাসিয়া যায়। রান্নাঘরের খোলা দরজা দিয়া অপরাধী ডালের হাড়িটা উঠানে আসিয়া আছড়াইয়া পড়িতে আজ যে আবার ও-প্রসঙ্গে উঠিবে সে সম্ভাবনা থাকে না। শশী ভাবে, সকলের কাছে কত বকবকিই বউটা না জানি শুনিবে!

মোক্ষদা, বুঁচি, মতি সকলেই হৈ হৈ করে। ও-ঘর হইতে মুমূর্ষ পিসি চেঁচায়, কী হল রে বুঁচি? কী হল রে মতি? চুপ করিয়া থাকে শশী। সকলকে চুপ করাইতে গিয়া পরাণহরা আরও বাড়ায়। কিন্তু কী নির্বিকার কুসুম – রাগের মাথায় ডালের হাড়িটা যে উঠানে ছুড়িয়া দিয়াছে, সে হাসিমুখে বাহিরে আসে। দাঁড়ায় শশীর সামনে। বলে, জ্বর এল নাকি, দেখুন দিকি ছোটোবাবু।

শশী নাড়ি ধরিয়া বলে, জ্বর আসেনি বউ।

মাথা ধরেছে যে ?

কতক্ষণ ধরে জলে ডুবিয়েছ তুমিই জানো, মাথার দোষ কী?

কুসুম মাথা নাড়িয়া বলে, উঁহু, আমার ঠিক জ্বর আসছে, আমি গিয়ে শুলাম। যা লো মতি, আজ তুই রাঁধবি যা।

কুসুম ঘরে গিয়া শুইয়া পড়ে।

কিন্তু শুইয়া কেন থাকিতে পারবে এই চঞ্চলা নারী? খানিক পরে উঠিয়া আসিয়া না বলিতেই পরাণকে এক ছিলিম তামাকে দিয়া সে অদূরে বসিয়া পড়ে। সুদেবের সঙ্গে মতির বিবাহে শশীর মত নাই শুনিয়া বলে, কেন গো ছোটোবাবু, সুদেব পাত্তর কী এমন মন্দ? পুরুষমানুষের আবার বয়েস—সতিন কাঁটা তো নেই? ঘরে পয়সা আছে লোকটার,-মেয়ে সুখে থাকবে।

শশী বলে, হারুকাকার অমত ছিল সেটা তো ভাবতে হবে বউ?

কুসুম বলে, তিনি সগ্যে গেছেন।

আর কিছু কুসুম বলে না। শশী তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করে, সুদেব লোক ভালো নয়, মতির সঙ্গে সুদেবকে মানায় না। কুসুম বোঝে কি না কে জানে-মোক্ষদার খর দৃষ্টিপাতে মাথায় ঘোমটা একটু টানিয়া দিয়া নিশ্চল প্রতিমার মতো বসিয়া থাকে। শশী বাড়ি যাওয়ার জন্য উঠিলে সে আবার মুখ খোলে। বলে, পিসিকে একবার দেখে যান ছোটোবাবু, বুড়ি কাঁদতে নেগেছে।

শশী একটু লজ্জা পায়। মরণাপন্ন পিসিকে দেখিয়া যাওয়ার কথা প্রায়ই তাহার মনে থাকে না। পিসির মরণ এতদূর সুনিশ্চিত যে তার সম্বন্ধে করিবার এখন আর কিছুই নাই। তাই কি শশী ভুলিয়া যায় আজো পিসি বাঁচিয়া আছে?

বড় বাঁচিবার সাধ পিসির।

পিসি মরিলে যে কাঠ দিয়া তাহাকে পোড়ানো হইবে, তাহার ঘরেরই অর্ধেকটা । জুড়িয়া সেগুলি সাজাইয়া রাখবা হইয়াছে। মাথার দিকে ঘরের কোণে দাড়-করানো পাটকাঠির

বোঝা হইতে পিসি এখনো পাটের গন্ধ পায়; এক আঁটি পাট ধরাইয়া পিসির মুখাগ্নি করিকে পরাণ। মাথার চুল পিসির অর্ধেক ঝরিয়া গিয়াছে, দেহের লাল চামড়ার তলে মাংস আছে কিনা বোঝা যায় না। পিসি তবু বাঁচিবেই।

চুপিচুপি সে শশীকে বলে, ও বাবা শশী, বই দেখে ওষুধ দিও বাবা, দামি ওষুধ দিও। দামের জন্য ভেবো না, বাবা সেরে উঠি, ওষুধের দাম তোমায় আমি মিটিয়ে দেব।

বলে, আমার যা-কিছু আছে সব তোমাকে দিয়ে যাব, তুমি ভালো করে আমায় চিকিচ্ছে কর।

তবু শশী প্রায়ই ভুলিযা যায় পিসি বাঁচিয়া আছে।

ইনজেকশন দিবার সময় প্রত্যেকবার শশী মতিকে বলিয়াছে, আর তোর জ্বর হবে না মতি।

শশীর আশ্বাস সত্য হইলে এ বছরের মতো মতিকে ম্যালেরিয়া ছাড়িয়াছে। ওদিকে যামিনী কবিরাজের বউ, শশী যাহাকে সেন দিদি বলিয়া ডাকে, পড়িয়াছে জ্বরে।

যামিনী বিখ্যাত কবিরাজ। বহু দূরবর্তী গ্রামে তাহাকে চিকিৎসার জন্য ডাকা হয়। সিদ্ধির পাতা মিশাল দিয়া যামিনী যে চব্যনপ্রাণ প্রস্তুত করে তাহা নিয়মিত সেবন করিলে বৃদ্ধের দেহে যুবার ন্যায় শক্তির সঞ্চার হয়। মরিয়া গেলেও যামিনীর মকরধ্বজ রোগীর দেহে জীবন আনিয়া দিতে পারে। তারপর এই জীবনকে ধরিয়া রাখিবার জন্য যামিনীর আদি ও অকৃত্রিম আবিষ্কার মহাকপিলাদি বটিকা সেবন করা বিধেয়। এই বটিকা প্রস্তুত করিতে তিন রাত্রি সময় রাগে। ইহা কখনও প্রস্তুত হইয়া থাকে না। কারণ, তৈরি করিয়া রাখিলে এই মহাতেজস্কর ঔষধের গুণ সূর্যরশ্মি আকর্ষণ করিয়া লয়। সুতরাং যামিনীর মকরধ্বজের তেজে মৃতদেহে জীবন সঞ্চার হইলেও মহাকপিলাদি বটিকার অভাবে প্রাণটুকু যে সবসময় টিকিয়া থাকে, এমন নয়। কিন্তু সে অপরাধ কি যামিনীর? রোগীর

কপাল! মহাকপিলাদি বটিকাতো প্রস্তুত নেই। রোগীকে না হয় বাঁচালাম, তারপর তিনদিন ঠেকাব কী দিয়ে?

মৃতকে যামিনীর এক লহমার জীবন দান কেহ কখনও দ্যাখে নাই। তবু লোকে বিশ্বাস করে। একজন দুজন নয়, অনেকে!

যামিনী কবিরাজের বউ কিন্তু কখনও স্বামীর ওষুধ খায় না। অসুখ হইলে এতকাল সে বিনা চিকিৎসাতেই ভালো হয়েছে, এবার জ্বরে পড়িয়া শশীকে ডাকিয়া পাঠাইলো।

গোপাল তখন বাড়িতে ছিল। শশীর হইয়া সে বলিয়া দিল, বলগে, যাচ্ছেতারপর শশীকে যাইতে নিষেধ করিয়া দিল।

শশী বলিল, কেন, যাব না কেন?

গোপাল বলিল, কবে তোমায় বুদ্ধি পাকবে, ভেবে পাই না শশী।

শশীও তাহা ভাবিয়া পায় না। সে চুপ করিয়া রহিল।

তখন গোপাল বলিল, যামিনী খুড়ে অত বড় কবরেজ, সে থাকতে ডেকে পাঠানোর মানেটা বোঝ?

শশী বলিল, আজ্ঞে না।

যুবতী স্ত্রীলোক, নানারকম কুৎসাও শুনতে পাই–

গোপালের মুখে এই কথা? লজ্জায় শশী সচকিত হইয়া গেলর। মৃদুস্বরে সে বলিল, এসব আপনার বানানো কথা বাবা।

গোপাল রাগ করিল না, বলিল, তোমার যে কী হয়েছে আজকাল বুঝতে পারি না শশী। তোমার ভালোর জন্যে একটা কথা কইলে তুমি আজকাল তর্ক জুড়ে দাও। সংসারে

মানুষকে ভেবেচিন্তে কত সাবধানে চলতে হয় সে জ্ঞান তোমার এখনো জন্মেনি। এই তোমার উঠতি পসারের সময়, এখনই একটা বদনাম রটে গেলে-এও কি তোমায় বলে দিতে হবে? তুমি চিকিৎসার ভার নিলে বলাবলি করবে না-লোকে যামিনী কবরেজ থাকতে তুমি ছেলেমানুষ তোমার কেন আত মাথাব্যথা? সবার বাড়িতে মেয়েছেলে থাকে, এর পর কে আর ডাকবে তোমায়?

শশীর রাগ হইতেছিল। কিন্তু শৈশব ও কৈশোরের এই মনটিকে ভয় করা তাহার সংস্কারে দাঁড়াইয়া গিয়াছে, গোপালের তীক্ষ্ণ অপলক দৃষ্টিপাতে সে চোখ নামাইয়া লইল। গোপাল আবার বলিল, যামিনী খুড়োর ইচ্ছেও নয় তুমি ওদের বাড়ি যাও।

শশীর নীরবতায় গোপাল খুশি হইয়াছে। বয়স্ক উপযুক্ত সন্তানকে বশ করা, জগতে এতবড় জয় আর নাই। আজকাল নানা ছোট-বড় ব্যাপারে শশীর সঙ্গে গোপালের সংঘর্ষ বাধিতেছিল, কলহ বিবাদ নয়,-তক ও মতান্তর, আদেশ ও অবাধ্যতার বিরোধ। আজ তবে শশী বুঝিতে পারিয়াছে সাংসারিক বুদ্ধিতে বাপের চেয়ে সে ঢের বেশি কাঁচা, গোপাল এখনো তাহাকে পরিচালনা করিতে পারে।

গোপাল আরও অনেক কথা বলিল, শশী নীরবে শুনিয়া গেল। শেষে তাহার কঠিন মুখের ভাব দেখিয়া আর কিছু বলা ভালো না মনে করিয়া গোপাল থামিল।

খাওয়াদাওয়ার পর শশী গেল যামিনী কবিরাজের বাড়ি।

শশীকে দেখিয়া যামিনী কবিরাজ খুশি হইল না। সদর বাড়তে সে তখন মুখে মুখে দুটি ছাত্রকে ওষুধের প্রস্তুত-প্রণালী শিখাইতেছিল, পাশের চালাটায় বুঝি সিদ্ধ হইতেছিল পাঁচন, গন্ধে চারিদিক ভরিয়া দিয়াছে। শশীকে দেখিয়া যামিনী চশমা খুলিয়া বলিল, কী মনে করে শশী? বোসো।

শশী বলিল, সেনদিদির অসুখ শুনলাম ঠাকুর্দা, একবার দেখা করে যাই।

অসুখ?- যামিনী হাসে, কার কাছে শুনলে? জ্বর বুঝি হয়েছিল একটু কাল, না রে কুঞ্জ? আজ অসুখ কোথা!

তবে বুঝি কোনো কাজে ডেকেছেন, বলিয়া শশী ভিতরে গেল।

সেনদিদি শুইয়া ছিল, আচ্ছন্ন অসুস্থ, মৃতকল্প সেনদিদি।

গায়ের উজ্জ্বল রঙ লাল হইয়া অনন্তের রঙের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে, সারা গায়ে আরও সব অস্পষ্ট চিহ্ন, শশী যা চেনে। শশীর মুখ শুকাইয়া গেল। শরতের গোড়ায় এ রোগ সে-দিদি পাইল কোথায়। গাউদিয়া গ্রামে, কলিকাতা শহরে, দেশে বিদেশে কোথাও শশী যার মতো রূপসী দেখে নাই, শুধু রূপের জন্যই হয়তো যে মিথ্যা কলঙ্ক কিনিয়াছে, এ কী রোগ ধরিয়াছে তাহাকে?

শশীর ডাক শুনিয়া যামিনী কবিরাজের বউ চোখ মেলিয়া তাকাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, তুমি এতদিনে এসেছ শশী? আমি যে মরতে বসেছি শশী? কী অসুখ করেছে কিছু জানি না, জ্বরে অচৈতন্য হয়ে থাকি, গায়ের ব্যথা সইতে পারি না–

আমি খবর পাইনি সেনদিদি।

কাকে দিয়ে খবর পাঠাব, কেউ কি আসে আমার কাছে!

সেনদিদি চোখ মেলিতে পারে না, চোখের কোণ দিয়া জল গড়াইয়া পড়ে। শশী বিছানায় বসে, সেনদিদির গায়ের তাপ পরীক্ষা করে, কী করিবে ভাবিয়া পায় না। যামিনী অসুখের কথা গোপন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, এ পর্যন্ত চিকিৎসারও হয়তো কোনো ব্যবস্থা হয় নাই। আজকাল তাহার কী হইয়াছিল, সেনদিদির খবর লইত না কেন? এই মলিন দুর্গন্ধ চাদরে আজ কতদিন না-জানি তাহর সেনদিনি বিনা-চিকিৎসায় পড়িয়া আছে, এতটুকু সেবা করিবারও কেহ থাকে নাই। শশী কিছু বুঝিতে পারে না। যে রূপের জন্য পৃথিবীর লোক উন্মাদ, স্ত্রীর যে সৌন্দর্য মানুষ তপস্যা করিয়া পায় না, যামিনী তাই পাইয়াছে।

বুড়া বয়সে সে তো স্ত্রীর দাস হইয়া থাকিবে। কীজন্য তাহার এই বিকৃত । নিষ্ঠুর অবহেলা? কে জানে, হয়তো সীতা আর হেলেন আর ক্লিওপেট্রার মতো যার অসাধারণ রূপ থাকে তাকেরিয়া খাপছাড়া কান্ডই ঘটতে থাকে জগতে!

খানিক পরে যামিনী ঘরে আসিল, মুখ ভার করিয়ী বলিল, এখনো তুমি বসে আছ শশী? আমি ভাবলাম তুমি বুকি চলে গেছ।

শশী বলিল, ঠাকুর্দা, বাইরে আসুন দিকি একবার। বাহিরে গিয়া বলিল, সেনদিদির অসুখ কি আপনি ধরতে পারেননি ঠাকুর্দা।

যামিনী কবিরাজ বলিল, হাসির কথা বললে বটে শশী, চল্লিশ বছর কবরেজি করছি, তিনটে জেলায় যামিনী কবরেজের নাম জানে না এমন লোক নেই, আমায় তুমি শুধোচ্ছ রোগ ধরতে পারিনি? একনজর তাকালে রোগ নির্ণয় হয়। ওঁয়ার হয়েছে ম্যালেরিয়া।

ম্যালেরিয়া নয়, ঠাকুর্দা, বসন্ত। –শশী বলিল।

হ্যাঁ, বসন্ত। শরৎকালে বসন্ত!–বলিল যামিনী কবিরাজ।

বলিল বটে, যামিনীর মুখে কালি পড়িয়াছে কিসের? শশীর কাছে যামিনী যেন অভিমান করিতেছে, একটা পাণ্ডুর ভয় আর কালো চিন্তার রাশিকে গোপন করিবার অভিনয়। শশী কড়াসুরে বলিল, আমি সেনদিদির চিকিৎসার ভার নিলাম ঠাকুর্দা। ছি, ছি, আজ পর্যন্ত কিছুই করেননি?

খায় নাকি আমার ওষুধ?

শশী ঘরে গিয়া বসিল। কী ভাবিয়া যামিনীও ঘরের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শশী দারুণ বিপন্ন বোধ করিতেছিল। আর বিষন্নতা। কয়েকদিন আগে সাতগাঁয়ে সে একটি বসন্তের রোগী দেখিতে গিয়াছিল। তাহাকে শশী বচাইতে পারে নাই। বাঁচাইবার চেষ্টাও সে করিতে পারে নাই, তাকে ডাকা হইয়াছিল একেবারে শেষমূহুর্তে। শেষপর্যন্ত রোগীর

চিকিৎসা করিয়াছিল সাতগাঁর কবিরাজ যামিনীর পূর্বতন ছাত্র ভূপতিচরণ। শশীর হঠাৎ মনে পড়িয়াছে, সেই রোগীটি মারা যাইবার পর যামিনী হাসিয়া বলিয়াছিল, আমার ছাত্র যাকে ছাড়পত্র লিখে দিল তাকে বাঁচাবে শশী- আমাদের শশে?

শশী প্রাণ দিয়া সেনদিদির চিকিৎসা ও সেবা আরম্ভ করিল। অন্য রোগীরা তাহাকে ডাকিয়া পায় না। বাড়িতে কারও জ্বরজ্বালা হইলে চোখের পলকে পরীক্ষা শেষ করিয়া ওষুধ দেয়,- না বলিলে আর খবর নেয় না। বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন সকলকে সে অবহেলা করে। যায় না হারু ঘোষের বাড়ি, বিনা কাজে অথবা মতিকে ইনজেকশন দিতে। কুসুম ভাবিল, শশী বুঝি রাগ করিয়াছে। তালবনের তালপুকুরে পদ্ম তুলিতে গিয়া মতি আশা করিতে লাগিল, ছোটোবাবু আজ নিশ্চয় আসবে। ছোটোবাবুকে একডালা পদ্ম দেব। কিন্তু কুসুমের মনে শশীর উপর রাগ কমিল না। মতির পদ্মফুলের বীচি দিয়া রাঁধা হইল তরকারি।

শুধু সেনদিদির ব্যবস্থা করিতে হইলে শশীর হয়তো চারদিকে তাকানোর সময় পাইত। চিকিৎসা আরম্ভ করিয়া এ-বাড়িতে গোপালের এবং ও-বাড়িতে যামিনীর উপদেশ, সমালোনা ও বাধাদানের বহরে সে বিপন্ন ও বিব্রত হইয়া রহিল। চিকিৎসায় ওদের শ্রদ্ধা নাই, এই কথাটা এমনিভাবে প্রকারান্তরে তাহাকে জানাইয়া দেওয়া হইতেছে। কিন্তু চিকিৎসার আর কোনো ব্যবস্থাও তো নাই। ভালো হোক মন্দ হোক, তার সাকে ছটিয়া ফেলার মধ্যে যুক্তি আছে কোনখানে? আমার ওষুধ খায় না, বলিয়া যামিনী নিজে চিকিৎসা করিতে রাজি নয়,-ওরা মারিয়া ফেলিতে চায় নাকি সেনদিদিকে? তাই বা কেন চাহিবে? তা ছাড়া যামিনীর এই লজ্জাকর পাগলামিতে গোপাল এভাবে সাহায্য করিতেছে কেন, তার স্বার্থ কী?

ব্যাপার যত রহস্যময়ই হোক, শশী একা সেন দিদির তিনটি যমের সাথে লড়াই করিতে লাগিল।

যামিনীকে সে জিজ্ঞাসা করে, বড় গোল শিশির ওষুধ কী হল ঠাকুর্দা?

যামিনী বলে, তিন দাগ ছিল না? খাইয়ে দিয়েছি। কী যে সব ওষুধ তোমার শশী,- সব ওষুধ হয় মদ, নয় সিরাপের গন্ধ!

শশী সভয়ে বলে, খাইয়ে দিয়েছেন? গোল শিশির ওষুধটা খাইরে দিয়েছেন?

তা দিলাম বইকী? ছটফট করছিল দেখে ভাবলাম, তোমার রুগী তোমার ওষুধ, দিই খাইয়ে!

শশী রাগ করিয়া বলে, রোগী আমার নয় ঠাকুর্দা, আমি চললাম। আপনার যা-খুশি করুন।

সে একরকম চলিয়াই আসে। বাড়ির বাহিরে গিয়া গতি শ্লথ করিয়া দাঁড়ায়। মনে পড়ে সেনদিদির ভীরু কাতর চাহনি, একান্ত নির্ভরতা। শশী আবার ফিরিয়া যায়। বলে, ওটা যে গুটি-বসাবার ওষুধ, সাতদিন আগে ও ওষুধটা দিয়েছিলাম, আপনি জানতেন না?

যামিনীর মুখ কয়েকদিনে সম্ভবত দুশ্চিন্তাতেই শুকাইয়া পাংশু হইয়া গিয়াছে। সে চোখ মিটমিট করিয়া বলে, আমি কবরেজ মানুষ, তোমাদের ওষুধের আমি কী জানব ভাই? আমি তো কিছুই জানি না।

জানেন না তো আমায় না বলে ওষুধ খাওয়ালেন কেন? আপনিই মারবেন ঠাকুর্দা সেনদিদিকে। গুটি পাকছে, এখন আপনি খাইয়ে দিলেন গুটি-বসানোর ওষুধ?

যামিনী কথা কয় না।

শশী একটু নরম হইয়া বলে, বড়ো অন্যায় করেছেন ঠাকুর্দা, আর যেন এমন করবেন না কখনও।

যামিনী বলে, আমার একটা ওষুধ খাইয়ে দেবে শশী? তাড়াতাড়ি যাতে গুটি পাকে?

শশী তৎক্ষণাৎ সন্দিগ্ধ হইয়া বলে, খাইয়েছেন না কি কিছু? আপনার ওষুধ?

নাঃ, আমার ওষুধ খায় না।

তার মানে চেষ্টা করেছিলেন খাওয়াবার?

উদভ্রান্ত যামিনী এবার খেপিয়া যায়।

যদি করে থাকি? হ্যাঁ হে শশী, যদি করেই থাকি? তোমার ওসব মদ আর সিরাপে আমি বিশ্বাস করি না বাপু চিকিৎসা হচ্ছে! এই যদি তোমার বসন্তের চিকিৎসা হয়, পুঁথিপত্র খালে ভাসিয়ে ঘরের ছেলে ঘরে গিয়ে বসো গে যাও!

বলিতে বলিতেই যামিনী সাহস হারায়ম তবু মরিয়ার মতো বলে, তুমি আর এসো না!

মাথা শশীও ঠিক রাখতে পারে না ; গোড়া থেকে আপনি যা সব কাণ্ড করছেন ঠাকুর্দা, পুলিশ ডাকলে আপনার দশ বছর জেল হয়।

যামিনী বিবর্ণ মুখে বলে, কী করলাম আমি চিকিৎসা হচ্ছে তোমার, আমি তো একটা বড়িও খাওয়াইনি আমার!

শশী আর কথা-কাটাকাটি করে না। এ পাগলের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া লাভ কী?

এই কি কলহের সময় ঠাকুর্দা?

কলহ কে করছে বাপু!

জ্ঞান হইলে যামিনী কবিরাজের বউ বলে, ঘরে কে, শশী? কার সঙ্গে কথা কইছ? – চোখে সে দেখিতে পায় না, চোখদুটি বন্ধ হইয়া গিয়াছে। যামিনী ঘরে আসিয়াছে শুনিলে উতলা হইয়া ওঠে, ওকে যেতে বলো শশী, যেতে বলো ওকে, আমাকে ও বিষ খাইয়ে মারবে- যাও না তুমি এ ঘর থেকে, চলে যাও না।

যামিনী চলিয়া গেলে বলে, বাঁচব তো শশী?

বাঁচবে বইকী।

সেনদিদি খুশি হয়। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে। শশী কি জানে না, কী অসহ্য তাহার যাতনা? সেনদিনির সহ্যশক্তি দেখিয়া বিস্ময় মানে শশী। নালিশ নাই, কাতরানি নাই, মাঝে মাঝে শুধু জিজ্ঞাসা করে বাঁচিবে কি না।

সেনদিদি বলে, এত ঘাঁটাঘাঁটি করছ, তোমার তো ভয় নেই বাবা?

কিসের ভয়? ছমাস আগে টিকে নিয়েছি।

তখন সেনদিদি বলে, ধরতে গেলে তুমি তো আমার ছেলেই। পেটের ছেলের চেয়ে তোমাকে বেশি ভালোবাসি শশী।

কথাটা শশীকে বিচলিত করিয়া দেয়। সেনদিদি যে তাকে ভালোবাসে সে তা জানে বারো বছর বয়স হইতে। কথাটা বলিবার ভঙ্গি তাহাকে অভিভূত করিয়া রাখে। কেমন একটা বালকত্বের অনুভূতি হয় এক অসুস্থা গ্রাম্য নারীর আবেগপূর্ণ কথায়। পেটের ছেলের চেয়ে ভালোবাসে? একথার অর্থ কী? সেনদিদির তো ছেলেমেয়ে হয় নাই কখনও।

একদিন সেনদিদির শিয়রে সারারাত জাগিয়া ভোরবেলা বাড়ি ফেরার সময় বাড়ির সামনে শিউলিগাছটার তলায় মতিকে শশী ফুল কুড়াইতে দেখিল। শশী যায় না বলিয়া মতি বুঝি ব্যাপার বুঝিতে আসিয়াছে!

শিউলি গাছটা ঝাঁকিয়া ফুল ঝরাইয়া দিয়া শশী জিজ্ঞাসা করিল, তুই কবে টিকে নিয়েছিলি রে মতি?

টিকে নিইনি তো!

নিসনি! কেন, টিকে নিতে কী হয়েছিল? দাঁড়া আজ তোদের বাড়িসুদ্ধ সকলকে টিকে দিয়ে আসব। পাড়ায় বসন্ত হয়েছে খবর রাখিস?

মতি অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিল, টিকে নিলে কী হবে? মা শেতলার কৃপা হবার হলে হবেই গো ছোটোবাবু, হবেই।

তোর মাতা হবে।

শিশিরে একপশলা বৃষ্টির মতো চারিদিক ভিজিয়া আছে। মতির বিবর্ণপাড় শাড়ি আধভেজা কাপড়ের মতো কোমল দেখাইতেছিল। শশীর মনে হয় শাড়ির নমনীয় স্পর্শে মতি ভারি আরাম পাইতেছে। সকালবেলা রাতজাগা চোখে মতিকে যেন তার বয়সের চেয়ে অনেক বড় মনে হইতে লাগিল। ওকে দেখিতে দেখিতে সকালবেলা বিড়ি টানার আলস্য আরও মিষ্টি লাগিল শশীর।

মতি বলিতেছিল, বউ বলে আপনি সায়েব মানুষ, ঠাকুর-দেবতা মানেন না। সত্যি ছোটোবাবু?

না, সত্যি নয়। ঠাকুর-দেবতা খুব মানি।

শুনিয়া মতি যেন স্বস্তি পাইল।

বউ আপনার নামে যা-তা বলে।

অ্যাঁ? কী বলে?

মতি মুচকাইয়া হাসিল, কত কী বলে।

শশী হাসিয়া বলিল, তুইও তো বলিস মতি। পরাণের বউ হয়তো তোর কাছ থেকেই বলতে শিখেছে।

মতির মুখ শুকাইয়া গেল।

আমি আপনার নামে বলি। আমি যদি আপনার নামে কিছু বলে থাকি আমার যেন ওলাউঠো হয়। হয়-হয়-হয়, তিন সত্যি করলাম, ভগবান শুনো।

শশী অবাক হইয়া বলিল, তুই তো আচ্ছা রে মতি! সকালবেলা ফুল তুলতে তুলতে ওলাউঠোর নাম করছিস!

মতি এবার রাগ করিয়া বলিল, আমার যেন হয়!

রোদ উঠিলে মতি বাড়ি গেল। শশী ভাবিল এমন গেঁয়ো স্বভাব, দেখতে তো গেঁয়ো নয়!

আর মতি ভাবিল, শেষের দিকে ছোটোবাবু আমাকে কী করে দেখছিল? আমাকে দেখতে দেখতে কী ভাবছিল ছোটোবাবু?

হারু ঘোষের বাড়ির সামনে বেগুনগাছগুলি এমন সতেজ। কয়েকটা গাছে কচি কচি বেগুনও ধরিয়াছে। বড় ঘরের পাশ দিয়া পিছনের মাঠে তাকাইলে অনেক দূরে কুয়াশা দেখা যায়। দূরত্বই যেন ধোয়াটে হইয়া আছে, কুয়াশা মিছে। মতি তৃপ্তিবোধ করে। সকালবেলার সোনালি রোদে তাহার চোখের সীমানার গ্রামখানি দেখিতে অপূর্ব হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া নয়। প্রকৃতিকে, তাদের এই গ্রামের প্রকৃতিকে, মতি এতবেশি করিয়া চেনে যে আকাশের রামধনু ছাড়া তাহার চোখ তাহার মন কোথাও রঙ খুঁজিয়া পায় না। নাকের সামনে কচি কিশলয়ের মৃদু হিদোল কোন কাঁচা মনকে দোল দেয় কে জানে, মতির মনকে দেয় না। সর্বাঙ্গের শুভ্রতায় তালগাছের রহস্যময় ছায়া মাখিয়া মাখিয়া তালপুকুরের গভীর কালো জলে হাসঁ সাঁতার দেয়, তাদের গায়ে ঠেকিয়া লাল ও সাদা শাপলাগুলি জলে ডুবিয়া ভাসিয়া ওঠে, চারিদিকের তীর ভরিয়া কলমিশাকের ফুলগুলি বাতাসে যেন কেমন করিতে থাকে। আকাশে ভাসে উজ্জ্বল সাদা মেঘ আর বন্য কপোতের ঝাঁক। শালিখ পাখি উড়িবার সময় হঠাৎ শিস দেয়। অল্প দূরে কাতৌরা পাখির পাঠশালা বসে। বাতাসে থাকে কত ফুল, কত মাটি, কত ডোবার মেশানো গন্ধ।

মতি কিছু দেখে না, কিছু শোনে না, কিছু শোকে না। তালপুকুরের নির্জনতাকে সে শুধু ভোগ করে গায়ে জড়ানো আচলটি কোমরে বধিয়া। গা উদলা করিয়া দেওয়াতেও কেহ যে তাহাকে দেখিতে পাইতেছে না ইহাতে মতির ভারি মজা লাগে।

সংসারের কাজ না করিলে কুসুম তাহাকে বকে। তালপুকুরের ধারে কাজ-ফাকি দেওয়া আলসাটুকু মতি ভোগ করে ভবিষ্যতের চিন্তা করিতে করিতে। সুদেবকে মনে । মনে মরিবার আশীর্বাদ করিয়া আরম্ভ না করিলে ভবিষ্যতের ভাবনাটা তাহার যেন ভালো খোলে না।

মতির ভারী ইচ্ছা, বড়োলোকের বাড়িতে শশীর মতো বরের সঙ্গে তার বিবাহ হয়। কাজ নাই, বকুনি নাই, কলহ নাই, নোংরামি নাই, বাড়ির সকলে সর্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে, হাসে, তাস-পাশা খেলে, কলের গান বাজায়, আর,–আর বাড়ির বউকে খালি আদর করে। চিবুক ধরিয়া তাহার লজ্জিত মুখখানি তুলিয়া বলে, লক্ষ্মী বউ, সোনা বউ, এমন না হলে বউ?

বলে, বাড়ি আলো হল!

স্বপ্ন মতির অফুরন্ত। মস্ত একটি ঘরের এককোণে সে বসিয়া আছে। সর্বাঙ্গে তাহার ঝলমলে গহনা, পরনে ঝকঝকে শাড়ি। ঘোমটার মধ্যে চন্দনচর্চিত মতির মুখখানি কী রাঙা লজ্জায় আনন্দে সে ছোট ছোট নি:শ্বাস ফেলিতেছে আর শুনিতেছে ঘরের বাহিরে । বড়লোকের বাড়ির প্রকান্ড সংসারের কলরব। শশীর বোনের মতো পাড়ার কে যেন একটি মেয়ে মতির সঙ্গে ভাব করিয়া গেল। যামিনী কবিরাজের বউ-এর মতো সুন্দরী একটি মহিলা, মতির বোধ হয় সে ননদই হইবে, পানের বাটা সামনে দিয়া বলিল, পান সাজো, বউ। ও সোনা-বউ, পান সাজো।

তারপর কে বলিল, বউমাকে খেতে দে তোরা কেউ একজন।

যেই বলুক, তালপুকুরের ধারে প্রকৃতির মহোৎসব হইতে বাড়ি ফেরার সময় মতি আবার তীব্রভাবে ইচ্ছা করে সুদেব ব্যাটা মরিয়া যাক।

কুসুমের সঙ্গে আজকাল প্রায়ই ঝগড়া বাধে মতির। সকলের অগোচরে মতিকে কুসুম শশীর কথা তুলিয়া অন্যায় পরিহাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

বলে, শশীর খারাপ লাগছে মতি? তাই চুপ করে বসে রয়েছিল? আহা ঘাট। ছোটোবাবুকে ডাকব পরক্ষে করে ওষুধ দেবে?

মতি বলে, কেন লাগতে এলি বউ? তোর আমি কী করেছি।

কুসুম বলে, চোখ ছলছল করছে। দেখলে ছোটোবাবুর বুক ফেটে যাবে।

মতি বলে, যমের অরুচি। মর্ তুই, মর্।

কুসুম তবু বলে, জানিস লো মতি,–রাতে তোর কথা ভেবে ছোটোবাবুর ঘুম হয় না। বসে বসে মালা জপ করে, মতি, মতি, মতি। সুদেবের সঙ্গে তোর নিকে হয়ে গেলে ছোটোবাবু তালপুকুরে ডুবে আত্মহত্যা করবে।

তুই তালপুকুরে ডুবে মর। মরে শাঁকচুন্নি হয়ে থাক।

মতি স্থানত্যাগ করিতে চায়, কুসুমের সঙ্গে সে কথায় পারবে কেন? কুসুম তাহাকে রেহাই দেয় না। খপ করিয়া মতির হাতটা সে ধরিয়া ফেলে। মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া অপলক চোখের তারা স্থির রাখিয়া কথাগুলিকে দাঁতে কাটিয়া কাটিয়া বলে, লজ্জা নেই তোর? এতবড় ধেড়ে মেয়ে তুই, লজ্জা নেই তোর? পেটে ভাত জোটে না, গয়লার মুখ্য মেয়ে তুই --ছোটোবাবুর তুলনায় তুই ছোটলোক ছাড়া কী! অত তোর পাকামি কিসের? অমনি করিস বলেই তো বিরক্ত হয়ে ছোটোবাবু আর আসে না।

তারপর মতি কুসুমের হাত দেয় কামড়াইয়া। তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া দংশিত হাতখানা ঘুরাইরা ফিরাইয়াকুসুম দাতের দাগগুলি ভালো করিয়া দ্যাখে।

কামড়ালি! আমাকে তুই কামড়ালি! দাঁড়া তোর আমি কী করি দ্যাখ।

কী করিবে? কুসুম তাঁহার কী করিবে? বুক দুরু দুরু করে মতির। ছোট বাবুকে যদি বলিয়া দেয়!

মতির মনে হয়, সে কুসুমের হাত কামড়াইয়া দিয়াছে শুনিলে ছোটোবাবু ভয়ানক রাগ করিবে।

খানিক পরেই সে কুসুমের আশেপাশে ঘোরাফিরা আরম্ভ করিয়া দেয়। একসময় সাহস করিয়া বলে, লেগেছে বউ? দেখি?

কুসুমের ক্ষমা নাই। সে ভাঙাইয়া বলে, লেগেছে বউ? কামড়ে দিয়ে নাকামি করতে এলেন।

মতি দাওয়ায় আসিয়া খুঁটি ধরিয়া দাঁড়ায়। ভাবে, বউ কী ভীষণ মেয়ে। ও ঠিক বলে দেবে।

পিসির ঘরে খোলা দরজা দিয়া পিসিকে দেখা যায়। পিসির আজকাল কথা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কথা বলিতে গেলে গলায় ফ্যাসফ্যাস আওয়াজ হয় মাত্র, কিছুই সে বলিতে পারে না। মতিকে দেখিয়া সে হাতের ইশারায় তাহাকে কাছে ডাকে। মাথা উঁচু করিয়া বারবার ব্যাকুলভাবে মুখের ফাঁকে আঙুল ঢুকাইয়া পিপাসা জানায়। দেখিতে পাইয়াও মতি কিন্তু অনেকক্ষণ নড়ে না।

বলে, যাইগো যাই-অত ব্যস্ত কেন?

মোক্ষদা জিজ্ঞাসা করে, কে ডাকে লো মতি?

পিসি। জল খাবে।

৪. এবার কার্তিক মাসে পূজা

এবার কার্তিক মাসে পূজা। সেনদিদির সর্বাঙ্গে ব্রনগুলি পাকিয়া উঠিতে উঠিতে গ্রামের পূজার উৎসব শুরু হইয়া গেল। উৎসব সহজ নয়, গ্রামের জমিদার শীতলবাবুর বাড়ি তিনদিন যাত্রা, পুতুলনাচ, বাজি পোড়ানো, সাতগাঁ মেলা-পূজা তো আছেই। গ্রামবাসীর ঝিমানো জীবন প্রবাহে হঠাত প্রবল উত্তেজনার সঞ্চার হইয়াছে, কেবল শশী এবার সেনদিদিকে লইয়া বড় ব্যস্ত।

যাত্রা আরম্ভ হয় সপ্তমীর রাত্রে। যাত্রার দল তার আগেই গ্রামে হাজির হইয়া যায়। বায়না দিবার সময় শীতলবাবু অধিকারীকে বলিয়া দেন, দল নিয়ে দু-একদিন আগেই। আসবে বাপু, এক রাত্রি বেশ করে ঘুমিয়ে রাস্তার কষ্ট দূর করে অভিনয় করবে।

এবার যে-দলকে বায়না দেওয়া হইয়াছিল সে-দল এ-অঞ্চলের নয়। বিনোদিনী অপেরা পার্টির আদি আস্তানা খাস কলিকাতায়। বাজিতপুরের মথুরা সাহার ব্যবসা উপলক্ষে কলিকাতা যাওয়া-আসা আছে। কিছুদিন আগে ছেলের বিবাহে এই দলটি সে কলিকাতা হইতে ভাড়া করিয়া আনিয়াছিল। লোকমুখে দলের প্রশংসা শুনিয়া শীতলবাবু সেই সময় বায়না দিয়া রাখিয়াছিলেন।

কাল বিকেলে বিনোদিনী অপেরা পার্টি আসিয়া পৌঁছিয়াছে। মস্ত দল, সঙ্গে অনেকগুলি বড় বড় কাঠের বাক্স। দেখিয়া গ্রামের লোক খুশি হইয়াছে। দলের অধিকারী বি-এ ফেল, তবে দলে তাহার দুজন বি-এ পাস অভিনেতা আছে শোনা অবধি সকলে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে।

থেটার, অ্যাঁ?

উঁহু যাত্রা। অপেরা-পার্টি নাম যে।

তাই ভালো। যাত্রাই ভালো।

সাতগাঁর কাছারিবাড়িটা সাফ করিয়া যাত্রাওয়ালাদের থাকিতে দেওয়া হইয়াছিল। দলের সকলের মশারি নাই, কুমুদের আছে। রাত্রে তার ঘুম মন্দ হয় নাই। সকালে উঠিয়া সে শশীর সঙ্গে দেখা করিতে আসিল।

শশী অবাক হইয়া বলিল, তুই কুমুদ?

কুমুদ হাসিয়া বলিল, না রে, আমি, প্রবীর।

শশী বুঝিতে পারে না-প্রবীর কী, প্রবীর?

গ্রামে বিনোদিনী অপেরা পার্টি এল, চারিদিকে হৈচৈ পড়ে গেছে, খবর পাসনি?

তুই যাত্রাদলের সঙ্গে এসেছিস কুমুদ? তুই যাত্রা করিস?

কথাটা বিশ্বাস করিতে এত বিস্ময় বোধ হয়। কুমুদ বদলাইয়া গিয়াছে। মুখে আর সে জ্যোতি নাই। চুলে সেই অন্যমস্ক বিদ্রোহ নাই। অত সকালেও কুমুদ কিছু প্রসাধন সারিয়া তবে দেখা করিতে আসিয়াছে। তবু, যতই বদলাক, এ তো সেই কুমুদা মাসের বই না-দেখিয়া যে একদিন তাহাকে ক্লাসের কাব্যসঞ্চয়নে শেলির দুর্বোধ্য কবিতা বুঝাইয়া দিয়াছিল, মোনালিসার হাসির ব্যাখ্যা করিয়াছিল।

কুমুদ বলিল, করি বইকী যাত্রা। প্রবীর সাজি, লক্ষণ সাজি, চন্দ্রকেতু সাজি, আরও কত কী সাজি। গলা ফাটিয়া পার্ট বলি। সাতটা মেডেল পেয়েছি।

শশী অবাক হইয়া বলিল, আয় ঘরে আয়। বসে সব বলবি চল।

কুমুদকে শশী তাহার ঘরে লইয়া গেল। ঘরে গিয়া আর একবার বলিল, অ্যান্দিন পরে তুই এলি কুমুদ? এতকাল পরে তোর সঙ্গে দেখা হল কী আশ্চর্য!

তাহার বিছানায় বসিয়া ঘরের চারিদিকে চাহিতে চাহিতে কুমুদ বলিল, এতে আশ্চর্যের কী আছে? তিন বছর ধরে বাঙলাদেশের কত গ্রামে ঘুরেছি তার ঠিক নেই। এবার তোদের গ্রামে এলাম।

যাত্রার দলে ঢুকলি কেন?

সে এক ইতিহাস শশী। বাড়ি থেকে দিলে খেদিয়ে। নিলাম চাকরি। চাকরি থেকেও দিলে দেখিয়ে- একদিন অন্তর আপিস গেলে কে রাখবে? ঘুরতে ঘুরতে বহরমপুরে বিনোদিনী অপেরা-পার্টির যাত্রা শুনে অধিকারীর সঙ্গে ভাব জমালাম। অধিকারী লোক ভালো রে শশী, পরীক্ষা করে সতেরো টাকা মাইনে দিয়ে দলে নিলে। দু-চারটে সেনাপতির পার্ট করে গলা খুলল, খুব আবেগ-ভরে চেঁচাতে শিখলাম। একবছরের মধ্যে মেন অ্যাকটর। আশি টাকা মাইনে দেয়। মাসে আটটার বেশি পালা হলে পালা-পিছু পাঁচ টাকা করে বোনাস। দলে আমার খাতির কত!–কুমুদ হাসিল, গ্র্যান্ড সাকসেস, অ্যাঁ?

শশীও হাসিল, তুই শেষে যাত্রা করবি, একথা ভাবতেও পারতাম না কুমুদ।

আমিও কি ভাবতে পারতাম?

তখন আকস্মিক কথার অনটনে শশী বলিল, আজ তুই এখানে খাবি ভাই, সারাদিন থাকবি।

কুমুদ বলিল, বেশ।

মনে মনে শশী ভারি খুশি হইয়াছিল। এতকাল পরে কুমুদের সঙ্গে দেখা হইয়াছে, শুধু এইজন্য নয়। কুমুদ নামিয়া আসিয়াছে বলিয়া। কুমুদের সেই অন্যমনস্ক সরল ঔদ্ধতা নাই, নিজেকে সংসারের আর সকলের চেয়ে স্বতন্ত্র, সকলের চেয়ে বড় মনে করিতে সে ভুলিয়া গিয়াছে। এটুকু শশী প্রথম হইতেই টের পাইতেছিল। কুমুদের কাছে নিজেকে তাহার চিরদিন ছোট মনে হইয়াছে, তুচ্ছ মনে হইয়াছে। কুমুদের অন্যায়ের ইতিহাসগুলি

শুনিয়া পর্যন্ত ঈর্ষার সঙ্গে তাহার মনে হইয়াছে এত সাহস এত মনের জোর এতখানি তেজ তাহার নাই, এরকম অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অভাবে জীবনটাই বৃথা গেল তাহার। আজ কুমুদের মৃদু অস্বস্তি, চেষ্টা করা সহস ব্যবহার এবং একেবারে যাত্রার দলের অধঃপতন তাহকে যেন শশীর চেয়েও নিচে নামাইয়া দিয়াছে। বন্ধুকে আর শশীর গুরুজন মনে হইতেছে না।

কুমুদ বলিল, তোর ঘরখানা বেশ সাজানো। গ্রামে থেকে গেঁয়ো বনে যাসনি দেখছি।-সে আবার একটু হাসিল, তাহার পূর্বের হাসির সঙ্গে তুলনা করিয়া এ হাসিকে শশীর মনে হইল ভীরু অপরাধী হাসি-কতকাল ধরে কারো বাড়িতে ঢুকিনি জানিস শশী? চার বছর। পারিবারিক আবহাওয়াটা মুগ্ধ করে দিচ্ছে। বিয়ে করেছিস?

না।

করিসনি? তোর ঘর দেখে মনে হচ্ছিল বউ আছে। ঘর কে গুছিয়েছে রে, বোন? উঠানে যাকে দেখলাম?

ও বোন নয়। ভগিনী,-পিসির মেয়ের মেয়ে। বোন একটা আছে, ছোট, আট বছর বয়স, গোছানোর বদলে বরং নোংরাই করে দিয়ে যায়। আমার খাটের তলাটা হল ওর খেলাঘর তাকিয়ে দাখ, পুতুলেরা সারিসারি ঘুমোচ্ছে এইবার ঘুম ভাঙবে–খুকীর আসবার সময় হল। একটু চেষ্টা করে ভাব জমাস, ভারি চালাক মেয়ে, চারি বুদ্ধি। পড়াচ্ছি কিনা, আমি জানি। চটপট শিখছে। সামনের বছর স্কুলে ভর্তি করে দেব।

শশী চিন্তিত হইয়া মাথা নাড়ে, দেব বলছি–হবে কি না ভগবান জানেন। বাবার এসব পছন্দ নয়। নয়তো বলবেন, ছেলে লেখাপড়া শিখে হয়েছে অবাধ্য, মেয়ে কী হবেন ঠিক কী? স্কুলে-টুলে দিয়ে কাজ নেই বাপ- -শেখা না, বাড়িতেই শেখা!

কুমুদ শশীর মুখের ভাব লক্ষ করিতেছিল, বলিল, বুঝিয়ে দিস আজকাল মেয়েদের স্কুলে না দিলে চলে না।

বুঝিয়ে? বাবাকে? বাবা সেকেলে মানুষ।

কথা বদলাইয়া বলিল, ঘর কে গোছায় বলছিলি? লোকের অভাব কী এ হল বাংলাদেশ একজন রোজগার করে, দশজনে খায়। ঘর গোহাবার লোকের অভাব নেই। তবে-বন্ধুকে শশী চোখ ঠারিল, নিজের ঘর আমি নিজেই গোছাই।

শশীকে যামিনী কবিরাজের বউ-এর কাছে যাইতে হইবে। এ কর্তব্য অবহেলা করিবার উপায় ছিল না। বন্ধুকে খই-এর মোয়া আর চন্দ্রপুলি খাওয়াইয়া শশী বিদায় লইল।

গ্রামে পর্দপ্রথা শিথিল কিন্তু সে গ্রামেরই চেনা মানুষের জন্য। শশীর বাড়ির মেয়েরা সকালবেলা অন্তঃপুরে পাক খায়। কুমুদ উৎসুকদৃষ্টিতে খোলা দরজা দিয়া প্রকান্ড সংসারটির গতিবিধি যতটা পারে দেখিতেছিল। খানিক পরে ছোট একটি ছেলে আসিয়া দরজাটা ভেজাইয়া দিয়া গেল। কুমুদ আহত হইয়া ভাবিল, আমি তো ওদের দেখিনি! ওদের কাজ দেখছিলাম যে আমি। সকলে মিলে কী রচনা করছে তাই দেখছিলাম।

জামাটি গায়ে দিয়া কুমুদ বেড়াইতে বাহির হইয়া গেল। একটা পরিবারের গোপন মর্মস্পন্দন দেখিয়া ফেলার অপরাধ একা-একা অন্তঃপুরের একটা ঘরে বসিয়া সহ্য করা কঠিন।

বাড়ির পিছনে তালবনের ওপাশে উঁচু মাটির টিলাটির দিকে। সে সেইদিকে চলিতে আরম্ভ করিল। জীবনে সে যত পুণ্য অর্জন করিয়াছে, তার পাপের হিসাবটা আজ এখানকার মতো ধরিয়া তালবনের গভীর নির্জনতায় হঠাৎ তাহার পুরস্কার কে দিল, মানুষের বুদ্ধিতে তাহার বিশ্লেষণ নাই। হয়তো শশীর বাড়ির মেয়েরা অকারণে তাহাকে যে লাঞ্ছনা দিয়াছিল, জীবনের নিরপেক্ষ দেবতা ভোরের বাতাস পাখির কলরব আর ঋজু তালগাছগুলির প্রহরায় রক্ষিত যুগান্তের পুরাতন নিভৃত শান্তির উপলক্ষে ক্ষতিপূরণ করিলেন। এত সহজে সেন্টিমেন্টাল করিয়া দিতে পারে, একটি সুখী পরিবারের অন্তঃপুর

ছাড়া পৃথিবীতে এমন স্থান যে আছে কুমুদ তাহা জানিত না। এত কি কুমুদ জানিত যে এই অহেতুকি আনন্দ তাহার মৃত্যুরই শেষ ভূমিকা?

তালপুকুরের ধারে পৌঁছিয়া হঠাৎ তাহার মনে হইল, কী একটা রবারের মতো নরম জিনিসে পা পড়িয়াছে। চোখের পলকে হলুদ রঙের নরম জিনিসটার মুখ মাটি হইতে উঠিয়ে আসিয়া তাহার হাঁটুর কাছে কামড়াইয়া ধরিল। লেজের দিকটা জড়াইয়া গেল তাহার পায়ে।

কুমুদ জীবনে কত পাপ করিয়াছে, পরিমাণ তার কম নয়, অল্প একটু পুণ্যের কয়েক মিনিটব্যাপী অসাধারণ পুরস্কারের পর, এই তাহার শাস্তি। ঘাড় ধরিয়া সাপের মাথাটা কুমুদ হাঁটু হইতে ছিনাইয়া লইল।

সাপ। সাপ।

শুনিয়া আগে আসিল মতি, ভিজা শরীরে শুকনো কাপড়টা কোনোমতে জড়াইয়া।

কুসুম ওভাবে ছুটিতে পারে না। তাহার আসিতে দেরি হইল।

সাপ দেখিয়া মতি বলিল, ও তো ঢোঁড়া সাপ। জলে থাকে। ওর বিষ নেই।

কুমুদের মৃত্যুভয় প্রবল। কুসুম আসিয়া সায় না দেওয়া পর্যন্ত মতির কথা সে বিশ্বাস করিল না। বিশ্বাস করিয়াও হাঁটুর উপরে রুমাল দিয়া সজোরে বাঁধিয়া সন্দিগ্ধভাবে বলিল, শশীকে একবার ডেকে আনো খুকী, দেখুক। যদি বিষ থাকে? চেনো তো শশীকে? তোমাদের পাড়াতেই থাকে,- ডাক্তার।

কুসুম মুচকিয়া হাসিয়া বলিল, যা লো খুকী, ছোটোবাবুকে ডেকে আল। তাহার হাসিটা কুমুদের ভালো লাগিল না।

ছোটোবাবুর কে হন? খানিক পরে কুসুমের একথার জবাবে সে তাই সংক্ষেপে শুধু বলিল, কেউ না। বন্ধু।

ছোটোবাবু আমাদের বলতে গেলে একরকম আপনার লোক। দুবেলা আসেন।

একথা শুনিয়াও কুসুমকে হঠাৎ আত্মীয়া-জ্ঞান করিয়া বসিবার মতো মনের অবস্থা কুমুদের ছিল না। সে বলিল, ঢোড়া সাপের বিষ থাকে না কেন?

সব সাপের কি বিষ থাকে? ঢোড়া হল জলের সাপ। আমায় একবার কামড়েছিল। হয়তো ওই সাপটাই হবে। একদিন খুব ভোরে এই পুকুরে নাইছি, বেড়াতে বেড়াতে ছোটোবাবু এসে পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে গল্প করতে লাগলে। এমনি সময়ে সাপটা এইখানে কামড়ে দিল,-কুসুম তাহার লিভারটা দেখাইয়া দিল। তাহার বোধ হয় ধারণা ছিল মানুষের হৃদয়ের অবস্থানটা ওইখানে-ছোটোবাবুকে বললাম,সাপে কামড়েছে ছোটোবাবু। শুনে ছোটোবাবুর মুখ যা হয়ে গেল!

কী হয়ে গেল?–কুমুদ কৌতুহল বোধ করিতেছিল।

শুকিয়ে গেল। ছাইবর্ণ হয়ে গেল।

সাপের কামড়ে তোমার কিছু হল না?

কুমুদ তুমি বলায় কুসুম রাগ করিয়া বলিল, কথা বলতে শেখোনি দেখছি তুমি। ভদ্দরলোক তো?

তারপর দুজনেই দমিয়া যাওয়ায় আর কথা হইল না। তালগাছগুলি নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। একটা মাছরাঙা ঝুপ করিয়া তালপুকুরে আছড়াইয়া পড়িল।

দুপুরবেলাটা বন্ধুর সঙ্গে গল্প করিয়া কাটাইয়া বেলা পড়িয়া আসিলে কুমুদ বিদায় গ্রহণ করিল।

সকাল সকাল পালা শুরু হবে। যাবি তো শশী?

যাব বইকী! নিশ্চয় যাব।

হারুর বাড়ির পিছনে সাতগাঁ পর্যন্ত বিস্তারিত ধানের খেত। তালপুকুরের ধার হইয়া ক্ষেতের আল দিয়া কুমুদ সাতগাঁর কাছারিবাড়ি পৌঁছিল। তালপুকুরে সে মতিকে দেখিবার আশা করিতেছিল। কিন্তু যাত্রা শুনিতে যাওয়ার আয়োজনে ব্যস্ত মতির পুকুরে আসিবার সময় ছিল না। কুসুম রাধিতেছিল। সন্ধ্যার আগেই খাওয়ার পাট চুকিয়া যাওয়া চাই মতি বিনা-বাক্যব্যয়ে তাহার সমস্ত হুকুম পালন করিয়া যাইতেছিল।

পরাণ সব বিষয়ে উদাসীন। সন্ধ্যার আবির্ভাবে তাহার বোন আর বউ যত ব্যস্ত হইয়া ওঠে, সে যেন ততই ঝিমাইয়া যায়। রান্নাঘরে বসিয়া কুসুমের সঙ্গে সে প্রথম একটু গল্প জমাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। গল্প করিবার সময় না-থাকায় কুসুম তাহাতে আমল দেয় নাই; দাওয়ায় বসে ইকা টান গে না বাপু মেয়েমানুষের আচল-ধরা পুরবষকে আমি দু চোখে দেখতে পারি না।-কুসুমের ভর্ৎসনায় চিরকাল পরাণের খারাপ লাগে। তবে স্পষ্ট খারাপ লাগার ভাবটা এত অল্প সময়ের মধ্যে মনের একটা উদাস বৈরাগ্য ও দেহের এতটা ঝিমানো আলস্যে পরিণত হইয়া যায় যে, রাগিবার অবসর প্রায়ই সে পায় না। মাঝে মাঝে কুসুমকে তাহার ভারি ছেলেমানুষ মনে হয়। চোদ্দ বছর বয়সে তার বউ হইয়া এতকাল কুসুমের শরীরটাই যেন বড়ো হইয়াছে, মনের বয়স বাড়ে নাই।

মোক্ষদাকে একখানা ফরসা কাপড় পরিতে দেখিয়া পরাণ জিজ্ঞাসা করে, তুমিও যাবে নাকি মা, যাত্রা শুনতে?

না, আমার আবার যাত্রা কী?

জোর করিয়া ধরিলে মোক্ষদা যাইতে রাজি আছে। কিন্তু এরা কেউ যাইতে বলিবেও না। আগে হইতেই মোক্ষদা তাহা জানে। তাই সাতরাদের বুড়ি পিসির সঙ্গে সে আগেই ঠিক করিয়া রাখিয়াছে। তারা দুজনে যাত্রা শুনিতে যাইবে। বাড়ি আসিয়া মেক্ষদা তাহা হইলে

বলিতে পারবে, যাত্রা শুনিবার শখ তাহার একটুও ছিল না। কী করিবে, আর একজন টানিয়া লইয়া গেল। জোর করিয়া টানিয়া লইয়া গেল।

পরাণ বলে, ফরসা কাপড় পরে তুমি তবে যাচ্ছ কোথা?

সাতরাদের বাড়ি যাবি বাবা। যদুর পিসি একবার ডেকেছে।

কুসুম ঝা করিয়া সামনে আসিয়া পড়ে।

কাল যেও মা, কাল যেও। আমরা এখন বেরোব, তুমি চললে সাতরাদের বাড়ি। বাড়িতে তা হলে থাকবে কে?

মোক্ষদা তার কী জানে। যার খুশি থাক।

তোমরা যাবে যাত্রা শুনতে, বাড়ির ব্যবস্থা তোমরাই করো বাছা। আমি তার কী জানি? আমি বুড়োমানুষ, সব ব্যাপারে আমাকে টানো কেন? আমি আছি নিজের শতেক জ্বালায়।

কুসুম রাগিয়া বলে, জ্বালা বাপু সংসারে সবারই আছে। ঘরে বসে জ্বললেই হয়। এমন শয়তা করা কেন? আগেই জানি শেষকালেতে ফ্যাকড়া বাধবে।

মোক্ষদা বোধহয় একটু লজ্জাবোধ করে। হয়তো তাহার মনে হয় বুড়োমানুষের যাত্রা শুনিতে যাওয়ার জন্য এত কাণ্ড করা উচিত নয়। বাড়িতে থাকিতে রাজি হইয়া সে গুম হইয়া বসিয়া থাকে।

রান্না শেষ করিয়া কুসুম স্বামীকে খাওয়ায়, তারপর ননদের সঙ্গে এক থালায় নিজে খাইতে বসে। পরাণ পেট ভরিয়া খায়, কুসুম আর মতির গলা দিয়া আজ ভাত নামিতে চায় না। ফেলা-ছড়া করিয়া কোনোরকমে তাহারা খাওয়া শেষ করে। দিনের আলো যত স্নান হইয়া আসে মনের মধ্যে তাহাদের এই আশঙ্কা ততই প্রবল হইয়া উঠে যে, ওদিকে বুঝি যাত্রা শুরু হইয়া গেল। মতিকে কাপড় পরিতে হুকুম দিয়া কুসুম হেশেল তুলিয়া ।

ফেলে। পুকুর যাওয়ার সময় এখন নাই। উঠোনের এককোণে ছাইফেলা আমগাছটির তলে বসিয়া বাসন ক'খানা কুসুম তাড়াতাড়ি মজিয়া নেয়। এই সুবিধাটুকুর ব্যবস্থা সে সেই বিকালেই করিয়া রাখিয়াছে। দু কাখে দুটি কলসি বহিয়া কত জল তুলিয়া কুসুম যে আজ হাড়িগামলা ভর্তি করিয়াছে।

মতি বলে, আমিও হাত লাগাই বউ, শিগগির হয়ে যাবে, অ্যাঁ।

না। মতি তাড়াতাড়ি কাজ করিতে পারে এ-বিশ্বাস কুসুমের নাই। এক মিনিটের কাজে মতি দশ মিনিট লাগাইয়া দেবে।

যা বললাম তাই কর তো তুই। কাপড় পরতেই তো তোমার দশ ঘণ্টা।

একসময় গোধূলি শেষ হওয়ার আগেই, কী করিয়া কাজ শেষ হয়। বাকি থাকে শুধু এটা আর ওটা, যা করিলেও চলে, না করিলেও চলে। কুসুমের তাড়ায় পরাণ ও মতি দুজনেই কাজ সমাপ্ত করিয়াছে। নিজে সাজিতে গিয়া ওদের দুজনকে দেখিয়া কুসুম এতক্ষণে একটু হাসিল। শার্টের উপর উড়ানি চাপানোয় পরাণকে একেবারে বাবু-বাবু দেখাইতেছে। আর ডুরে শাড়ি পরিয়া মতি হইয়াছে সুন্দরী। মতির হালকা অপরিণত দেহটাকে কুসুম হিংসা করে। মনে হয় তাহার নিজের স্বাস্থ্য এতখানি ভালো না হইলেই যেন সে খুশি হইত। ডুরে শাড়ি তারও আছে বইকী। তবে আজকাল রঙিন লাইন দিয়া শশীর ঢাকিতে কুসুমের লজ্জা

করে।

আসরে যখন তাহারা পৌঁছিল, যাত্রা আরম্ভ হইতে বিলম্ব আছে। চিকের আড়ালে জায়গার জন্য কলহ শুরু হইয়া গিয়াছে ইতিমধ্যেই। সকলেই চিক ঘেষিয়া বসিতে চায়, এগারো বছরের সদ্য-পদা-পাওয়া মেয়ে হইতে তাহার পঞ্চাশ বছরের দিদিরা পর্যন্ত।। এসব বিষয়ে কুসুম ভারি ওস্তাদ। সকলকে ঠেলিয়া-ধুলিয়া সেই-যে সে চিকের কাছে প্রথম সারিতে একটা দশ ইঞ্চি ফাঁকের মধ্যে নিজেকে গুজিয়া দিল, কেহ আর তাহাকে সেখান

হইতে নড়াইতে পারিল না। মতি তাহার পিঠের সঙ্গে মিশিয়া সংস্কৃত সাহিত্যের ছুচের পিছনে সূতা চলার উপমার মতো আগাইয়া আসিয়াছিল। কুসুমের পিঠ ঘেষিয়া সে একরকম চরণ দত্তের গৃহিণীর কোলের উপরেই বসিয়া পড়িল। চরণ দত্তের গৃহিণী । তাহাকে ঠেলিতে আরম্ভ করায় কুসুমের কোমর সে জড়াইয়া ধরিল প্রাণপথে।

কুসুম মুখ ফিরাইয়া চোখ রাঙাইয়া চরণ দত্তের গৃহিণীকে বলিল, মেয়েটাকে ঠেলছ কেন গা? কেন ঠেলছ? গাল দিলে ভালো হবে। সরে বোসো, জায়গা দাও। সবাই বসবে, সবই দেখবে-তোমার একার জন্য তো যাত্রা নয়?

কুসুমকে মতির এত ভালো লাগিল! কুসুমের কাছে মতি এত কৃতজ্ঞতা বোধ করিল!

যাত্রা শুরু হওয়ার একটু আগে কুসুম বলিল, ওই দ্যাথ মতি, ছোটোবাবু।

দেখেছি।

এত লোক, এত আলো, এত শব্দ-মতির নেশা লাগিয়া গিয়াছিল। পাটকরা মুগার চাদরটি কাধে দেওয়ায় শশীকে ভারি বাবু দেখাইতেছে। সে আসরে আসিয়া দাঁড়ানো মাত্র মতি তাহাকে দেখিতে পাইয়াছিল। স্বয়ং শীতলবাবু তাহাকে ডাকিয়া কাছে বসাইলেন দেখিয়া শশীর সম্মানে মতিরও সম্মানের সীমা নাই।

শামিয়ানার তলা ভরিয়া গিয়া খোলা আকাশের নীচে পর্যন্ত লোক জমিয়াছে। দুজন স্থূলকায়া গৃহিণীর মাঝে পড়িয়া মতির গরম বোধ হইতেছিল। এদিকে একসময় বাজনা বাজিয়া ওঠে। কনসার্ট-ঐকতান। শুনিলে এমন উত্তেজনা বোধ হয়! কিছু একটা উপভোগ্য ঘটিবার প্রত্যাশা, তারপর বাজনা থামিয়া যাত্রা শুরু হয়। ষোলোজন সখী আসিয়া নৃত্য আরম্ভ করে। তাদের পরনে পশ্চিমা ঘাগরা।

মতি ফিসফিস করিয়া বলে, ব্যাটাছেলে সখি সেজেছে, না বউ?

সখীরা লাচিয়া গেলে প্রবেশ করেন জনা ও অগ্নিদেব। জনাকে দেখিয়া মতির সন্দেহ হয়। ও নিশ্চয়ই মেয়েমানুষ, বউ! না?

তোর মাথা। চুপ কর, শুনতে দে।

প্রবীরের প্রবেশ দ্বিতীয় দৃশ্যে। গঙ্গাদেবীর পুত্রঘাতী অর্জুনকে যথাবিধি শাস্তি দিবার প্রতিজ্ঞামূলক একপৃষ্ঠাব্যাপী স্বগত উক্তির পরেই। প্রবীরকে দেখিয়াই আসর মুগ্ধ হইয়া যায়। স্মার্ট সাজপোশাক, কী লালিত্যময় যৌবনমূর্তি, তলোয়ারটা কী চকচকে। কথা যখন সে বলে, আসরে একটা শিহরন বহিয়া গিয়া শ্রোতারা যেন পরম আরামবোধ করে। জমিবে, প্রবীরের পার্ট জমিবে। খাসা জমিবে। যেমন রাজপুত্রের মতো চেহারা, তেমনি চমৎকার গলা। প্রবীরের প্রিয়া মদনমঞ্জরীও আসরে আছেন। এত লোকের মাঝে এ যেন একান্ত নির্জন রাজোদ্যান, এমনি নিঃসঙ্কোচ নির্ভুল আবেগমথিত স্বরে প্রবীর তাহাকে ভালোবাসিতে থাকে। যাত্রার আসরে হাত ধরার অতিরিক্ত প্রেমস্পর্শ নিষিদ্ধ। সেজন্য প্রবীরের কোনো অসুবিধা আছে মনে হয় না। শুধু কথায়, শুধু অভিনয়ে এতগুলি লোকের মনে সে বিশ্বাস জন্মাইয়া দেয় যে তাহারা দুজন একদেহ একপ্রাণ!

অবাক হয় কুসুম, আর মতি।

কুসুম বলে, ওলো, এ যে সেই লোকটা!

মতি বলে, কী সুন্দর করছে বউ, মনে হচ্ছে যেন সত্যি!

কুসুম একটু হাসে, যেন তোর সঙ্গেই করছে, না?

মতি জবাব দেয় না। শোনে।

প্রবীর বলে :

রাগ করিয়াছ?

কেন রাগ করিয়াছ অবোধ বালিকা?
কেন এত অভিমান? দুটি চোখে
কেন এত ভর্ৎসনা? মুখে মেঘ
উঠিতেছে বুক দেখে মনে হয়
মন্দ বলিয়াছি।
এ গাম্ভীর্য, হাসিহীন এত কঠোরতা
ফুলে কি মানায়, সখি,
মানায় কুসুমে? আমি তোরে ভালোবাসি,
সত্য কহিয়াছি, প্রাণদিয়ে ভালোবাসি তোরে।
সাক্ষী নারায়ণ। সাক্ষী মোর হৃদয়ের

মতির বুকের ভিতর শিরশির করে। কুসুম মনে-মনে অধীর হইয়া ভাবে বল না লক্ষ্মীছড়ি, রাগ করিনি; মুখ ফুটে ও-কথাটা তুই আর বলতে পারিস না? ধন্য প্রাণ তোর।

রাত তিনটা অবধি যাত্রা শুনিয়া আসিয়া ঘুম ভাঙিতে পরদিন সকলেরই বেলা হয়। হয় না শুধু শশী আর পরাণের। যামিনী করিবাজের বউ রোগের বিপজ্জনক অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। সকাল সকাল উঠিয়া স্নান করিয়া শশী তাহার কাছে যায়। পরাণের ক-বিঘা জমির ফসল অবিলম্বে ঘরে না-তুলিলেই নয়। নিজে উপস্থিত না-থাকিলে সাতাশটা খেজুরগাছের রসই তাহার অর্ধেক চুরি হইয়া যাইবে।

তালগাছ ছাড়া আর কোনো গাছ পরাণ এবার জমা দেয় নাই। এবার সে নিজেই খেজুররম জ্বল দিয়া গুড় করবে। ডাঙা জমিতে এবার সে কিছু মূলারও চাষ করিবে স্থির করিয়াছে। শশী বলিয়াছে, জমিতে হাড়ের সার দিলে মূলা ভালো হয়। দশ সের গুড়া হাড় পরাণ পরীক্ষার জন্য আনাইয়া লইয়াছে। এখনো জমিতে দেওয়া হয় নাই। পরাণের অনেক কাজ।

দুপুরে কুমুদ শশীর বাড়িতে আসিল। শশী বাড়ি ছিল না। গোপাল জানিয়াছে কুমুদ যাত্রা করে। কুমুদকে সে বাড়ির বেড়া পার হইতে দিল না। বাহিরের ঘরে বসাইয়া রাখিল।

দাবা খেলতে পারো হে?

আজ্ঞে না।

গোপাল তখন বাড়ির মধ্যে গেল ঘুমাইতে। কুমুদ, গত রাত্রের হাজার নরনারীর হৃদয়জয়ী কুমুদ, নিজেকে পরিত্যক্ত বন্ধুহীন মনে করিয়া গেল তালপুকুরের ধারে। সেখানে তাহার বন্ধু জুটিল মতি।

মতি কি মাঝে মাঝে তালপুকুরে কবিত্ব করিতে আসে? নিঝুম দুপুরের অলস প্রহরগুলি ঘরে কি তাহার কাটে না? কে বলিবে! আজ কিন্তু সে বিশেষ দরকারেই তালপুকুরে আসিয়াছিল। পুকুরপাড়ে কাল সে কানের একটা মাকড়ি হারাইয়াছে। যাত্রা দেখার উৎসাহে কাল খেয়াল থাকে নাই। আজ স্নানের সময় কানে হাত পড়িতে,-ওমা, মাকড়ি কোথায়? ভয়ে কথাটা সে কাহাকেও বলে নাই। দুপুরে সকলে ঘুমাইলে চুপিচুপি খুঁজিতে আসিয়াছে।

রুপা নয়, তামা নয়, সোনার মাকড়ি। কী হইবে?

মাকড়ি মতি পাইল না। পাইল কুমুদকে। উভয় পক্ষই কৃতার্থ হইয়া গেল! কুমুদ এ জগতের রক্তমাংসের মানুষ নয়, রূপকথার রাজপুত্র, মহাতেজা, মহাবীর্যবান, মহামহা প্রেমিক। হা, কুমুদ মাটির পৃথিবীর কেহ নয়। পৃথিবীর সেরা লোক শশী, কুমুদ শশীর মতোও নয়। ছোটোবাবুর কথা মতি কী না জানে? ছোটোবাবু কী খাইতে ভালোবাসে তা পর্যন্ত। কুমুদ কী খায় কে তার খবর রাখে? শার্ট-পরা কুমুদ হইল রাজপুত্র প্রবীর। শশী কে?

কী খুঁজছ খুকী?

মতি বলে। বলিতে মতির ভালো লাগে। সোনার মাকড়ি হারানো যেন বাহাদুরির কাজ। বলে, বাড়িতে জানালে মেরে ফেলবে।

মেরে ফেলবে? বাড়িতে তোমাকে খুব মারে নাকি?

এমনি মারে না। দামি জিনিস হারালে মারে। আজ আপনি কী সাজবেন?

রাবণ। কুমুদ হাসে।

হ্যাঁ, রাবণ বইকী রাবণ তো দেখতে বিশ্রী?

কুমুদ খুশি হইয়া বলে, লক্ষ্মণ সাজব।

মতি উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাস করে, উর্মিলা কে সাজবে? কাল যে আপনার বউ সেজেছিল সে? আচ্ছা, ও তো ব্যাটাছেলে, অ্যাঁ?

কুমুম বলে, ব্যাটাছেলে বইকী।

মতির সঙ্গে কুমুদও মাকড়ি খোঁজে। তালপুকুরের ভাঙাচের ঘাট হইতে তালবনের মাঝামাঝি পর্যন্ত পায়ে-চলা পথের দুধারে।

বাড়ির কাছে পৌঁছিয়া যাওয়ার ভয়ে মতি বলে, ওদিকে নেই, আমি ভালো করে খুঁজেছি। ভাবে, প্রবীর চলিয়া গেলে এখান হইতে বাড়ি পর্যন্ত সে নিজেই খুঁজিয়া দেখিবে। খুঁজিতে খুঁজিতে দুজনে আবার ঘাটে ফিরিয়া যায়।

মতি বলে, কোথায় পড়ে গেছে কে জানে ও আর পাওয়া যাবে না।

না পেলে তোমায় মারবে, না? কে মারবে?

কে মারিবে মতি তাহার কী জানে? একজন কেউ নিশ্চয়।

তবে তো মুশকিল। কুমুদ চিন্তিত হইয়া বলে।

বলে, তোমার আর একটা মাকড়ি কই? দেখি, কী রকম?

অন্য মাকড়িটি মতি আঁচলে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। খুলিয়া দেয়। খুবই সাদাসিধে মাকড়ি, একটুকরা চাঁদের কোলে একরত্তি একটা তারা। তারার তলে চাঁদটা দোলে।

মাকড়ি হারিয়েছে কাউকে বোলো না খুকী।

কেউ টের না পাইলে মতি আপনা হইতে অবশ্যই বলিবে না। কিন্তু কেন?

কাল তোমাকে একটা মাকড়ি এনে দেব।

মতি অবাক হইয়া যায়।

পাবেন কোথায়?

কেন, গায়ে তোমাদের গয়নার দোকান নেই?

কিনে আনবেন!–মতির মনে হয় মাকড়ি কেনার আগে প্রবীর তাকেই কিনিয়া ফেলিয়াছে।

তাহার মাকড়িটা পকেটে ভরিয়া কুমুদ চলিয়ে গেলে, পুকুরঘাটে বসিয়া বসিয়া সে এই কথাটাই ভাবে। তাহাকে একটা মাকড়ি দেওয়া প্রবীরের কাছে কিছুই নয়। আর কত মেয়েকে হয়তো সে অমল কত দিয়াছে। বেশি না থাক, যাত্রার দলে দুটো একটা মেয়েও কি নাই? তবু তাহাকেই মাকড়ি দিতে চাওয়ার জন্য প্রবীর কী ভয়ানক ভালো।

আজ তাহাদের যাত্রা শুনিতে যাওয়া বারণ। পরাণ নিষেধ করিয়া দিয়াছে। রোজ রোজ যাত্রা শোনা কী? একদিন শুনিয়া আসিয়াছে, আজ বাদ যাক, কাল আবার শুনিবে। পরাণ ওদের যাত্রা শুনিতে যাওয়া পছন্দ করে না। কেন করে না তার কোনো কারণ নাই। ওরা যাত্রা শুনিয়া বেলা দশটা পর্যন্ত পড়িয়া পড়িয়া ঘুমাক আর না ঘুমক, পরাণের কিছুই

আসিয়া যায় না। প্রতিদিন প্রদোষের আধো-অন্ধকারে সে যখন বাহির হইয়া যায়, এ বাড়িতে কারো ঘুম ভাঙে না। তাহার সুখ-সুবিধার দিকে তাকানোর অভ্যাস এ বাড়িতে কাহারো নাই। এক বেলা ভাতের বদলে মুড়ি খাইয়া থাকিতে হইলে নালিশ করা পরাণকে দিয়া হইয়া উঠে না। তবু সে চায় না বাড়ির মেয়েরা যাত্রা শুনিতে যায়। পর পর দুদিন যাত্রা শুনিতে যায়।

তুমি যাবে না? না, নিজের বেলা ভিন্ন নিয়ম? কুসুম বলিল। সে রাগিয়াছে।

আমার সঙ্গে তোমার কথা কী? ব্যাটাছেলে নাকি?

তুমি গেলে আমিও যাব।

আমি যাব না তবে পরাণও মাঝে মাঝে গোঁ ধরতে জানে।

কুসুম বলে, তুমি যাও না যাও আমি কিন্তু যাব।

চুলোয় যাও।

মুখে যাই বলুক, কুসুম যাত্রা শুনিতে যাওয়ার কোনো আয়োজনই করিল না। পাড়ার অনেক বাড়ির মেয়েরা যাইবে। কুসুমও তাদের সঙ্গে যাইতে পারে। কিন্তু যাওয়ার চেয়ে না-যাওয়ার মধ্যেই এখন রাগ ও অভিমান বেশি প্রকাশ পায়, জিদও তাহাতেই বজায় থাকে বেশি। কুসুম তাই সারাটা দুপুর ঘুমাইয়া কাটাইয়া দিল।

সন্ধ্যার সময় বাজনার শব্দ শুনিয়া অস্থির হইয়া উঠিল মতি। প্রবীর আজ লক্ষ্মণ সাজিবে। কীরকম না জানি আজ দেখাইবে তাহাকো পারিলে মতি একাই চলিয়া যাইত। দু বছর আগেও এমন সে গিয়াছে। এখন আর সেটা সম্ভব নয়। দুবছরের মধ্যে সে যে কী ভয়ানক বড় হইয়া গিয়াছে ভাবিলেও মতির চমক লাগে। কিন্তু কী করা যায়। অমন করিয়া বাজনা বাজিতে থাকিলে ঘরেও টেকা অসম্ভব।

একসময় কুসুমকে সে বলিল, যাত্রা নাই শুনি, ঠাকুর দেখে আসি চল না বউ?

পরাণ দাওয়ায় বসিয়া অর্থসমস্যার কথা ভাবিতেছিল। সে ডাকিয়া বলিল, এদিকে শোন মতি, শুনে যা।

মতি কাছে আসিল কী বলছিলি?

ঠাকুর দেখতে যাব।

ঠাকুর দেখতে যাবি? আচ্ছা, চল। একটু যাত্রাও শুনে আসবি অমনি। ।

পরাণ অমনিভাবে একরকম স্পষ্টই হার স্বীকার করিল। কিন্তু কুসুম আর যাইতে রাজি নয়। এখন খাওয়াদাওয়া সারিয়া পান সাজিয়া যাইতে যাইতে পালা শেষ হইয়া যাইবে না।

ঠাকুরপূজার বাদ্য বাজছে। পালা শুরু হতে ঢের দেরি।–পরাণ উদাসভাবে বলিল।

মতি বলিল, চল না বউ? অমন করিস কেন?

কুসুম বলিল, গিয়ে বসবি কোথায়? তোর জন্যে জায়গা ঘুমোচ্ছে সর্ব্বাইয়ের পেছনে বসে যাত্রা শোনার চেয়ে ঘরে শুয়ে ঘুমানো ঢের ভালো।

পরাণ বলিল, ছোটোবাবুকে বললে–

ছোটোবাবুর নামোল্লেখে কুসুম আরও রাগিয়া কহিল, ছোটোবাবু কী করবে? জায়গা গড়িয়ে দেবে?

পরাণ বলিল, ছোটোবাবুর বাড়ির সবাই বাবুদের বাড়ির মেয়েদের জায়গায় বসে। নেটের পর্দা টাঙানো, দেখিসনি মতি? বাবুদের বাড়ি ছোটোবাবুর খাতির কত। ছোটোবাবুকে বললে তোদের ওইখানে বসিয়ে দেবে।

কুসুম হঠাৎ শান্ত হইয়া বলে, আমি যাব না।

তাহাকে আর কোনোমতেই টলানো যায় না। বাবুরা জমিদার, শশীরা বড়লোক। ওদের বাড়ির মেয়েদের কত ভালো-ভালো কাপড়, কত দামি দামি গয়না। একটা জবরজঙ্গ লেস-লাগানো জ্যাকেট গায়ে দিয়া তাতিবাড়ির কোরা কাপড় পরিয়া ওদের মাঝখানে (মাঝখানে তাহাকে বসিতে দিবে না ছাই, এককোণে ঝির মতো বসিতে হইবে) গিয়া বসিলে দম আটকাইয়া যাইবে কুসুমের।

শেষপর্যন্ত পরাণের সঙ্গে মতি একাই গেল। শশীকে খুঁজিতে হইল না। সে বাড়িতেই ছিল। সে বলিল, তোর তো কম শখ নয় মতি! কিন্তু সঙ্গে গিয়া মতির বসিবার একটা ভালো ব্যবস্থা করিয়া দিতে সে আপত্তি করিল না। বরং নেটের পর্দার আড়ালে, যেখানে বাবুদের বাড়ির মেয়েরা বসে, মতিকে সেখানে বসাইতে পারিয়া সে বিশেষ গর্বই বোধ করিতে লাগিল।

শীতলবাবুদের বাড়ির মেয়েরা গায়ে সিল্কের ব্লাউজ দেয়, বোম্বাই শাড়ি পরে। শীতলবাবুর ভাই কলিকাতা-প্রবাসী বিমলবাবুর স্ত্রী-কন্যারা পায়ে জুতাও দিয়া থাকে। দু'ভায়ের পরিবারের নারীর সংখ্যাও কি কম! সংসারে যেখানে যত টাকা সেখানে তত নারী, সেখানে তত পাপ। মতি সংসারের এ নিয়ম জানিত না সংসারে কোন নিয়মটাই বা সে জানে? কাঁচা মেয়ে সে, বোকা মেয়ে। প্রায় কুড়ি বগফিট পরিমাণ পরিষ্কার চাদরের উপর গাদা করা ঘষামাজা সাজানো গোছানো স্বজাতির মধ্যে আসিয়া পড়িয়া সে যেন দিশেহারা হইয়া গিয়াছিল।

বিমলবাবুর স্ত্রী শুধোন, আমার মুখে কী দেখছ বাছা?

বিলিবাবুর মেয়ে বলে, তোমার চশমা দেখছে মা।

মতির বুকের ভিতর চিপটিপ করে। তাহাকে বসিতে দেওয়া হইয়াছে সম্মানের আসনেই সামনের দিকে, পিছনে আশ্রিত পরিজনদের মধ্যে নয়। শীতলবাবু নিজে মেয়েটিকে সঙ্গে করিয়া পৌঁছাইয়া দিয়া বলিয়াছেন, সামনে বসিয়ো। শশী ডাক্তারের বাড়ির মেয়ে।

কাল শশী ডাক্তারের বাড়ির মেয়েরা যত বিশ্রী করিয়াই হোক খুব সাজিয়া আসিয়াছিল, এর আজ এ কী বেশ। শীতলবাবু আর বিমলবাবুর বাড়ির মেয়েরা এই কথা ভাবিয়াছিল। তাহারা কাপড় চেনে, গয়না চেনে, নিজেদের ঘষে এবং মাজে। ও মেয়েটা, ধরতে গেলে, রীতিমতো নোংরাই।

শীতলবাবুর পুত্রবধূ গতবার ছেলে হওয়ার সময় বাজিতপুরের সিভিল সার্জন আসিয়া পড়ার আগে শশীর হাতেই জীবন সমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। বিছানায় শুইয়া শুইয়া লভেল পড়ার সে কী ভীষণ শাস্তি! যাই হোক ছেলেটি ঝির কাছে দোতলায় এখন চোখ বুঝিয়া ঘুমাইতেছে। সিভিল সার্জন করিয়াছিল কচু, ছেলেটা একরকম শশী ডাক্তারের দান বইকী শীতলবাবুর পুত্রবধূ তাই একসময় মতিকে কৌতুহলের সঙ্গ জিজ্ঞাসা করিল, শশী ডাক্তার তোমার কে হয় গো?

কেউ না।

ওমা! কেউ না? এই রাত্রে তুমি পরের সঙ্গে যাত্রা দেখতে এলে?

পর কেন? দাদার সঙ্গে এসেছি।

তোমার দাদা কে? কাদের বাড়ির মেয়ে তুমি?

আমি ঘোষবাড়ির মেয়ে,–আমার বাবা স্বর্গীয় হারানচন্দ্র ঘোষ।

কথাটা শীঘ্রই রটিয়া গেল। হারু ঘোষের মেয়েকে তাহাদের মধ্যে গুজিয়া দেওয়ার স্পর্ধায় শশীর উপর শীতলবাবু আর বিমলবাবুর পরিবারের মেয়েরা বিশেষ অসন্তুষ্ট হইলেন। মতির কাছে যাহারা ছিলেন, তাহারা বাড়ির মধ্যে যাওয়ার ছলে উঠিয়া গেলেন এবং

ফিরিয়া আসিয়া অন্যত্র বসিলেন। হাত-পা ছড়াইয়া আরাম করিবার সুযোগ পাইয়াও মতির কিন্তু আরাম হইল না। অবহেলা অপমান বুঝিতে না-পারার মতো বোকা সে তো নয়।

এদিকে শশী মাঝে মাঝে সাজঘরে যায়। কুমুদকে প্রশংসা করিয়া বলে, বেশ হচ্ছে কুমুদ। তুই কলকাতার থিয়েটারে গেলি না কেন?

কুমুদ খুশি হইয়া বলে, ভালো হচ্ছে? চোদ্দো বছর উপোস করতে হয়েছে ভাই। তবু এখনো বউদিকে রাবণের হাত থেকে উদ্ধার করতে পারিনি। অযোধ্যায় ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে দাদাকে রাজা করতে পারলে বাঁচি।

কুমুদ হাসে। খানিক পরে অশোকবন থেকে বউদিকে আনতে যাব-রাবণবধ হতে বেশি দেরি নেই। সে সিনটা দেখিস। হ্যারে, তোদের গাঁয়ে গয়নার দোকান আছে?

শশী বলিল, গয়নার দোকান! গয়নার দোকান কোথায় পাব? দুটো স্যাকরার দোকার আছে, ফরমাশ দিয়ে গয়না তৈরি করে দেয়। ছোটো ছোটো দুটো একটা গয়না সময় সময় তৈরি করেও রাখে হয়তো, দোকান করার মতো কিছু নয়। গয়না কিনবি নাকি?

কিনব? আমি? কেন, গয়না কিনব কেন?

শশী একটু বিচলিত হয়। কুমুদ গয়নার দোকানের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছে কেন? তাও এক কথা বলিতে বলিতে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়াছে। কী ভাবিতেছে ও?

শশী ভাবে সৃষ্টিছাড়া গোয়ার ছেলে, জগতে এমন কাজ নাই যা করে না,-এইসব করিয়াই যেন সুখ পায়। কিন্তু গয়নার দোকানের খবর নেয় কেন? শশী আরও ভাবে যে খবর লইতে হইবে বিনোদিনী অপেরাপার্টি বাজিতপুরে অভিনয় করার সময় সেখানকার কোনো গয়নার দোকানে কিছু ঘটিয়াছে কি-না।

শশীর মনের মধ্যে সন্দেহটা খচখচ করিয়া বেঁধে বইকী। সে মনে করে বইকী যে আচ্ছা পাগল সে, এ কী কথা এও কী কখনও হয়? তবু সে ভাবিয়া রাখে, বাজিতপুরের গয়নার দোকানের গত দুমাসের কুশল কালই জানিবার চেষ্টা করিবে। এই অন্যান্য কাজটা করিবার আগাম প্রায়শ্চিত হিসাবে রাত বারোটার সময় বাড়ি ফেরার আগে কুমুদকে তাহার ওখানে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়া যায়।

পরাণকে বলে, মতিকে এবার বাড়ি নিয়ে যাও না পরাণ? কত রাত জাগবে?

পরাণেরও ঘুম পাইয়াছে। সে বললে, যাবে কী!

কিন্তু মতি ডাকিবামাত্র চলিয়া আসে। আজ যাত্রা শুনিতে তাহার ভালো লাগিতেছিল না। সে কাঁচা মনে বিনা-কারণেই সর্বদা আনন্দ ভরিয়া থাকে, যেকোনো একট তুচ্ছ উপলক্ষে মনে যাহার উত্তেজিত সুখ হয়, শীতলবাবু আর বিমলবাবুর পরিবারের মেয়েরা যাত্রা শোনার উৎসাহ তাহার নষ্ট করিয়া দিয়াছে। মতি যেন চুরি করিয়া বাড়ি ফিরিল। তবু, কী সুন্দর ওই মেয়েমানুষগুলি একএকজন যেন এক-একটি ছবি।

হারু ঘোষ যেখানে বজ্রাঘাতে মরিয়াছিল, সেখানটা বিষাক্ত সাপের আস্তানা। হারু ঘোষের বাড়ির কাছে তালবনের সাপগুলির বিষ নাই। বিষ নাই? কুমুদকে যে সাপট কামড়াইয়াছিল সেটার বিষ ছিল না। সেটা জলের সাপ, ঢোঁড়া সাপ। কিন্তু তালবনের সাপ কি জলের সাপ, সব সাপ কি ঢোড়া সাপ? কে বলিবে! মতি তাহা জানে না। শেষপর্যন্ত তাহাকে স্বীকার করিতে হয় যে অন্য সাপে কামড়ালে হয়তো যেতেন মরে।

মতির দুকানে দুটি মাকড়ি দোলে। মাকড়িদুটির চাদদুটির কোলে একরতি তারাদুটিও দোলে। কুমুদ নিজের হাতে তাহাকে মাকড়ি পরাইয়া দিয়াছে। ওর মধ্যে একটা নূতন ঝকঝকে অন্যটা অনেক দিনের পুরোনো, মলিন। এ একটা সমস্যার কথা বইকী! মতি যত বোকাই হোক-আসলে সে আর এমন কী বেশি বোকা? এটুকু মতি খেয়াল

করিয়াছিল। নূতন মাকড়ি দেখিলেই সকলে ধরিয়া ফেলিবে যে দে বলবে কী? কৈফিয়ত দিবে কী? রাজপুত্র প্রবীর, দুপুরবেলা তালপুকুরের ধারে মাকড়িটি নিজের হাতে তাহার কানে পরাইয়া দিয়েছে শুনিলে বাড়িতে তাহাকে আর আস্ত আস্ত রাখিবে না। কুমুদ এ সমস্যার মীমাংসা করিয়া দিয়াছে। বাড়ি যাওয়ার আগে (বাড়ি যেন মতির কত দূর!) কান হইতে দুটা মাকড়িই মতি খুলিয়া ফেলিবে। রাত্রে তেতুল মাখাইয়া রাখিয়া দিয়া সকালে সোডা দিয়া মাজিলে দুটি মাকড়িকেই মনে হইতে মাজিয়া ঘষিয়া পরিষ্কার করা পুরানো মাকড়ি। জিজ্ঞাসা করিলে মতি বলিবে, সাফ করেছি। তেতুল দিয়ে আর সোডা দিয়ে। মতি এই কথা বলিবে! এই সত্য কথাটা।

কুমুদের বুদ্ধি দেখিয়া মতি অবাক হইয়া গিয়াছে।

–অন্য সাপে কামড়ালে মরে যেতাম? আমি মরে গেলে তুমি কী করতে?

আমি? আমি কী করতাম? কী জানি কী করতাম।

কাঁচা মেয়ে। একেবারেই কাঁচা মেয়ে। কিন্তু মনে মনে মতি সবই জানে। কী জানে না সে? সেদিন কুমুদ সাপের কামড়ে মরিয়া গেলে সে কিছুই করিত না এক নম্বর, মতি এটা জানে। দু নম্বর সে জানে, কুমুদ শুনিতে চায় সে মরিয়া গেলে মতি একটু কাদিত। মতি এত কথা জানে! সে কিছু করিত না এই সত্যকথা, আর সে যে একটু কাদিত এই মিথ্যাকথা, এর কোনোটাই যে বলিতে নাই, এও যদি মতি না জানিবে-মধ্যবর্তী ও জবাবটা দিয়া সে অজ্ঞতার ভান করিল কেন? তবু, যত হিসাবই ধরা যাক মতি কাঁচা মেয়েই।

এখন যদি মরে যাই? কুমুদ বলে।

তা হলে আমি–এখন যদি মরে যান? দূর, মরার কথা বলতে নেই।

কে জানে মতি এসব শিখল কোথায়! আপনা হইতে শিখিয়াছে নিশ্চয়কথা বলিতে, কাপড় পরিতে, ভাত খাইতে শেখার মতো। এসব কেহ শেখায় না। কে শিখাইবে? এবং তারপর কুমুদ মতিকে নানা কথা জিজ্ঞাসা করে। আর ছেলেমানুষি প্রশ্ন নয়। তাহার নিজের কথা, অষ্ট্রীয়-স্বজনের কথা, তাহার গ্রামের কথা। মতি আগ্রহের সঙ্গে সকল প্রশ্নের জবাব দেয়। কখনও পালটা প্রশ্ন করে। কখনওবা আপনা হইতেই কুমুদকে অনেক অতিরিক্ত অবান্তর কথা বলে। তাহার সরল চাহনি একবারও কুটিল হইয়া ওঠে না। তাহার নির্ভরশীলতা কখনও টুটিয়া যায় না। না, মতির কোনো ভাবনা নাই। সে কিছু জানে না, কিছু বোঝে না, পৃথিবীর সবই তাহার কাছে অভিনব, অভিজ্ঞতার অতীত। কুমুদকে হাত ধরিতে দেওয়া উচিত কি অনুচিত সে তার কী জানে। ওসব কুমুদ বুঝিবে। রাজপুত্র প্রবীর বুঝিবে। মতির বিশেষ লজ্জাও করে না। তবে, হঠাৎ চোখ নিচু করিয়া একটু যে সে হাসে সেটা কিছু নয়।

দিন ও রাত্রির মধ্যে দুপুরের সময়ের গতি সবচেয়ে শিথিল। দুপুরের অন্ত নাই। আকাশের সূর্য কতক্ষণে কতটুকু সরিয়া তাহদের গায়ে রোদ ফেলেন জানা যায় না। তাহারা উঠিয়া টিলাটার দিকে চলিতে থাকে। ওদিকে নিবিড় ছায়ার ছড়াছড়ি।

৫. যামিনী কবিরাজের বউ সেনদিদি

যামিনী কবিরাজের বউ বাঁচিয়া উঠিয়াছে। ভগবানের দয়া, যামিনী কবিরাজের বউ-এর কপাল, শশীর গৌরব।

গোপাল ছেলের সঙ্গে আজকাল প্রায় কথা বন্ধ করিয়া দিয়াছে। যামিনী কবিরাজের বউ বাঁচিয়া উঠিয়াছে বলিয়া নয়, অন্য কারণে। অন্য সাধারণ মানুষের তাই ধরিয়ালওয়া উচিত। ব্যাপারটা হইয়াছিল এই। শশীর বেশ পসার হইয়াছে। বাজিতপুরের সরকারি ডাক্তারকে ডাকিতে খরচ অনেক। অনেকে শশীকেই ডাকে। যামিনী কবিরাজের বেএর চিকিৎসার জন্য কয়েকদিন শশী দূরে কোথাও যাওয়া তো বন্ধ রাখিয়াছেই, তিন মাইল দূরের নন্দনপুরের কল পর্যন্ত ফিরাইয়া দিয়াছে। এই সময়টা যামিনী কবিরাজের বউ মরিতে বসিয়াছিল। গোপালের উস্কানিতে যামিনী ঝগড়া করিয়া অপমান করিয়া শশীর আসা-যাওয়া বন্ধ করিবার চেষ্টা করিয়া সফল হয় নাই। দূর গ্রামে রোগী দেখিতে পাঠাইতে না পারিয়া ছেলের উপর গোপাল খেপিয়া গিয়াছে। অথচ বাড়াবাড়ি করিবার সাহস তাহদের ছিল না। শশীকে তাহারা দুজনেই ভয় করিতে শুরু করিয়া দিয়াছিল। মনে পাপ থাকার এই একটা লক্ষণ। মনে হয়, সকলে বুঝি সব জানে। সাপ উঠিয়া পড়ার আশঙ্কায় কেচো খুঁড়িবার চেষ্টাতেও মানুষ ইতস্তত। আকশে চাঁদ উঠে, সূর্য ওঠে। পৃথিবীটা চিরকাল ঈশ্বরের রাজ্য। মানুষের এই বদ্ধমূল সংস্কার সহজে যাইবার নয়। হাজার পাপ করিলেও নয়।

এমনি করে তুমি, গোপাল বলিয়াছিল, পসার রাখবে? লোকে ডাকতে এলে যাবে না? মক্কেল ফিরিয়ে দেব?

বলিয়াছিল, যামিনী খুড়ো কোনোদিন এতটুকু উপকার করবে যে ওর জন্য এত কছ? নিজের সর্বনাশ করে পরের উপকার করে বেড়ানো কোন দেশী বুদ্ধির পরিচয় বাপু?

আমার মার যদি ওমনি অসুখ হত?-শশী বলিয়াছিল। কেন বলিয়াছিল কে জানে!

তোমার মা তো বাপু বেঁচে নেই। কপাল ভালো, তাই আগে আগে ভেগেছেন। তোমার যা সব কীর্তি–যে কীতি সব তোমার; তুই উচ্ছন্ন যাবি শশী।

যামিনী কবিরাজের বউ বাঁচিয়া উঠিবার পর বিপজ্জনক গাম্ভীর্যের সঙ্গে গোপাল বলে, এইবার কাজকর্মে মন দাও শশী। যামিনী খুড়োর ইচ্ছে নয় তুমি ওদের বাড়ি যাও।

ঠাকুর্দাকে পুলিশে দেওয়া উচিত।

সর্বনাশ! শশী এসব বলে কী!

তোমার ইচ্ছেটা কী শুনি? হ্যা রে বাপু, মনের বাসনাটা তোমার কী? সব ছেড়েছুড়ে আমি কাশী চলে গেলে তমি বোধহয় খুশি হও? গুরুদেব তাই বলছিলেন। বলছিলেন, আর কেন গোপাল, এইবার চলে এসো। আমি ভাবছিলাম, শশীর একটু স্থিতি করে দিয়ে যাই, হঠাৎসব ছেড়ে চলে গেল ও কোনদিক সামলাৰে। কিন্তু তুমি এরকম আরম্ভ করলে আর একটা দিনও আমি থাকি কী করে?

গোপাল করিবে সংসার ত্যাগ, গোপাল যাইবে কাশী সম্মুখযুদ্ধ ত্যগ করিয়া পিছন হইতে গোপালের এই ধরনের আকস্মিক আক্রমণ শশীর অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। সে এতটুকু টলে না।

কী অন্যায় কাজটা করেছি আমি, তাই বলুন না।

কী করেছ? মুখে চুনকালি মেখেছ। সবাই কী বলছে তোমার কানে যায় না-আমার কানে আসে। যামিনী খুড়োর বউ-এর অসুখে তোমার এত দরদ কেন? ডাক্তার মানুষ তুমি, একবার গেলে, ওষুধ দিলে, চলে এলে। দিনরাত রোগীর কাছে পড়ে থাকলে বলবে না লোকে যে আগে থাকতে কিছু না থাকলে।

এসব আপনার বানানো কথা।

এ অভিযোগ সত্য বলিয়া গোপালের রাগ বাড়িয়া যায়। গোপাল ছেলের সঙ্গে কথা বলে না।

একটি কথা নয়। বাহিরের ঘরে ফরাশের উপর খাতাপত্র ছড়াইয়া বসিয়া গোপাল হিসাব দেখে,-খাতক, ঋণপ্রার্থী, পরামর্শপ্রার্থী ও অনুগ্রহপ্রার্থীদের সঙ্গে কথা বলে। শশী ঘরের ভিতর দিয়া পার হইয়া যাইবার সময় গোপাল হঠাৎ কথা বন্ধ করিয়া আড়চোখে ছেলের দিকে তাকায়। কথা বলিবে না, না বলুক, ছেলেকে গলার আওয়াজও সে শুনাইবে না কি? তা-নয়। শশীকে দেখলে গোপালের ডাকিতে ইচ্ছ হয়, শশী শোন। এই ইচ্ছাটা দমন করিবার সময় গলা দিয়া গোপালের আওয়াজ বাহির হয় না। গোপাল বাক্যহারা হইয়া থাকে।

শশী বাহির হইয়া গেলে অনুগ্রহপ্রার্থীকে বলে, শুধিয়ে এসো তো যাচ্ছে কোথায়?

সে যদি আসিয়া বলে,-যামিনী কবিরাজের বাড়ি-গোপাল একদম খেপিয়া যায়।

ইয়ারকি? ইয়ারকি হচ্ছে আমার সঙ্গে?

অনুগ্রহপ্রার্থীর চোখে আর পলক পড়ে না।

যামিনী কবিরাজের বউ-এর গুটিগুলি শুকাইয়া ঝরিয়া পড়িতে কাতিক মাস কাবার হইয়া অগ্রহায়ণেরও কয়েক দিন গিয়াছে। তাহকে দেখিলে এখন ভয় করে, করুণা হয়। সর্বাঙ্গের ছোট ছোট ক্ষতগুলি এখনো লালচে রঙের কদর্য কতকগুলি গর্ত। সময়ে বারকয়েক চুমটি পড়িয়া পড়িয়া ক্ষতের কতক দাগ অনেকটা মিলিয়া আসিবে, কতক থাকিবে। কিন্তু যামিনী কবিরাজের বউ-এর রূপের খ্যাতি আর রহিল না। রূপই গেল নষ্ট হইয়া, রূপের খ্যাতি!

একটা চোখও তার নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

এই ক্ষতিটাই যামিনী কবিরাজের বউকে কাবু করিয়াছে সবচেয়ে বেশি। শুধু ক্ষতচিহ্নে ভরিয়া রূপনষ্ট হওয়াটাও তাহার কাছে সহজ ব্যাপার নয়। রূপ তাহার তেত্রিশ বছরের

আত্নীয়, তেত্রিশ বছরের আভ্যাস। একগোছা চুল কাটিতে মেয়েরা কাতর হয়, এ তো তাহার সর্বাঙ্গণ সৌন্দর্য, আসল সম্পত্তি। তবু এটা তার সহ্য হইত। মনকে সে এই বলিয়া বুঝাইতে পারিত যে আর কী তাহার ছেলেখেলার বয়স আছে? ছেলে-ভুলানো রূপ দিয়ে এখন সে করিবে কী? কিন্তু চোখ কানা হইয়া যাওয়া! এ তো রূপ নষ্ট হওয়া নয়, এ যে কুৎসিত হওয়া, কদর্য হওয়া! তাহাকে দেখিলে এবার যে লোকের হাসি পাইবে? তাহার অমন ডাগর চোখ!

চোখ নষ্ট হয়ে গেল শশী! আমি কানা হয়ে গেলাম।

কী আর করবেন সেনদিদি? বেঁচে যে উঠেছেন—শশী সান্ত্বনা দেয়।

এর চেয়ে আমার মরাই ভালো ছিল শশী, যামিনী কবিরাজের বউ বলে।

বলে, দেখলে ঘেন্না হয় না?

না না, ঘেন্না হবে কেন? ঘেন্না হয় না।

যামিনী কবিরাজের বউকে দেখিলে শশীর দুঃখ হয়, ঘেন্না হয়তো হয় না। না, ঘেন্না হয় না।

শশী সেরকম নয়।

কিন্তু সেনদিদির দাম যে কমিয়াছে তাতে সন্দেহ নই। শশী অবশ্য বুঝিতে পারে না, সেনদিদির আকর্ষণ যতখানি কমিয়াছে সহানুভূতি দিয়া তাহার ক্ষতিপূরণ হইয়াছে। সেনদিদির হাসি আর দেখিবার মতো নয়, তাহার একটি চোখে এখন আর গভীর স্নেহ রূপ নেয় না, তাহার মুখের দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া থাকিবার সাধ্য এখন আর কাহারও নাই। সেনদিদির মুখের কথা, তাহার মেহর ও পক্ষপাতিত্ব আজ আর অমূল্য নয়। তাহার জন্য শশীর দুঃখ হয় কিন্তু শশীকে সে আর তেমনিভাবে টানিতে পারে না।

প্রতিদিন সেনদিদিকে দেখিতে আসার সময় শশী আজকাল পায় না। আসিলেও, বেশিক্ষণ বসিবার তাহার উপায় নাই। যামিনী কবিরাজের বউকে ভালো করিয়া শশীর পসার কয়েক দিনেই বাড়িয়া গিয়াছে। রোগীকে সে আর ফিরাইয়া দেয় না, দেখিতে যায়, পকেটে টাকা লইয়া বাড়ি ফেরে। একটা রাত্রি সে তো নন্দপুরেই কাটাইয়া আসিল। যাতায়াতের খরচ আর দশ টাকা ভিজিট। গ্রামে দশটা রোগী দেখিলে দশ টাকা, এক রাত্রে দশ-দশটা টাকা পাওয়া সহজ কথা নয়।

যামিনী কবিরাজের বউ বলে, সেনদিদিকে ত্যাগ করলে না কি শশী?

না সেনদিদি। রোগীর বড় ভিড়। আসবার সময় পাই না।

আঃ বেঁচে থকো বাবা, তাই হোক। আরও রোগী হোক, লক্ষপতি হও। ভগবানের কাছে দিনরাত এই প্রার্থনা করছি।-যামিনী কবিরাজের বউ যেন কাদিয়া ফেলিবে। রোগা শরীর, আবেগে কান্নাই চলিয়া আসে।-বিয়ে করে সংসারী হও, দেশজুড়ে তোমার নাম হোক, তাই দেখে যেন মরতে পারি।

এক চোখের কোটরে ঢুকানো তাহার একটিমমাত্র ডাগর চোখের নিরতিশয় মোহাচ্ছন্ন সজল দৃষ্টিতে শশীকে সে দেখিতে থাকে। যামিনীর চেলারা ওদিকে হামাদিস্তায় ঠকাঠক শব্দে গুল্ম গুড়া করে। যামিনী খায় তামাক। কাশে আর ভাবে। স্ত্রীর ঘরের চৌকাটও সে ডিঙায় না। শশীর সঙ্গে কথা বলে না। ভাবনার তাহার অন্ত নাই। থাকার কথাও নয়। এই বয়সে,-বয়স তাহার ষাটের উপর গিয়াছে, মানুষের আর কত সহ্য হয়? কাণ্ড দ্যাখো, এতদিনের রূপসী বউটা এমন কুৎসিত হইয়াই বাঁচিয়া উঠিল যে, চোখে দেখিলে মাথা ঘোরে। ভালো এক আপদ আসিয়া জুটিয়াছিল,-শশী। মানুষকে ও মরিতেও দিবে না?

গ্রামবাসী কিন্তু যামিনীর মুখে অন্য কথা শোনে।

শশীর চিকিৎসা চিকিৎসাই বটে। অমনি চিকিৎসা হলে রুগীকে আর শিগগির শিগগির স্বর্গে যাবার ভাবনা ভাবতে হয় না। মেরেই ফেলেছিল। বসন্তের চিকিৎসা ও কী জানে? কত ওষুধপত্র দিয়ে আমিই শেষে...

বলে, চোখটা গেল কি সাধে? ওই লক্ষ্মীছাড়ার দু দাগ ওষুধ খেয়ে!

এসব কথা গোপালের কানে যায়। গ্রামের অনেকে গোপালের কাছে গিয়া বলে যে যামিনী কবিরাজ আচ্ছা নিমকহারাম, গোপালের ছেলের নিন্দা করিয়া বেড়াইতেছে। সংবাদটা বলিবার সময় অনেকে মনে মনে হাসে। গ্রামের লোকের অনুমানশক্তি প্রখর। সকালে আকাশের দিকে চাহিয়া তাহারা বলিতে পারে বিকালে বৃষ্টি হইবে। বিকালে যদি নেহাত বৃষ্টি না-ই হয় সে অপরাধ অবশ্য আকাশের। গোপাল যামিনী কবিরাজের বউ আনিয়া দিবার পর গ্রামের লোক চার-পাঁচ বছর ধরিয়া যাহা অনুমান করিয়াছিল তাহা যদি মিথ্যা হয় তবে পৃথিবীই মিথ্যা। অর্থাৎ সে অপরাধ গ্রামের লোকের অনুমানশক্তি ছাড়া জগতের আর সমস্ত কিছুর। তাই, যামিনী কবিরাজ সংক্রান্ত কোনো সংবাদ দিবার সময় গম্ভীর মুখে গোপালের দিকে চাহিয়া মনে মনে তাহারা হাসে।

গোপালের রাগ হয়। সে যামিনীকে বলে, কী শুনছি খুড়ো? ছেলের নিন্দে কেন?

কার নিন্দে? শশীর? যামিনী আশ্চর্য হইয়া যায়, আমি শশীর নিন্দে করব। একথা তোর বিশ্বাস হয় গোপাল?

ঘরে নিন্দে কর, আমার কাছে নিন্দে করো, কথা নেই। কিন্তু খবর্দার বাইরে যেন নিন্দে কোরো না খুড়ো।

কিন্তু যামিনী নিজেকে মিলাইতে পারে না। তাহার অসহ্য জ্বালা। সে ফের শশীর নিন্দা করিয়া বসে।

বলে, গীটাকে ও ছোড়া উচ্ছন্ন দেবে। ছোড়ার চুল ছাঁটার কায়দা দেখেছিস!

মাঝে মাঝে শশীকেও সে অপমান করে, শশী গায়ে মাখে না। আগে শশী কারো অপমান সহ্য করিত না, আজকাল তাহার একপ্রকার অদ্ভুত ধৈর্য আসিয়াছে। যামিনীর কথায় তাহার একেবারেই রাগ হয় না। সেনদিদির অসুখ উপলক্ষে ওর যে পরিচয় সে পাইয়াছে তাহাতে বুঝিতে তাহার বাকি থাকে নাই যে, সংসারের বন্ধ পাগল ছাড়াও কমবেশি অনেক পাগল আছে। এক-এক বিষয়ে মাথায় যাহাদের অত্যাশ্চর্য বিকার থাকে। যামিনীও তাহাদেরই একজন। ওর অর্থহীন অপমানে রাগ করিলে নিজে সে এমনি পাগলের দলে গিয়া পড়িবে।

তা ছাড়া, আর-এক দিক দিয়া শশীর মন শান্ত হইয়া স্থিতিলাভ করিয়াছিল। তাহার ইনটেলেকচুয়াল রোমান্সের পিপাসা। যাহা চায়ের ধোয়ার মতো, জলীয় বাষ্প ছাড়া আর কিছু নয়, চা-ও নয়। জীবনকে দেখিতে শিখিয়া, অত্যন্ত অসম্পূর্ণ ভাসা-ভাসা ভাবে জীবনকে দেখিতে শিখিয়া, সে অবাক হইয়া দেখিয়াছে যে এইখানে, এই ডোবা আর জঙ্গল আর মশাভরা গ্রামে জীবন কম গভীর নয়, কম জটিল নয়। একান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে গ্রামে ডাক্তারি শুরু করিয়া ক্রমে ক্রমে এ জীবন শশীর যে ভালো লাগিতেছে, ইহাই তাহার প্রথম ও প্রধান কারণ। তারপর যাত্রাদলের অভিনেতা সাজিয়া কুমুদের আবির্ভাব। মোনালিসার কুমুদ, ভেনাস ও কিউপিডের কুমুদ, শেলি-বায়রন-হুইটম্যানের কুমুদ, পেগ খাওয়া wal t z - f □□□□□-নাচা কুমুদ, নীলাক্ষীর প্রেমিক কুমুদ, তার চেয়ে বয়সে জ্ঞানে বিদ্যায় বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ কুমুদ; যাত্রাদলের অভিনেতা সাজিয়া তাহার আবির্ভাব! এ কি ব্যর্থ যায়! শশীর মন শান্ত হইয়াছে, স্থিতিলাভ করিয়াছে। কেমন করিয়া হঠাৎ সে বুঝিতে পারিয়াছে কিডস্কিনের জুতাটা, আশ্চর্য শাড়িটা, বিস্ময়কর ব্লাউজটাই আসল। আর আসল তখনকার কুমুদের টাকাটা। তারপর তোমার চেহারা তো আছেই! সেটাও একটু দরকার আর দরকার বিশ্বজগৎকে একটু ডোন্ট কেয়ার করার ভাব। জমিল রোমান্স।

শশী এটা বুঝিয়াছে। কিন্তু হিসাব তো কম নয়? অতগুলি সমস্বয় তো তুচ্ছ নয়? এটাও শশী স্বীকার করে। স্বীকার করে যে ব্যাপারটা মন্দ নয়। মানুষের সভ্যতার খুবই অগ্রগতির

পরিচয়, চমৎকার উপভোগ। লোভ করিবার মতো। পাইলে সে লাভবানই হইত। কিন্ত বঞ্চিত হইয়াছে বলিয়া মনের মধ্যে অসন্তোষ পুষিয়া রাখিবার মতোও কিছু নয়।

শশী ইহাও বুঝিয়াছে যে, জীবনকে শ্রদ্ধা না করিলে জীবন আনন্দ দেয় না। শ্রদ্ধার সঙ্গে আনন্দের বিনিময়, জীবনদেবতার এই রীতি।

শশী তাই প্রাণপণে জীবনকে শ্রদ্ধা করে। সংকীর্ণ জীবন, মলিন জীবন, দুর্বল পঙ্গু জীবন-সমস্ত জীবনকে। নিজের জীবনকে সে শ্রদ্ধা করে সকলের চেয়ে বেশি।

কুসুমের সঙ্গে কিন্তু শশীর আর একদিন ঝগড়া ইহয়া গিয়াছে।

রাত্রে একদিন হঠাৎ কুসুমের পেটের ব্যথা ধরিয়াছিল। অসহ্য প্রাণঘাতী ব্যথা। শশীকে না ডাকিয়া উপায় ছিল না। রাত্রে, বিশেষত শীতের রাত্রে, ঘুম ভাঙিয়া বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া গিয়া ডাক্তারি করাটা শশীর এখনো ভালোরকম অভ্যাস হয় নাই। প্রথমে সে একটু বিরক্তই হইয়াছিল। পেটে ব্যথা পেটে ব্যথার জন্য হারু ঘোষের বংশে কবে ডাক্তার ডাকিয়াছে? একটু গরম তেল মালিশ করিয়া দিলেই হইত। কিন্তু কুসুমের ব্যথার প্রতাপ দেখিয়া শশীর বিরক্তি টেকে নাই।

কলিক? কে জানে?

কী খেয়েছিলে পরাণের বউ?

জবাব দিয়াছিল মতি।

বে আজ কিছু খায়নি ছোটোবাবু। দাদার সঙ্গে ঝগড়া করে সারাদিন উপোস করেছে। একাদশীর দিনে এয়োস্ত্রী মানুষ করল উপোস,-হবে না?

কথাটা সাংঘাতিক। একাদশীর দিন এই উপবাস করার কথাটা। এমন কাজ করিবার মতো বুকের পাট কুসুম ছাড়া আর কারো হইত কি না সন্দেহ।

কিছু খাওনি পরাণের বউ?

খেয়েছি। খাব না কেন? একটা মাছের আঁশ খেয়েছি। কুসুম ধুঁকিতে ধুঁকিতে বলিয়াছিল।

তাহা হইলে একাদশীর দিন উপবাস করে নাই। ঝগড়ার কথাটাই সত্য, একাদশীর উল্লেখট মতি অনর্থক করিয়াছে। শশীর হঠাৎ রাগ হইয়া গিয়াছিল। কেন, কী বৃত্তান্ত না জানিয়ে মতি অমন যা- তা মন্তব্য করে কেন? কিন্তু কুসুমের কী হইয়াছে? কলিক? পেটের ব্যথাটা বড় রহস্যময় অসুখ। পরীক্ষা করিয়া দেখিবার উপায় নাই, সত্য কি মিথ্যা বুঝিবার উপায় নাই, থার্মেমিটার স্টেথোস্কোপ কোনোটাই কাজে লাগে নাই। রোগী যা বলে তা-ই সই। ব্যথাটা ডানদিকে বলিলে ডানদিকে, ঝিলিক দেওয়া ব্যথা বলিলে ঝিলিক-দেওয়া ব্যথা, চনচনে একটানা ব্যথা বলিলে চনচনে একটানা ব্যথা। সন্দেহ করিবার যো নাই। কুসমের বর্ণনা শুনিয়া শশী কিছুই বুঝিতে পারে নাই। পরাণকে সে আড়ালে ডাকিয়া লইয়া গিয়াছিল।

খানিক পরে বাড়ি গিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিল ওষুধ। নিজে আর ফিরিয়া যায় নাই।

এই হইল তাহার অপরাধ। পরদিন খবর লইতে গিয়া দেখে কুসুম আগুন হইয়া আছে।

মরিনি। এই আপনার টাকা।

কুসুম সত্য সত্যই আঁচলে বাধা দুটি টাকা শশীর সামনে রাখিল। শশীর বুঝিতে বাকি রহিল না এই উদ্দেশ্যেই সে আচলে টাকা বাঁধিয়া ঘরের কাজ করিতেছিল।

মতি বলিল, তোর কী আস্পর্ধা বউ!

বুঁচি নাই। বুঁচি অনেকদিন আগে শ্বশুরবাড়ি চলিয়া গিয়াছে। সে থাকিলে অন্য কিছু বলিত। আরও কড়া, আরও ঝাঁজালো কিছু।

কুসুম শান্তভাবে বলিল, মা একলা গোয়াল সাফ করছে, যা তো মতি লক্ষ্মীটি, হাত লাগবি যা। সুদেবের সঙ্গে তোর বিয়ের পরামর্শটা ছোটোবাবুর সঙ্গে করে নি। মা যেন গোয়াল ফেলে ছুটে আসে না বাপু। কাজ সেরে একেবারে চান করে আসবি। ছোটোবাবু বসবে।

কুসুম হুকুম দিতেও জানে। কেন জানিবে না? সকলে মিলিয়া তোষামোদ করিয়া গোরু কেনার জন্য তাহার অনন্তজোড়া বাগাইয়া লয় নাই? সেও ছাড়িবে কেন? মাঝে মাঝে ভয়ানক দরকারের সময়, শশীর সঙ্গে এখন সে যে কলহ করিবে এমনি দরকারের সময়, হুকুম তাহার সকলকে মানিতে হইবে।

মতি চলিয়া গেলে শশী বলিল, ওষুধ খেয়ে কাল তোমার পেটব্যথা কমেনি নাকি বউ?

ও ভারি ওষুধ! কটা এইটুকু-টুকু সাদা বড়ি-ওষুধ না ছাই। নিজে একবার আসতে পারেননি? বড়ি খেয়ে ব্যথা যদি না কমত!

এর নাম অকৃতজ্ঞতা। ব্যথা তাহা হইলে কমিয়াছিল? রাত্রে একবার উঠিয়া আসিয়া দেখিয়া গিয়া ওষুধ দিল,ওষুধ খাইয়া ব্যথাও কমিল, তবু কুসুমের মন ওঠে নাই। শশী বিরক্তি বোধ করিল। তোমার সব বিষয়েই একটু বাড়াবাড়ি আছে বউ।

কী আছে? বাড়াবাড়ি? হ্যাগো ছোটোবাবু, আছেই তো। তা যাই বলেন, এক ঘণ্টা ধরে বুক পরীক্ষা ম্যালেরিয়া জ্বর হলে, আমি করি না।

সে বুক পরীক্ষা করিবে, সে কি ডাক্তার? কুসুমের মনটা শশীর বোধগম্য হয় না। পেটব্যথার জন্য কাল এক ঘণ্টা স্টেথোস্কোপটা ওর বুকে লাগাইয়া হৃদস্পন্দন শুনিলে ও কি সুখী হইত? কুসুমের মাথাধরার চিকিৎসা বোধ হয় পাটেপা। সে ডাক্তার মানুষ, এসব পাগলামিকে প্রশ্রয় দিলে তাহার চলিবে কেন?

টাকা পেলে কোথায় পরাণের বউ?

যেখান থেকেই পাই, আপনার ভিজিট দিয়েছি, নিয়ে যান।

কোথা থেকে পেয়েছ না বললে নিতে পারি না, বউ।

কেন, চুরি করেছি ভাবেন নাকি?

শশী ভাবিল, এই বেশ সুযোগ পাওয়া গিয়াছে। কুসুমের এই কথাটাকে পরিহাসে দাঁড় করাইয়া দিলেই সে হাসিয়া ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে।

তা আশ্চর্য কী? চুরি না করলে টাকা তুমি পাবে কোথায়? রোজগার করো?

কুসুম বলিল, আমার বাপ ঢের রোজগার করে। তাই বলে আমরা কি আপনার তুল্যি? লোকের গলায় ছুরি দেওয়া পয়সায় আমরা বড়লোক হইনি, তাই আপনারা গরিব বলেন গরিব, চোর বলেন চোর!

শশী মুখ কালো করিয়া বাড়ি ফিরিল।

সারাদিন তাহার মন খারাপ হইয়া রহিল। নিজের চারিদিকে সে যে শিক্ষা ও সভ্যতার খোলটি সযত্নে বজায় রাখিয়াছিল, কুসুম তাহাতে ফাটল ধরাইয়া দিয়াছে। কুসুমের কথা মিথ্যে নয়। হারু ঘোষের চেয়ে তাহার বাবা কি একদিন গরিব ছিল না? লোকের গলায় ছুরি দিয়াই গোপাল যে পয়সা করিয়াছে একথারও প্রতিবাদ চলিবে না। গোপালের চেয়ে কুসুমের বাবা ঢের বেশি ভদ্রলোক। কুসুমকে তাহার বাবা মধ্যে মধ্যে পত্র লেখে গোপালের সাধ্য নাই অমন সুন্দর হস্তাক্ষরে ওরকম চিঠি লিখিতে পারে। ঠিকানায় কুসুমের নামটা বাঙলায় লিখিয়া কুসুমের বাবা বাকিটা লেখে ইংরেজিতে। গোপাল এবিসিডি-ও চেনে না। অপমানটা করিবার সময় কুসুম হয়তো এইসব কথাও মনে রাখিয়াছিল।

গ্রামের লোকেরা তাহাকে যে ছোটোবাবু বলিয়া ডাকে ইহাতে শশীর গৌরব কিছু নাই। এটা উপাধি মাত্র, শুধু নাম। সম্মান নয়। গোপালের মক্কেলরা শিশুকালে আদর করিয়া তাহাকে ছোটোবাবু বলিয়া ডাকিত, ডাকটা কী করিয়া গ্রামে ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং

টিকিয়া আছে। এসব ভুলিয়া গিয়া সে কি অহঙ্কারী হইয়া উঠিতেছিল? সকলের সঙ্গে ছোটোবাবুটির মতো ব্যবহার শুরু করিয়া দিয়াছিল?

শশীর আত্বসম্মান অত্যন্ত আহত হইয়া রহিল। সে ভাবিল, আমার রকমসকম দেখে কুসুম হয়তো মনে মনে হাসে। কুসুম হয়তো ভাবে, আঙুল ফুলে কলাগাছ হলে এমনই করে মানুষ বাপের চুরি-চামারির পয়সায় লেখাপড়া শিখে এত কেন?

কুসুম ক্ষমা চাহিতে আসিল দিন-চারেক পরে। দুপুরবেলা চুপিচুপি, চোরের মতো!

শশীর ঘরের পিছনে বাগান। বাগানে লিচু হয়, আম হয়, কাঠাল হয়, কপি হয়, নটেশাক হয়, তীব্রগন্ধী কাঁঠালি চাঁপা, লালবোঁটা শিউলিফুল ফোটে। বাগান দিয়া আসিয়া ঘরের জানালার ফাঁকে ফিসফিস করিয়া কুসুম ডাকিল, ছোটোবাবু শুনুন।

শশী ঘুরিয়া বাগানে গিয়া দ্যাখে জানালার নিচে তাহার অত সাধের গোলাপচারাটি কুসুম দুই পায়ে মাড়াইয়া মাটিতে পুতিয়া দিয়াছে।

গাছটা মাড়ালে কেন বউ? কিসে দাঁড়াচ্ছ দেখে দাঁড়াতে হয়!

শশীর সাধের ফুলের চারাকে হত্যা করিয়া শুরু করিলেও কুসুমের কাজ হইল। শশী তাহাকে ক্ষমা করিয়া ফেলিল; সমস্ত অপরাধ। আজ পর্যন্ত কুসুম তাহার কাছে যত অপরাধ করিয়াছে সব। কুসুম বলিল, চার রাত সে ভালো করিয়া ঘুমায় নাই। কথাটা শশী বিশ্বাস করিল। কুসুম মানবদনে মিথ্যা বলে জানিয়াও বিশ্বাস করিল। কারণ, কুসুমের মুখে কথাটার প্রমাণ ছিল এবং চোখে ছিল জল। কুসুম আরও বলিল, কয়েক দিনের মধ্যেই সে বাপের বাড়ি চলিয়া যাইবে। তার বাবা ভুবনেশ্বর পত্র দিয়াছে। ছোটোবাবুকে রাগাইয়া চলিয়া যাইবার কথাটা ভাবিতে তাহার এমন খারাপ লাগিতেছিল! তাই ক্ষমা চাহিতে আসিয়াছে।

আমার এই স্বভাবের জন্য কেউ আমাকে দুচেখে দেখতে পারে না। মুখের আমার আটক নেই!

শশী জিজ্ঞাসা করিল, সেদিন রাত্রে তোমার কী হয়েছিল বলো তো? সত্যি বলো!

পেট ব্যথা করেছিল।

জিভ দেখি?

কুসুম সলজ্জভাবে জিভ দেখাইল।

জিভ তো পরিষ্কার।

জিভ পরিষ্কার হবে না কেন ছোটোবাবু?

না, জিভ অপরিস্কার থাকিবার কোনো কারণ নাই। কুসুমের স্বাস্থ্য বাহিরের ফাঁকি নয়, ভিতরেও সে খুব মজবুত। কুসুমকে শশীর এইজন্যই ভালো লাগে। দশ বছরে একবার এক রাত্রে শুধু পেটে ব্যাথায় কষ্ট পায়, আর কোনো রোগ বালাই নাই। এই তো চাই। সব বাঙালি ঘরের মেয়ের এরকম স্বাস্থ্য হইলে জাতটা আজ ডুবিতে বসিত না, শশী একথাও ভাবে।

জানালা দিয়া উৎসুক দৃষ্টিতে ঘরের ভিতর চহিয়া কুসুম বলিল, আপনার ঘরটা একটু দেখে যাব ছোটোবাবু?

চলো না, সিন্ধু ওদের কাউকে ডাকি, অ্যাঁ?

না। আমি একাই দেখে যাই।

কুসুম একাই শশীর ঘর দেখিল। শশী জানিত এটা উচিত নয়। কিন্তু বারণও সে করিল না। ভাবিল ওর যদি বদনামের ভয় না থাকে আমার বয়ে গেল। আমি তো ডাকিনি।

শশীর ঘর দেখিয়া কুসুম বলিয়াছিল, বেশ সাজানো ঘর। কিন্তু জাদুঘর মিউজিয়ামের মতো মানুষের শোবার ঘরে কী আর দেখিবার থাকে? বড়ো আলমারি দুটির পাঁচটি তাক। একটা আলমারিতে ঠাসিয়া বই ভরিয়াও কুলায় নাই, মাথার উপর উঁচু করিয়া সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। অপরটির উপরে তাক তিনটিতেও ডাক্তারি বই সাজানো, নিচের তাকে চকচকে ডাক্তারি যন্ত্রপাতি। কোনটা কী কাজে লাগে? কুসুম জিজ্ঞাসা করিল। কুসুমের যেন তাড়াতাড়ি নেই, যতক্ষণ খুশি শশীর ঘরে থকিতে পারে। দেয়ালে কয়েকটা ছবি আর ফটো টাঙানো আছে, কুসুম অন্যমনস্কের মতো সেগুলি দেখিল। ফটোগুলি অধিকাংশই শশীর বাড়ির স্ত্রী-পুরুষের, কোনো মন্তব্য নিস্প্রয়োজন। কুমুদের ফটোটা দেখিয়া কুসুম বলিল, সেই লোকটা না? গতবৎসর শশী দেয়ালে একগোছা ধানের শিষ টাঙ্গাইয়া দিয়াছিল। দেখিয়া কুসুম ভারি খুশি। কাঠের বাক্সে কী আছে? ওষুধ? দেখি। ওই ছোট আলমারিতে ওষুধ রাখিয়াছে, আবার বাক্সে কেন?

এ ঘরে আপনি একা শোন ছোটোবাবু?

একাই শুই।

তা, বউ আসতে আর দেরি কত! শিগগির বাপের বাড়ি চলে যাব ছোটোবাবু। আর আসব না।

আসবে না? সে কী! শশী অবাক হইয়া গেল।

কুসুম একটু ভাবিল আসব, অনেক দেরি করে আসব। হয়তো ও-বছর নয়তো পরের বছর, ঠিক কিছু নেই। আচ্ছা, যাই ছোটোবাবু।

শশী বলিল, কী করে যাবে? বাবা ওদিকে দাওয়ায় এসে বসেছেন। ঘুমিয়ে উঠলেন।

তবে? কুসুম জিজ্ঞাসা করিল। সে যে বিশেষ ভয় পাইয়াছে মনে হয় না। বিপদে কুসুম শান্তই থাকে। বিচলিত হয় না, দিশেহারা হয় না।

শশী বলিল, একটু বোসো। বাবা এখুনি বাইরের ঘরে চলে যাবেন।

তবে দরজা বন্ধ করে দিন। দেখিতে পান যদি?

কে জনিত নিয়তি আজ গোপাল ঘুম ভাঙিয়া ওদিকের দাওয়ায় বসিবে, আজ সাত বছর পরে।

পূজার পর গাওদিয়ার স্বাস্থ্য ক্রমে ক্রমে ভালো হয়। ম্যালেরিয়া কমিয়া আসে, কলেরা বন্ধ হয়, লোকের ক্ষুধা বাড়ে, মাছ দুধ সস্তা হয়। নিমুনিয়া ও ইনফ্লুয়েঞ্জায় কেবল দুই-দশজন যা মারা যায়—সে কিছু নয়। অগ্রহায়ণ-পোষ মাসে খালের জল অনেক কমিয়া আসে। মাঘের শেষাশেষি ডোবা শুকাইয়া যায়। চৈত্র মাসে অনেক পুকুরে দু-এক হাত জল থাকে মাত্র। বৈশাখে বৃষ্টি না হইলে অধিকাংশ পুকুর শুকাইয়া ওঠে। তখন গ্রামে বড় জলের কষ্ট। শীতলবাবুর বাড়ির সামনের বড় দিঘিটার জল খাইয়া গাওদিয়া, সাতগাঁ আর উখারার লোক প্রাণধারণ করে। বাবুর দিঘিতে বাবুদের বাড়ির লোক ছাড়া কাহারো দেহ ডুবানো নিষেধ। দারোয়ান লাঠি ঘাড়ে পুকুর পাহারা দেয়, শীতলবাবুর ছেলেরা ভাগনেরা আর কম বয়সি মেয়েরা দিঘি তোলপাড় করিয়া স্নান আরম্ভ করিলে লাঠিতে ভর দিয়া সে একগাল হাসে। ঘাট ছাড়া গ্রামের লোকের অন্য কোথাও কলসি ডুবানো বারণ। শীতলবাবুর বাড়ির ছেলেমেয়েরা স্নান করিয়া গেলে দু-তিন ঘণ্টা ঘাটের কাছে জল কাদা হইয়া থাকে।

জল হইতে আসিয়া কেহ বলে ; খোকাবাবুদের একটু সাবধানে স্নান করতে বলতে পারো না দারোয়ানজি?

দারোয়ান বলে ; দিঘি কিসকো? তুমারা?

তা বটে, দিঘিটা বাবুদের বটে।

কিন্তু বৈশাখ মাস আসিতে এখনো দেরি আছে, বৈশাখ মাসে এ বছর খুব ঝড়বৃষ্টি হইতে কিনা এখন হইতে তাই বা কে বলিতে পারে। শীতকালটা গ্রামের লোক সুখে কাটায়। কই, মাগুর, শোলমাছ প্রচুর পাওয়া যায়। যাদের ডোবা আছে, ডোবা শুকাইয়া আসিলে জল ছেঁচিয়া ঝুড়িখানেক মাছ পায়। তার মধ্যে খলসে আর ল্যাঠা মাছই বেশি।

এই খাল আর খালের চিকরি-কাটা দেশে ভালো রাস্তা নাই কিন্তু শীতকালটা দেশে কাটাইবেন সংকল্প করিয়া বিমলবাবু সপরিবারে একটা মোটরগাড়ি সঙ্গে করিয়া গ্রামে আসিলেন।

বাজিতপুরে মোটরগাড়ি আছে। কিন্তু গাওদিয়ায় মোটরগাড়ি!

কুসুম শশীকে বলে, সেবার কলকাতায় মোটরগাড়ি চড়েছি। বিয়ের আগে যেবার কলকাতায় গিয়েছিলাম বাবার সঙ্গে।

শশী বলে, তোমার সে কথা মনে আছে?

কুসুম অবাক হইয়া বলে, বাহ্, মনে থাকবে না? কতদিন আর হল? আট বছর কি ন বছর। আমার বয়স কত ভাবেন? পচিশ?

দূর! বাইশ বছর।

সুদেবের সঙ্গে মতির বিবাহের প্রস্তাব ভাঙিয়া গিয়াছে। কুসুম ইদানীং আর ও-কথা উত্থাপনও করিত না। মতির বিবাহ হোক বা না হোক তাহার যেন কিছুই আসিয়া যায় না। পরাণ যদি বা রাত্রে কোনোদিন কথাটা তুলিত, কুসুম হাই তুলিয়া বলিত, তাহার কোনো মতামত নাই। কোনোদিন কিছু না বলিয়াই সে ঘুমাইয়া পড়িত। এদিকে নিতাই তাগাদা দিতেছিল। এত বেশি তাগাদা দিতেছিল যেন বিবাহটা সুদেবের নয়, তাহার নিজের। শশীর সঙ্গে আর একবার পরামর্শ করিয়া শেষে পরাণকে বলিতে হইয়াছে– না, সুদেবের

সঙ্গে মতির সে বিবাহ দিবে না। নিতাই শান্তভাবে কথাটা গ্রহণ করিতে পারে নাই। লোভ দেখাইয়াছে, সদুপদেশ দিয়াছে, মেজাজ গরম করিয়াছে, কিন্তু না, পরাণ রাজি নয়।

ছোটোবাবু বারণ করে দিয়েছে, অ্যাঁ? হারুদা মরলে তাকে কে পুড়িয়েছিল পরাণ? কাঁধ দিয়েছিল কে? ছোটোবাবু? ছোটোবাবু যখন বারণ করছে, ব্যাস, তার আর কি, ছোটোবাবুর কথা বেদবাক্যি, বটে?

আমার নিজের বুদ্ধি নেই? মতির বিয়ে আমি শহরে দেব-ভদ্রঘরে।

এ কথাটা পরাণ না বলিলেও পারিত।

যাই হোক, তারপর সুদেব নিতাইয়ের নামে বাজিতপুরের মামলা রুজু করিয়াছে। অভিযোগ গুরুতর, গচ্ছিত ধন অপহরণ, বেআইন আটক, আর মারপিট। গারের জ্বালায় সুদেব নালিশ করিয়াছে বটে কিন্তু কিছু প্রমাণ করিতে পারবে কিনা সন্দেহ নিতাই বিচক্ষণ সংযমী মানুষ। হঠাৎ কিছু করিয়া বসিবার লোক সে নয়, প্রমাণ রাখিয়া অপকর্ম সে কখনও করিবে না।

একদিন বাজিতপুর-ফেরত নিতাইয়ের সঙ্গে শশীর রাস্তায় দেখা হইল। এই মামলার ব্যাপারে নিতাইকে অপরাধী সন্দেহ করিয়াও শশীর রাগ হইয়াছে সুদেবের উপর। নিতাই সুদেবের মামা, নিজের মামা। একেবারে মামলা না করিয়া আর কিছু তো করিতে পারিত? কোর্টে এখন মতির নামটি উঠিয়া পড়িবে। পরাণকে সাক্ষ্য দিতে যাইতে হইবে। সে এক কেলেঙ্কারি ব্যাপার।

কিন্তু নিতায়ের সঙ্গে মামলার কথা শশী আলোচনা করিল না।

বলিল, তোমার কাছে কিছু টাকা পাওনা আছে নিতাই।

দেব ছোটোবাবু, মাঘ মাসটা গেলেই শোধ করে দেব।

শশী চিন্তিত হইয়া বলিল, মাঘ মাস? আচ্ছা, তাই দিও। কিন্তু লালীর বাছুরটা তুমি পরাণকে দিলে না যে? লালী দুধ বন্ধ করেছে শুনলাম?

লালীর বাছুর পরাণকে দেব কেন ছোটোবাবু?

কেন লালীকে বেচবার সময় কথা হয়নি প্রথম বাছুরটা পরাণ পাবে?

না ছোটোবাবু, এমন কথা হয়নি, পরাণ মিছে বলেছে। লালীকে আমি কিনেছি হারুদার ঠেয়ে, পরাণ কি জানে?

শশী উদাসভাবে বলিল, যাক, কথা না হয়ে থাকলে আর কী কথা? পরশু সের ছয়েক দুধ পাঠিও নিতাই। বাড়িতে কী সব করবে বলেছিল।

শশী চলিয়া যায়,–নিতাই ডাকিয়া বলিল, ছোটোবাবু, শোনেন। বাজিতপুরে জামাইবাবুকে দেখলাম। কাল বিয়ানে এ গাঁয়ে আসবেন।

কোন জামাইবাবু?

মেজো।

এ খবর শশী জানিত না। তাদের কোনো সংবাদ না দিয়া নন্দলাল গায়ে আসিতেছে ইহাতে আশ্চর্যও সে হইল না। বিবাহের পরেই নন্দলাল শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক তুলিয়া দিয়াছে। কখনও চিঠি লেখে না, চিঠির জাবাব দেয় না। বিন্দু প্রথম প্রথম চিঠি লিখিত, স্বামীর আদেশের বিরুদ্ধে তাকাইয়া। নন্দলাল টের পাইবার পর বাপের বাড়ির সঙ্গে চিঠি লেখার সম্পর্কটুকু তাহাকে তুলিয়া দিতে হইয়াছে। একবার সে যে দু-চার দিনের জন্য বাপের বাড়ি আসিয়াছিল তাও স্বামীকে লুকাইয়া। ব্যবসা উপলক্ষে নন্দলাল দিন পনেরো বোম্বে গিয়েছিল, সেই সময়। এমন ব্যাপার বেশিদিন গোপন থাকিবার নয়। বোম্বে হইতে ফিরিয়া একদিন নন্দলাল স্ত্রীকে বলিয়াছিল, গাওদিয়া গিয়েছিলে?

বিন্দু ভয়ে কাঁপিয়া একটু হাসিয়া ব্যাপারটা উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া বলিয়াছিল, একদিনের তরে গিয়াছিলাম, মোটে একদিন। বাবার যা অসুখের কথা শুনলাম! –রাগ করেছ?

রাগ করেছ?–ভ্যাঙাইয়া–ছোটলোকের বাচ্চা!

গছাইয়া-দেওয়া বউ, প্রাণভয়ে-গ্রহণ করা বউ, লেখাপড়া-নাচ-গান-কিছু না-জানা বউ, জীবনের অপূরণীয় ক্ষতি।

বিন্দুকে নন্দলাল ত্যাগ করে নাই কেন, কে বলিবে! হয়তো কর্তব্যজ্ঞান, হয়তো খেয়াল, হয়তো নির্বিবাদে ওকে লইয়া যা-খুশি তাই করা যায় বলিয়া নন্দলালের কাছে বিন্দুর একধরনের দাম আছে,-কে বলিবে! বিন্দুকে নন্দলাল অত গয়না-কাপড় দেয় কেন, সে আর এক রহস্য। বিন্দু কি ধার-করা গহনা গায়ে দিয়া বাপের বাড়ি আসিয়াছিল? যাহা পায় নাই তাহাই পাইয়াছে এই অভিনয়টুকু করিয়া যাওয়ার জন্য? কে বলিবে! জীবনের অজ্ঞাত রহস্য গাওদিয়ার বিন্দুকে গ্রাস করিয়াছে, কলিকাতার অনামি রহস্য। কলিকাতায় থাকিয়া পড়িবার সময়ও শশী যাহা ভেদ করিতে পারে নাই। নন্দলাল একপ্রকার অপমানই করিত, কিন্তু শশী যাইতে ছাড়িত না। ভাইফোঁটার দিন ক-বার বিন্দু তাহাকে ফোঁটা দিয়াছে। বিন্দুর গা-ভরা গহনা সে দেখিতে পাইত না? না। অন্তঃপুরের দৈনন্দিন সাদাসিধে জীবনে গহনার বোঝা বহিয়া বেড়াইতে বিন্দু ভালোবাসে না-চোখের আবিষ্কার কানে শোনা এই কৈফিয়ত শশীর কাছে মিথ্যা হইয়া যাইত। শশী ভাবিত, বিন্দু তবে সুখেই আছে! একটা ব্যাপার সে বুঝিত না। বাহিরের লোকের বুঝিবার মতো ব্যাপারও সেটা নয়। নন্দলাল ভিন্ন বড়িতে বিন্দুকে রাখিয়াছে, বিন্দুকে একা। নন্দলালের পরিবার যে-বাড়িতে পচিশ বৎসর বাস করিতেছে, বিন্দু সেখানে কতদিন বধূজীবন যাপন করিয়াছিল জিজ্ঞাসা করিলে বিন্দু সে প্রশ্ন এড়াইয়া যায়, নূতন বাড়িতে কতদিন সে গৃহিণী হইয়া বাস করিতেছে তাও বলে না। ঝগড়াকাটি হতে লাগল, তাই চলে এসেছি। –বিন্দু শুধু ওই কৈফিয়ত দেয়। বলে, বেশ আছি স্বাধীনভাবে। ওখানে এমন ঝগড়া করে এবং বলিয়া এমনভাবে হাসে যে মনে হয় যেন সত্য সত্যই বেশ আছে, স্বাধীনভাবে। ঝি-

চাকরের অভাব নাই, সদরে একটা দারোয়ানও আছে। ঘরগুলি দামি আসবাবে ভরতি, বাড়াবাড়ি রকমে ভরতি। বিন্দুর জন্য নন্দলাল বিলাসিতার চূড়ান্ত ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছে। সারা বাড়িতে এসেন্সের গন্ধ!

নন্দলাল তাহা হইলে বিন্দুকে ভালোবাসে? বিন্দুর বাড়িতে গিয়া কতদিন শশী দেখিয়াছে, বিন্দুর ভাব অমায়িক, বিন্দু সাদাসিধে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছে, নন্দলাল সে বেলা আসিবে না। আবার কতদিন গিয়া দেখিয়াছে বিন্দু অমায়িক নয়, রহস্যময়ী। বিন্দু মহাসমারোহের সঙ্গে প্রসাধনে ব্যাপৃত হইয়া আছে, কথা বলার সময় নাই! একঘণ্টার মধ্যে নন্দলাল আসিবে।

জীবনের অজ্ঞাত রহস্য বিন্দুকে গ্রাস করিয়াছে বইকী।

পরদিন শশী খালের ঘাটে গেল—যে ঘাটে হারুর মৃতদেহের সঙ্গে এক নৌকায় সে একটি সন্ধ্যা অতিবাহিত করিয়াছিল। সকালবেলা।

নন্দলাল আসিতেছে—বাড়িতে শশী একথা প্রকাশ করে নাই। নন্দলাল কখনও তাহাদের বাড়ি যাইবে না। কিন্তু শশী অনেকদিন বিন্দুর কোনো খবর পায় নাই। নন্দলালের কাছে বিন্দুর খবরটা জানিবার জন্যই সে খালের ঘাটে আসিয়াছে। গ্রামের মধ্যে একান্ত পর উদ্ধত ভগিনীপতিটির সঙ্গে আলাপ করা অসম্ভব।

শশীর মনে আর একটা ইচ্ছা ছিল। সে এক অসম্ভব কল্পনা। বিন্দুর বিবাহের ব্যাপারটা শশী জানে। কিন্তু সে তো আজকের কথা নয়, প্রায় ইতিহাসে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। এতকাল নন্দলাল রাগ করিয়া ছিল, ভালো কথা, তাহার দোষ নাই। কিন্তু চিরজীবন অতীত ঘটনার জবাব কাটিয়া চলিয়া লাভ কী? নন্দলাল তো আজ অনায়াসে গোপালকে ক্ষমা করিয়া ফেলিতে পারে। মনে করিতে পারে যে জোর- জবরদস্তি নয়, সে নিজেই দেখিয়া পছন্দ করিয়া বিন্দুকে বিবাহ করিয়াছিল! গোপালের অপরাধে রাগ করিয়া আছে নন্দলাল আর মাঝে পড়িয়া শাস্তি পাইতেছে বিন্দু, এটা উচিত নয়।

বাপের বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক তুলিয়া দেওয়াটা বিন্দুর শাস্তি, শশী এইরকম মনে করে। নন্দলালকে সে আজ তাহদের বাড়ি গিয়া উঠিতে অনুরোধ করিবে। আভাসে ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিবে গোপাল আজ সাত বছর অনুতপ্ত হইয়া আছে, আর কেন ভাই, এবার মিটাইয়া ফেল।

তারপর নন্দলাল আসিল! সে আরও বুড়া হইয়াছে, আরও বাবু হইয়াছে। অবস্থার অনুপাতে হিসাব করিলে সঙ্গের চাকরটি কিন্তু তাহার চেয়েও বাবু। এইটুকু খাল বাহিয়া আসিতে দুজনের জন্য নন্দলাল নৌকা ভাড়া করিয়াছে দশজনের। হয়তো তাহার ডুবিয়া মরার ভয়,–কলকাতার বাবু!

খবর না-দেওয়ার জন্য শশী কোনো অনুযোগ করিল না। বলিল, কলকাতা থেকে বেরিয়েছ কবে?

বিন্দু শশীর এক বছরের ছোট। সেই হিসাবে নন্দলালের সে গুরুজন।

পরশু।

বিন্দু ভালো আছে?

ভালো থাকবে না কেন?

কী জবাব! নন্দলালকে সামনে দেখিয়া, তাহার কথা শুনিয়া, শশীর কল্পনা নিভিয়া আসিতেছে। রাগ, প্রতিহিংসা এইসব যে মানুষের অবলম্বন, সহজে ওসব সে ছাড়িতে চায় না। ছাড়িয়া বাঁচিবে কী লইয়া?

খবর পেলাম, আজ সকালে তুমি পৌছবে। বাবা বললেন, ঘাটে যা শশী, বাবুদের গাড়িটা নিয়ে যা, সঙ্গে করে নিয়ে আসবি। নিজেও আসতেন, আমি বারণ করলাম। বাতে কষ্ট পাচ্ছেন, কতক্ষণ ঘাটে অপেক্ষা করতে হবে তারও কিছু ঠিক নেই। তুমি আসছ শুনে বাড়িতে হৈচৈ পড়ে গেছে নন্দ।

নন্দলাল বলিল হুঁ, মোটরটা কার?

নন্দলাল বলিল শীতলবাবুর ভাই বিমলবাবুর। ওরাই জমিদার।

শীতলবাবু লোক কেমন?

প্রশ্ন শুনিয়া শশী একটু বিস্মিত হইল।

বেশ লোক। খুব ধর্মচর্চা করেন। এখানে দাঁড়িয়ে কী হবে? তোমার চাকরকে বলো, জিনিস গাড়িতে তুলুক। নৌকা ছেড়ে দাও, আমাদের নৌকায় ফিরে যাবে।

নন্দলাল মাথা নাড়িল,-আমি এ বেলাই ফিরব শশী। আর কাজ শেষ করে তোমাদের বাড়ি যাওয়ার সুবিধে হবে কি না-মানে, হয়তো সময় পাব না। না, হয়তো কেন, সময় পাব না।

শশী এ অপমানও হজম করিল।

আজ তোমাকে ফিরতে দিচ্ছে কে? সবাই আশা করে আছে নন্দ।

আমাকে ফিরতেই হবে। বাজিতপুরে কাজ ফেলে এসেছি। শীতলবাবুর সঙ্গে দেখা করেই আবার নৌকা খুলব।

শীতলবাবুর কাছে তাহার কী প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করিতে নন্দলাল একটা ভাসাভাসা জবাব দিল যে বাজিতপুরে শীতলবাবুর কিছু জমি কিনিবে। কথা কহিতেও নন্দলালের যেন কষ্ট হইতেছিল। কেন, কী বৃত্তান্ত শশী তাহ কিছুই জিজ্ঞাসা করিল না। নিজেকে তাহার গোমস্তা মনে হইতেছিল নন্দলালের।

বেশ, কাজ থাকলে তোমায় আটকাব না। এ বেলাটা থেকে খাওয়াদাওয়া করে বিকেলে রওনা দিও। বলিয়া শশী যোগ দিল, বাবা নিজে আসতেন নন্দ। আমি বারণ করলাম।

কিন্তু নন্দর সুবিধা হইবে না। সময় নাই।

তখন শশী বলিল, ও আচ্ছা।

তাহার রাগ হইতেছিল, মনে জ্বালা ধরিয়া গিয়াছিল। টিনের চালাটার একধারে চন্ডী ছোকরা কেরোসিন কাঠের উপর রেকাবি-ভরা পান সাজাইয়া রাখিয়াছে, আর কয়েক প্যাকেট লাল-নীল-কাগজে-মোড়া বিড়ি। চণ্ডী নিজে কাছে গিয়া হা করিয়া বাবুদের গাড়িটি দেখিতেছে। গাওদিয়ায় মোটরগাড়ি নন্দ থাকিয়া থাকিয়া গাড়িটার দিকে চাহিতেছিল। কিন্তু শশীর সঙ্গে এইমাত্র সে সম্পর্ক চুকাইয়া দিয়াছে, গাড়িটা আনিয়াছে শশী। নন্দলাল তাই বলিল, শীতলবাবুর বাড়িটা কতদূর?

গাঁয়ের শেষে।

তবে তো কম দূর নয়! ঘোড়ার গাড়ি-ট্যাক্সি পাওয়া যায়? চাকরটাকে পাঠিয়ে দিই, ডেকে আনুক।

ঘোড়ার গাড়ি পাওয়া যায়। এই গাড়ি বাবুদের বাড়ি ফিরে যাচ্ছে, তুমি ইচ্ছে করলে যেতে পারো। রসিকবাবুর বাগানের একটা গাছের দিকে শশী দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াছিল, এবার সে আবার চণ্ডীর দোকানের দিকে চাহিল।

নন্দ কী ভাবিল বলা যায় না, বলিল, সময় থাকলে তোমাদের বাড়ি যেতাম শশী।

সময় না থাকলে আর কথা কি?

সেইখানেই ইতি। নৌকায় গিয়া সুটকেস হইতে আয়না-চিরুনি বাহির করিয়া নন্দ চুলটা ঠিক করিয়া লইল। পানের কৌটা হইতে খানিকটা জর্দা মুখে দিল। গায়ের দামি আলোয়ানটা খুলিয়া রাখিয়া একটা তার চেয়ে দামি শাল গায়ে দিয়া মোটরে উঠিল।

এসো শশী। আমার একটু তাড়াতাড়ি আছে।

সেই যেন এতক্ষণে মোটরের মালিকানা-স্বত্ব পাইয়াছে। তা, সেটা আশ্চর্য নয়। মোটরে চড়ার অভ্যাস নন্দলালের আছে, শশী তো চাপে গোরুর গাড়ি।

শশী বলিল, তুমি যাও। আমার এদিকে কাজ আছে!

কলিকাতা শহর! মোটরে চাপিয়া কলিকাতা শহর গাওদিয়ার দিকে চলিয়া গেল। করিয়া দিয়াছে। বিন্দুর বাড়ি যে-পাড়ায়, সে পাড়াটাও ভালো নয়। নন্দ কি পাগল? পাগল হোক আর যাই হোক, ওকে তো সে অনায়াসে মারিতে পারিত। বৃষ্টিধারার মতো কিল চড় ঘুসি। কতক্ষণ আর সহিতে পারিত? পাঁচ মিনিট। পাঁচ মিনিটের মধ্যে নন্দ পায়ের কাছে গড়াগড়ি দিত। অজ্ঞান অচৈতন্য নন্দ।

তবু, নন্দ হয়তো বিন্দুকে ভালোবাসে।

শীত জমিয়া আসে। পৌষ-পার্বণ আসিয়া পড়িতে আর দেরি নাই। গ্রামে অবিরত ঢেঁকি পাড় দিবার শব্দ শোনা যায়। আকাশে রবির তেজ কমিয়াছে। মাঠে রবিশস্য সতেজ। মানুষের গা ফাটিতে আরম্ভ করিয়াছে। গায়ে যাহার মাটি বেশি, ঘষা লাগিলেই খড়ি উঠিয়া যায়। লেপ-কাথা খোলা হইয়াছে, বেড়ার ফাঁক গুলিতে ন্যাকড়া ও কাগজ গোজা হইতেছে। মতি একবার জ্বরে পড়ি পড়ি করিয়া পড়ে নাই। কুসুমের আর একবার পেটব্যথা হইয়া গিয়াছে। পরাণ একদফা গুড় চালান দিয়াছে। এবার তাহার কিছু পাটালি গুড় করিবার ইচ্ছা। শশীর কাছে টাকা ধার করিয়া সে আরও প্রায় চল্লিশটা খেজুরগাছ লইয়াছে। লালীর বাছুরটা নিতাই একদিন যাচিয়া পরাণকে ফেরত দিয়া গিয়াছে।

ছোটোবাবুর জন্যে। নইলে বাছুর তুমি কখনও ফেরত পেতে না। এই কথা বলিয়াছে কুসুম। খেজুরগাছ কিনার জন্য শশীর কাছে পরাণকে টাকা ধার করিতে দিতে কুসুমের নিতান্ত অনিচ্ছা দেখা গিয়াছিল। সবসময় তাহার ইচ্ছা ও অনিচ্ছাকে মর্যাদা দিলে সংসার চলে না, এই যুক্তিতে পরাণ তাহার কথা গ্রাহ্য করে নাই। মোক্ষদার শরীরের অবস্থাটা

কিছুদিন হইতে ভালো যাইতেছে না। শশীর বাড়িতে একটি আশ্রিতা মেয়ে, শশীর সে কী সম্পর্ক ভাই-কি হয়, ছেলে হওয়ার সময় ঠাণ্ডা লাগিয়া নিমুনিয়া হইয়া মরিয়া গিয়াছে।

এই ব্যাপারটিতে শশী বড় ধাক্কা খাইয়াছিল! বাড়ির উঠানে সাময়িকভাবে অতি কম খরচে কাঁচা বাঁশের সস্তা বেড়ার একটি ঘর তুলিয়া আতুড়ঘর করা হয় চাল টিনের। ব্যাপার চুকিলে টিনের চালটি ছাড়া ঘরটিকে বিসর্জন দেওয়া হয়। মৃতা মেয়েটির বেলাতেও এই ব্যবস্থাই হইয়াছিল।

এখন, শশীর বাড়িতে এ প্রথা চিরন্তন। শশী নিজেও এমনি একটি কুটিরে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, মনে নাই। শশী পৃথিবীতে আসিয়াছিল উলঙ্গ সন্ন্যাসী হইয়া, এখন সে ডাক্তার। পসারওয়ালা ডাক্তার, এমন ব্যাপারও সে ঘটিতে দিল কেন?

সে কি শুধু টাকার জন্য ডাক্তারি শিখিয়াছে? যেখানে যতটুকু কাজে লাগাইলে টাকা মেলে আপনার শিক্ষাকে সেখানে ঠিক ততটুকুই কাজে লাগাইবে? সমস্ত গ্রামকে স্বাস্থ্যতত্ত্ব শিখাইতে যাওয়া বৃহৎ ব্যাপার, ওটা নাহয় সে বাদ দিল, কিন্তু নিজের গৃহে?

না, সে ডাক্তার নয়। ব্যবসাদার। বাহিরে সে টাকা কুড়াইয়া বেড়ায়, বাহিরে সে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করিবার ভাড়া-করা সৈনিক গৃহে তাহার অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া, মৃত্যুর আধিপত্য।

তারপর কয়েক দিন শশী বাড়িতে স্বাস্থ্যনীতি প্রবর্তনের চেষ্টায় সকলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল।

কী দিয়ে দাঁত মাজছিস?

কয়লা দিয়ে।

নিমের দাঁতন দিয়ে মাজ।

তেতো যে! কয়লায় দাঁত কত সাদা হয়!

যে কয়লা দিয়ে দাঁত মাজিত সে কিছুঁতেই নিমের দাতন ব্যবহার করিতে রাজি হইল না।

শশী কি খেপিয়া গিয়াছে? দাঁত মাজিবে, তার মধ্যে এত কাণ্ড কেন!

মাটিতে ওকে মুড়ি দিলে যে কুন্দ? বাটি নেই!

বাটতে দিলে এক খাবলায় সব খেয়ে ফেলবে যে! তখন ফের চেঁচাতে আরম্ভ করবে। ছড়িয়ে দিলাম, খুঁটে খুটে অনেকক্ষণ খাবে।

কুন্দ সগর্বে ছেলেকে নিরীক্ষণ করে। নধর শিশু শশীর চোখে লাগিয়াছে। একটু কোলে নিক না? শশী তাহাকে বোঝায়, বলে, মুড়ির সঙ্গে ছেলে তোর জার্ম খাচ্ছে জানিস? পেটে কৃমি হবে, আমাশা হবে, কলেরা হবে–

কী সব অমঙ্গুলে কথা! কুন্দ বলে, বালাই ষাট ভাবে, ওসব কিছু যদি হয় তো তোমার মুখের দোষে হয়েছে জানব। ডাক্তার হয়েছ বলেই তুমি যা-তা বলবে নাকি? বাছার তুমি গুরুজন, ওর কপালে কথা তোমার ফলেও যেতে পারে, এ খেয়াল তোমার নেই!

কুন্দর ছেলে হামা দিয়া মাটি হইতে খুঁটিয়া খুঁটিয়া মুড়ি খাইতে থাকে দুবেলা। শশীর কথা কুন্দ বিশ্বাস করে না। দু আঙুলে একটি একটি মুড়ি মুখে দিবার সময় ছেলেকে তাহার কী সুন্দর দেখায়।

শশী রাগ করিয়া ধমক দিলে কুন্দ বলে, চুপ করুন শশীদা। ছেলে আপনার নয়। মামা চোখ বুজলে আপনি বাড়ি থেকে খেদিয়ে দেবেন তা জানি।

বাড়ি হইতে তাড়াইয়া দিবার কথাটা কোথা হইতে আসে শশী বুঝিতে পারে না। তবে অবান্তর শোনায় না। কারণ, শশীর মতে বড়ি হইতে খেদাইয়া দেওয়ার উপযুক্ত কুন্দ ছাড়া আর কে আছে?

শশী বলে, পিসি কথা শোনো, ছেলেকে তোমার অত দুধ খাইও না। ওর সিকি দুধ হজম করবার ক্ষমতাও যে ওর নেই।

পিসি ভাবে, হায়রে কপাল! বাড়িতে এত দুধের ছড়াছড়ি, আমার ছেলে একটু দুধ খায়, এ কারো সয় না। কতটুকু দুধই বা ও খায়!

কী জানি কবে ছেলের দুধের বরাদ্দ কমিয়া যায় এই ভয়ে পিসি ছেলেকে আরও একটু বেশি দুধ খাওয়াইতে আরম্ভ করে। দুপুরবেলা শশী ঘরে ঘরে বলিয়া যায় ; ওঠো, উঠে পড়ো সবাই, ঘুমোতে হবে না। শীতকালের দুপুরে ঘুম কিসের?

সকলে একদিন দুইদিন সহ্য করে, হাসিমুখে উঠিয়া বসিয়া হাই তুলিয়া বলাবলি করে ; শশীর হয়েছে কী? এবার বাপু ওর বিয়ে দেওয়া দরকার। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই তাহারা বিদ্রোহ করে। যাদের বয়স কম ও স্বামী আছে তারা ভাবে ; আমাদের মতো রাত জাগতে হলে দুপুরে ঘুমোই কেন বুঝতে! যাদের স্বামী নাই, তারা ভাবে : দুপুরবেলা না ঘুমিয়ে করব কী? সময় কাটবে কী করে? শশী বলে, পাগল, স্বাস্থ্য দিয়ে আমাদের কী হবে। গিনীরা, যাদের বয়স হইয়াছে, তারা ভাবে কথাটা বোধ হয় মিথ্যে নয়। দুপুরে না ঘুমুলে অম্বলের জ্বালা বোধ হয় একটু কমে। কিন্তু পেটে ভাতটি পড়লেই চোখ জড়িয়ে আসে, তার কী হবে?

গোপাল শুনিয়া বলে, ও কি শেষে বাড়িতেই ডাক্তারি বিদ্যে ফলাতে আরম্ভ করল নাকি?

সন্ধ্যার পর ঘরে ঘরে শশী একবার বেড়াইয়া আসে। পাকা ঘরের অধিবাসীদের বলে, তোমাদের কান্ডখানা কী! দম আটকে মরবে যে সবাই। সব জানালা বন্ধ, বাতাস আসবে কোথা দিয়ে?

তাহারা হাসে ; জানালা খুলিলে ঠাণ্ডা লাগিবে না? একঘর বাতাস আগে এই কটি প্রাণী নিশ্বাস নিক, দম তো আটকাইবে তবে?

বেড়ার-ঘরের অধিবাসীদের শশী বলে : বেড়ার ফাঁক পর্যন্ত কাগজ দিয়ে বন্ধ করেছ। এর মধ্যে বাতাস দুর্গন্ধ হয়ে উঠেছে। একটা জানালা অন্তত খুলে দাও। কাল নইলে আমি সিলিং কাটিয়া দেব, চাল আর বেড়ার মধ্যে যে ফাঁক আছে তাই দিয়ে পচা বাতাসটা বেরিয়ে যাবে!

কুন্দ বলে, খেমির মতো আমাদেরও নিমুনিয়া করিয়া মারবেন নাকি শশীদাদা? কচি ছেলে নিয়ে কাঁচা ঘরে আছি, কত সাবধানে থাকতে হয় আপনি তার কী বুঝবেন? এ তো দালান নয়, পাকা ঘর তো আমাদেরও ভাগ্যে নেই যে–

প্রত্যেক কথায় কুন্দ এমনি নালিশ টানিয়া আনে। এই তাহার স্বভাব। বাড়ির লোকের স্বাস্থ্য ভালো করার চেষ্টা শশী ত্যাগ করিয়াছে। প্রথমটা ভয়ানক রাগ হইয়াছিল, ক্রমে ক্রমে সে করিয়াছে জ্ঞানলাভ। সে বুঝিয়াছে, তার স্বাস্থ্যনীতি পালন করিতে গেলে জীবনের সঙ্গতি ওদের একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবে, অসুখী হইবে ওরা। রোগে ভুগিয়া অকারণে মরিয়া ওরা বড় আনন্দে থাকে। স্ফূর্তি নয়আনন্দ, শান্ত স্তিমিত একটা সুখ স্বাস্থ্যের সঙ্গে, প্রচুর জীবনীশক্তির সঙ্গে ওদের জীবনের একান্ত অসামঞ্জস্য। ওরা প্রত্যেকে রুশ্ণ অনুভূতির আড়ত, সংকীর্ণ সীমার মধ্যে ওদের মনের বিস্ময়কর ভাঙা-গড়া চলে, পৃথিবীতে ওরা অস্বাস্থ্যকর জলাভূমির কবিতা : ভাপসা গন্ধ, আবছা কুয়াশা, শ্যামল শৈবাল, বিষাক্ত ব্যাঙের ছাতা, কলমি ফুল। সতেজ উত্তপ্ত জীবন ওদের সহিবে না।

শশী ভাবে। ভাবিয়া অবাক হয় শশী। কুমুদ একদিন এই ধরনের একটা লেকচার ঝাড়িয়াছিল, পৃথিবীসুদ্ধ লোক যে কত বোকা এই কথাটা প্রমাণ করিবার জন্য। কাপড়মাপা গজ দিয়া আমরা নাকি আকাশের রঙ মাপি, জীবনের অবস্থা হিসাবে স্থির করি মনের সুখ-দুঃখ বলি মানুষ দুঃখী, আর রাগে গরগর করি। মিথ্যা তো বলে নাই কুমুদ, শশী ভাবে। চিন্তার জগতে সত্য সত্যই আমাদের স্তর-বিভাগ নাই। বস্তু আর বস্তুর অস্তি ত্ব এক হইয়া আছে আমাদের মনে। কখনও কি ভাবিয়া দেখি মানুষের সঙ্গে মানুষের বাঁচিয়া থাকিবার কোনো সম্পর্ক নাই? মানুষটা যখন হাসে অথবা কাঁদে তখন হাসিকান্নার

সঙ্গে জড়াইয়া ফেলি মানুষটাকে মনে মনে মানুষটার গায়ে একটা লেবেল আটিয়া দিই– সুখী অথবা দুঃখী। লেবেল আটা দোষের নয়। সব জিনিসেরই একটা সংজ্ঞা থাকা দরকার। কে হাসে আর কে কাঁদে এটা বোঝানোর জন্য দু-দশটা শব্দ ব্যবহার করা সুবিধাজনক বটে। তার বেশি আগাই কেন? কেন পরিবর্তন চাই? নিঃশব্দে অশ্রু মুছিয়া আনিতে চাই কেন সশব্দ উল্লাস? রোগ শোক দুঃখ বেদনা বিষাদের বদলে শুধু স্বাস্থ্য বিস্মৃতি সুখ আনন্দ উৎসব থাকিলে লাভ কিসের?

আরও মজা আছে। লাভ না থাক, ক্ষতিই বা কী?

ভাবিতে ভাবিতে রীতিমতো বিহবল হইয়া যায় বইকী শশী! সে রোগ সারায়, অসুস্থকে সুস্থ করে। অথচ একেবারে চরম হিসাব ধরিলে শুধু এই সত্যটা পাওয়া যায় রোগে ভোগা, সুস্থ হওয়া, রোগ সারানো, রোগ না-সারানো সমান– রোগীর পক্ষেও শশীর পক্ষেও। এসব ভাবিতে ভাবিতে কত অতীন্দ্রিয় অনুভূতি যে শশীর জাগে! রহস্যানুভূতির এ প্রক্রিয়া শশীর মৌলিক নয় ; সব মানুষের মধ্যে একটি খোকা থাকে, যে মনের কবিত্ব, মনের কল্পনা, মনের সৃষ্টিছাড়া অবাস্তবতা, মনের পাগলামিকে লইয়া সময়ে অসময়ে এমনিভাবে খেলা করিতে ভালোবাসে।

একদিন শশী হারু ঘোষের বাড়ির অদূরে তালবনের ধারে মাটির টিলাটিতে উঠিয়াছিল। বর্ষার পর টিলাটি জঙ্গলে ঢাকিয়া যায়। জঙ্গল ভেদ করিয়া টিলার উপর উঠিবার কী দরকার ছিল শশীর? সূর্যাস্ত দেখিবে। দিগন্তের কোলে তরুশ্রেণী যে বাঁকা রেখাটি রচনা করিয়াছে তাহারই আড়াল হইতে দেখিবে সূর্যকে।

কী ছেলেমানুষি শখ নিজের কাছে ছেলেমানুষ হইতে শশীর লজ্জা ছিল না। কেবল শখটি মিটাইতে গিয়া যে মূল্য তাহাকে দিতে হইল আগে জানিলে তাহাতে শশী রাজি হইত না। টিলার উপরে উঠিয়া পশ্চিমদিকে মুখ করিয়া সে যখন দাঁড়াইল তখন তাহার মন শান্তিতে ভরিয়া আছে। আগামী জীবনের যত ভালো মন্দ কাজ তাহাকে করিতে হইবে তাহা সম্পন্ন করিবার শক্তিতে সহজ বিশ্বাস আছে, সাহস আছে। কিন্তু সূর্য ডুবিবার আগে শশী ভীত

হইয়া পড়িল। ছেলেবেলা মাঝরাতে ঘুম ভাঙিয়া এক একদিন তাহার কেমন ভয় করিত, তেমনি ভয়। শশীর সর্বাঙ্গ শিহরিয়া কাঁপিয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, কয়েক মিনিটের ভবিষ্যতেও তাহার আর অবশিষ্ট নাই, সে এমনি অসহায়, এমনি ভঙ্গুর। পৃথিবীর বহু উর্ধ্বে, স্তরে স্তরে সাজানো ভয়ের তলে প্রোথিত পৃথিবীর উর্ধ্বে, একটা জঙ্গলাকীর্ণ মাটির টিলার শীর্ষে শশী হঠাৎ হারাইয়া গিয়াছে। সামনে রূপ-ধরা অনন্ত সীমাহীন ধারণাতীত কী যে তাহার চারিদিকে ঘনীভূত হইয়া সীমাবদ্ধ হইয়া আসিয়াছে শশী জানে না; কিন্তু আর কখনও নিশ্বাস সে লইতে পরিবে না।

তারপর কয়েকদিন শশী খুব চিন্তিত ও বিষন্ন হইয়া রহিল।

৬. গ্রাম্য জীবনে শশীর বিতৃষ্ণা

গ্রাম্য জীবনে আবার শশীর বিতৃষ্ণা আসিয়াছে। মাঝখানে কিছুদিন সে যেন এখানে বাস করিয়াছিল অন্যমনস্কের মতো। আধখানা মন দিয়া সবসময় সে তাহার কাম্য জীবনের কথা ভাবিত,-শিক্ষা সভ্যতা ও আভিজাত্যের আবেষ্টনীতে উজ্জ্বল কোলাহলমুখর উপভোগ্য জীবন। এখানকার মশকদষ্ট মৃত্তিকালীন জীবন এই সান্ত্বনার জন্য শশীর সহ্য হইয়া আসিয়াছিল যে, যখন খুশি গ্রাম ছাড়িয়া যেখানে খুশি গিয়া মনের মতন করিয়া জীবনটা সে আরম্ভ করিতে পারে। ইতিমধ্যে পৃথিবীর বিপুলতা অবশ্য কমিয়া যায় নাই। শশীর স্বাধীনতাও হরণ করে নাই কেহ। তবু শশীর মনে হয় চিরকালের জন্য সে মাকামারা গ্রাম্য ডাক্তার হইয়া গিয়াছে-এই গ্রাম ছাড়িয়া কোথাও যাইবার শক্তি নাই। নিঃসন্দেহে এজন্য দায়ী কুসুম। শশীর কল্পনার উৎস সে যেন চিরতরে রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। বিদ্যুতের আলের মতো উজ্জ্বল যে জীবন শশী কল্পনা করিত সে যাযাবরের জীবন নয়,-শশীর নীড়-প্রেম সীমাহীন। কল্পনার তাই একটি কেন্দ্র ছিল শশীর, এক অত্যাশ্চর্য অস্তিত্বহীনা মানবী, কিন্তু অবাস্তব নয়; শশীর ভাবুকতা উদভ্রান্ত হইতে জানে না। কুসুম যেন তাহাকে মিথ্যা করিয়া দিয়াছে- সেই মহা-মানবীকে।

ছোট বোন সিন্ধু আর মতি ছাড়া কারো সঙ্গে শশীর ভালো লাগে না। এতবড় গ্রামে শুধু এই দুটি প্রিয়তমা বান্ধবী। নিচে সিন্ধু পুতুলখেলা করে, খাটে বসিয়া শশী অস্বাভাবিক মনোযোগের সঙ্গে সে খেলা চাহিয়া দ্যাখে।

খুকী, বড় হইয়া তুই কী করবি?

পুতুল খেলব।

এই একটিমাত্র জবাবে ক্ষণেকের জন্য শশীর মন যেন একেভাবে হালকা হইয়া যায়। জানালা দিয়া সে বাহিরের দিকে তাকায়। জানালার নিচে সেদিন কুসুম যে গোলাপের চারটি মাড়াইয়া দিয়াছিল, শশীর যত্নে সেটি আবার মাথা তুলিয়াছে।

মতি স্পষ্টই জিজ্ঞাসা করে, আপনার সেই বন্ধুটি পত্র দিয়াছে?

কে রে মতি, কুমুদ? না দেয়নি—কেন?

এমনি শুধোচ্ছি।

সুন্দর যাত্রা করে যে!

তা বটে। সুন্দর যাত্রা করে বলিয়া কুমুদ পত্র দিয়াছে কি না মতির তা জিজ্ঞাসা করা চলে বটে। শশী হাসিয়া বলে, ওর পার্ট তোর খুব ভালো লাগত, না রে মতি?

আমার একার কেন, সবার লাগত। একটা যাত্রাগান দিন না ছোটোবাবু, দেবেন? কত টাকা নেয়? গম্ভীরমুখে শশীর হাসিকে মতি অগ্রাহ্য করে, বলে, আমার টাকা থাকলে দলটা ভাড়া করে আনতাম ছোটোবাবু, আমাদের বাড়ির সামনে শামিয়ানা খেঁচে আসর করে দিতাম, পালা হত সাত দিন।

মতি একটু গম্ভীর হইয়াছে আজকাল। কথা বলিতে বলিতে দুচোখে তাহার একটু ভীরু ঔৎসুক্য দেখা দেয়। কথা শেষ করিয়া কী যেন ভাবে মতি। শশী ভাবে , কে জানে, হয়তো ধীরে ধরে অবশ্যম্ভাবী আত্মচিন্তাই এবার আসিতেছে মতির। গ্রামের মেয়ে তো, নিশ্চিন্ত থাকিবার বয়সটা ইতিমধ্যে পার হইয়া যাইতে আরম্ভ করিবে আশ্চর্য নাই।

একদিন বাসুদেব বাঁড়ুজ্যে সপরিবারে গ্রামত্যাগের আয়োজন করিলেন। কলিকাতায় মেজছেলে চাকরি করিত, সম্প্রতি সেজছেলেরও কোনো আফিসে চাকুরি হইয়াছে। জমিজমা নাই। গোপালের শত্রুতার জন্য কেহ টাকা ধার করিতে আসে না। আসিলেও গোপালের পরামর্শে সুদে-আসলে গাপ করিতে চায়। ম্যালেরিয়ায় ভুগিতে আর কেন গ্রামে থাকা? এমন অনেক গিয়াছে। গ্রাম জুড়িয়া এখানে-ওখানে পোড়ো ভিটা খাঁ-খাঁ করে। খবর পাইয়া শশী দেখা করিতে গেল; জিনিসপত্র বাধাছাদা হইতেছে দেখিয়া হঠাৎ

কেমন রাগ হইয়া গেল শশীর। সে নিজে যখন গ্রামের পাঁকে আত্মসমর্পণ করিয়াছে চিরকালের জন্য, আর কারো যেন গ্রাম ত্যাগ করা অন্যায়।

আপনার কাছে কতগুলো টাকা পেতাম বাঁড়ুয্যেকাকা।

কলকাতায় গিয়া পাঠিয়ে দেব বাবা। কটা টাকা তো-ছেলেরা মাসকাবারের মাইনে পেলে একটা দিনও দেরি করব না।

শশী মাথা নাড়িল, না, অনেকদিন পড়ে আছে টাকাটা, দিয়েই যান!

শশীর এত টাকার প্রয়োজন কিসের কে জানে বিশ্রী একটা কলহ বাঁধিয়া গেল বাসুদেবের সঙ্গে। তার দুই ছেলে রুখিয়া আসিল। কোনো পক্ষেরই মানঅপমানের পার্থক্য রহিল না। তবু শশী ছাড়িল না-ছোট নোটবুকটিতে ভিজিট আর ওষুধের জন্য যত টাকার অঙ্কপাত করা ছিল, সমস্ত টাকা আদায় করিয়া ক্ষান্ত হইল। টাকাটা পকেটে পুরিয়া বলিল, দু দুটো চাকরে ছেলে আপনার,-ডাক্তারের ফি দিতে মরেন কেন বাঁড়ুয্যেকাকা? কলকাতায় ডাক্তার দেখে তার সঙ্গে যে এ রকম করবেন না কখনও, জুতো মেরে যাবে।

ফিরতে ইচ্ছা হয় না শশীর,-অনেকক্ষণ ধরিয়া আরও তীব্র ভাষায় সকলকে গালাগালি দিতে ইচ্ছা হয়, সে একটা কটু আনন্দের নিবিড় স্বাদ পায়। বাসুদেবের বিধবা বউটি, মৃত ভুতোকে বাঁচানোর জন্য একদিন যে শশীর পথ আটকাইয়াছিল, হঠাৎ তার দিকে চোখ পড়ায় শশী যেন চমকাইয়া গেল। ভূতোর মৃত্যুর তিন মাস পরেও এ-বাড়ির কাছাকাছি পথ দিয়া যাওয়ার সময় শশী এর বিনানো কান্না শুনিয়াছে। আজও সে কাঁদিতেছিল, নিঃশব্দে। আশ্চর্য নয়, যার চিকিৎসায় ভুতো বাঁচে নাই, সেই ডাক্তার আসিয়া ভিজিটের টাকার জন্য এমন কান্ড করিলে মন যার স্নেহকোমল সে তো কাঁদিবেই। পাংশুমুখে শশী পলাইয়া আসিল।

ভূতোর চিকিৎসার হিসাব যে সে ধরে নাই,-যে টাকা সে আদায় করিয়াছে তার প্রত্যেকটি পয়সা যে এ-বাড়ির জন্য লোকের অসুখের চিকিৎসা করার দরুন,-যারা আজও সুস্থ

শরীরে বাঁচিয়া আছে, বউটি একবারও তাহা ভাবিবে না। ভূতোর জন্য মন কেমন করিলে গাওদিয়ার শশী ডাক্তারকে স্মরণ করিয়া সে শিহরিয়া উঠিবে। হয়তো কোনোদিন শহরের প্রতিবেশিনীদের কাছে গ্রামের গল্প বলিবার সময় আজিকার ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলিবে, গাঁয়ের ডাক্তারগুলো পর্যন্ত এমনি মানুষ দিদি, আমরা গাঁ ছেড়ে এসেছি কি সাধে?

কয়েক দিন পরে শশীর একবার কলিকাতা যাওয়ার প্রয়োজন ছিল,– কয়েকখানা বই ও কতগুলি ওষুধ কিনিবে। একদিন পরাণ লজ্জিত মুখে কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, বলিল, কলকাতা যাবার বায়না নিয়ে মতি বড়ো কাঁদা-কাটা জুড়েছে ছোটোবাবু।

শশী অবাক হইয়া বলিল, কলকাতা যাবে? কার সঙ্গে?

বলছে আপনার সঙ্গে যাবে।

শশী হাসিয়া বলিল, তুমি বুঝি তাই আমাকে বলতে এসেছ, যদি নিয়ে যাই? তোমার বুদ্ধি নেই পরাণ। আমি যেতে পারি নিয়ে,–গাঁয়ের লোক বলবে কী?

শশী একা মতিকে লইয়া কলিকাতা যাইবে, পরাণ সেকথা বলিতে আসে নাই। পরাণও সঙ্গে যাইবে বইকী। মোক্ষদা বারকয়েক গঙ্গায়ানের ইঙ্গিত করিয়াছে,-এ সুযোগ বুড়ি ছাড়িবে মনে হয় না। সুতরাং কুসুমও যাইবে সন্দেহ নাই। মতির জন্য এবার ফতুর হইতে হইবে পরাণকে,-এতগুলি মানুষের কলিকাতা যাওয়া-আসার খরচ কি সহজ। কিন্তু না-গেলেও চলিবে না,-মতি দুদিন নাওয়া-খাওয়া ছাড়িয়া কাঁদিয়াছে।

হঠাৎ ওর এত কলকাতা যাওয়ার শখ হল কেন? শশী জিজ্ঞাসা করিল।

পরাণ তা জানে না। মাথা নাড়িয়া জ্ঞানীর মতো সে শুধু বলিল, জানেন ছোটোবাবু, নাই দিয়ে দিয়ে কর্তা ওর মাথাটা খেয়ে গেছে।

নাই তুমিও ওকে কম দাও না পরাণ!

শশী মতিকে বুঝানোর চেষ্টা করিল। বলিল, কী চাস তুই আমাকে বল, কিনে আনব তোর জন্যে–কী করবি মিছামিছি কলকাতা গিয়ে? মতি ভীরু ও শান্ত, শশীর কথা সে চিরকাল মানিয়া আসিয়াছে,–আজ কিন্তু সে কোনো কথা কানে তুলিল না।

শেষে শশী রাগিয়া বলিল, চল তবে চল। তোকে কলকাতায় ফেলে রেখে আমরা চলে আসব। তখন টের পাবি।

নৌকা, স্টিমার, রেল, তবে কলকাতা। সমস্ত পথ মতি অস্থির, উত্তেজিত হইয়া রহিল! কুসুম চারদিক দেখিতে দেখিতে বেড়ানোর আনন্দ উপভোগ করিতে করিতে চলিল, কিন্তু মতির যেন নদীর বুকে, রেলপথের দুধারে দেখিবার কিছু মিলিল না। অতটুকু মেয়ে, জীবনে এই প্রথম দূরদেশে বেড়াইতে চলিয়াছে, চোখের পলকে পথ ফুরাইয়া গন্তব্যস্থানে পৌঁছাইয়া যাওয়ার ভয়টাই ছিল তার পক্ষে স্বাভাবিক, কিন্তু তার একান্ত আগ্রহ দেখা গেল তাড়াতাড়ি কলিকাতায় উপস্থিত হইতে। হয়তো সে ভাবিয়াছিল কলিকাতায় পা দেওয়া মাত্র কুমুদের দেখা মিলিবে,–তাকে শহরে অভ্যররথনা করিয়া লইবে রাজপুত্র প্রবীর!

পথে একবার সে জিজ্ঞাসা করিল, কলকাতায় আমরা কোথায় থাকব ছোটোবাবু? আপনার সেই বন্ধুর বাড়িতে?

শশী বলিল, খুব তাহলে যাত্রা শুনতে পারিস, না? যাত্রা শুনবার লোভে তুই কলকাতায় চলেছিল নাকি মতি? থিয়েটার দেখিস একদিন, দেখাব তোদের–যাত্রার চেয়ে সে ঢের ভালো।

পাঁচ দিন তাহারা কলিকাতায় রহিল। যা-কিছু দেখার ছিল শহরে দেখিয়া বেড়াইল। স্নান করিল গঙ্গায়, পূজা দিল কালীঘাটে, ট্রামে চাপিয়া অকারণে ঘোরাফেরা করিল। কিন্তু কোথায় মতির রাজপুত্র প্রবীর? শশীর সে বন্ধু, এই শহরের কোথাও সে বাস করে। কিন্তু

শশী একবার না করিল তার নাম, না আনিল তাকে ডাকিয়া। শহরের অফুরন্ত বিস্ময় অভিভূত করিয়া না রাখিলে মতির দুচোখ ভরিয়া হয়তো জল আসিত। শিয়ালদহের কাছে একটা হোটেলে তাহারা দু-খানা ঘর ভাড়া করিয়াছে-একটা ঘর শশীর একার। একদিন শশী এক ডাক্তার বন্ধুর বাড়ি রাত কাটাইয়া আসিল। রাত্রে উকি দিয়া তার ঘর খালি দেখিয়া মতি ভাবিল শশী তবে নিশ্চয় কুমুদের কাছে গিয়াছে – সকালে দুজনে একসঙ্গে আসিবে। কুমুদ ছাড়া জগতে শশীর আর কোনো বন্ধু আছে বলিয়া মতি জানে না। পরদিন বেলা দশটা বাজিয়া গেল, সকাল হইতে মতি সিড়ি দিয়া হোটেলের সমস্ত লোকের ওঠানামা চাহিয়া দেখিল, কিন্তু শশী অথবা কুমুদ কেহই আসিল না। পরাণের সঙ্গে সেদিন তাহার জাদুঘরে যাওয়ার কথা,-সকাল সকাল খাওয়াদাওয়া সারিয়া বাহির হওয়া দরকার,-মতি নড়িতে চায় না।

ছোটোবাবু আসুক?

ছোটোবাবু এবেলা আসবে না মতি, এলে এতক্ষণ আসত।

ওবেলা জাদুঘর যাব দাদা, অ্যাঁ? এবেলা বড্ড শীত।

পরাণের চাদরটা গায়ে জড়াইয়া মতি ঠিরঠির করিয়া শীতে কাঁপে।

কুসুম বলে, মর তুই আহ্লাদী মেয়ে ছোটোবাবু আজ মটরগাড়ি চাপাবে না লো, পিত্যেশ করে থেকে করবি কী? দেরি হল বলে মটর এল সেদিন, মটরে ঢের পয়সা লাগে। নাইবি তো নেয়ে ফ্যাল মতি, নয়তো ভাত দিয়েছি খাবি আয়।

যাইতে হইল মতিকে। জন্তু-জানোয়ার দেখিয়া সন্ধ্যার সময় হোটেলে ফিরিয়া সে দেখিল, ঘরে বসিয়া শশী চা খাইতেছে-একা। কুমুদ নিশ্চয় আসিয়াছিল, বসিয়া বসিয়া বিরক্ত হইয়া চলিয়া গিয়াছে।

মতি সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, কখন এলেন ছোটোবাবু?

শশী বলিল, এই তো এলাম খনিক আগে। কোথায় গিয়েছিলি-জাদুঘর? কাল কিন্তু শেষ দিন মতি, পরশু আমরা ফিরে যাব।

মতির তাতে কোনো আপত্তি নাই। আর কলিকাতায় থাকিয়া কী হইবে?

পরদিন সন্ধ্যার সময় শশী বিন্দুর খবর আনিতে গেল। নন্দ থাকিলে রাগ করিবে, হয়তো অপমানও করিবে। করুক। সেজন্য বোনটা বাঁচিয়া আছে কি না এইটুকু না জানিয়া বাড়ি ফেরা যায় না। গোপালের খেয়ালে জীবনে যারা দুঃখ পাইয়াছে তাদের জন্য শশীর মনে একটা অতিরিক্ত মমতা আছে। গোপালের কীর্তিতে নিজেকেও সে কেমন অপরাধী মনে করে। মনে হয়, তারও যেন দায়িত্ব ছিল।

পাড়াটা ভালো নয়। সে পথের শেষাশেষি বিন্দুর বাড়ি-সন্ধ্যার পর মানুষকে সে পথে হাঁটিতে দেখিলে চেনা লোক নিন্দা রটায়। তবে বিন্দুর বাড়িটা একটু তফাতে,- ভদ্রপাড়ার গাঁ ঘেষিয়া! বাড়ির পুবদিকে খানিকটা জমি খালে পড়িয়া আছে। ইট-সুরকির তলে সমাধি পাওয়া বিন্দু বোধহয় ওইদিকে চাহিয়া মাঝে মাঝে অবরুদ্ধ নিশ্বাস ত্যাগ করে।

বিন্দু বাড়ি ছিল না। বিন্দুকে শশী প্রায় আড়াই বছর পরে দেখিল। প্রায় তেমনি আছে বিন্দু। বিন্দুর ঘরের চেহারাও বিশেষ বদলায় নাই।

কেমন আছিস বিন্দু?

ভালো আছি দাদা, কবে এলে? সবাই ভালো আছে তো?

শশী হাসিয়া বলিল, কেন? চিঠি লিখে খবর নিতে পারিস না?

বিন্দু বলিল, চিঠি লিখতে বড় আলসেমি লাগে দাদা!

শশী জানে এটা ফাঁকির কথা। নন্দ চিঠি লিখতে দেয় না। শশীকে খাবার দিয়া নানাকথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। গাওদিয়া গ্রামটি সম্বন্ধে আজও বিন্দুর কৌতুহল আছে। কে

বাঁচিয়া আছে, কে স্বর্গে গিয়াছে, চেনা ছেলেমেয়েদের মধ্যে কার কার বিবাহ হইয়াছে, কার কটি ছেলেমেয়ে–শশীর মুখে এসব খবর শুনিতে শুনিতে বিন্দুর চোখ ছলছল করিতে লাগিল।

শশী বলিল, এর মধ্যে তোর খোকা-খুকি কিছু হয়নি বিন্দু?

বিন্দু ঘাড় নাড়িল। কিন্তু মুখে বলিল উলটা কথা।

মরে গেল যে!

মরে গেল? কবে মরে গেল?

আর বছর।

শেষবার দেখিতে আসিয়া শশীর মনে হইয়াছিল বিন্দুর বোধ হয় ছেলে হইবে। সে ছেলে হইয়া তবে মরিয়া গিয়াছে? বিন্দু দেওয়ালের গাঁয়ে রাধাকৃষ্ণের ছবিটার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। হঠাৎ শশীর মনে হইল শরীরটা বিন্দুর ঠিক আছে, কিন্তু মুখটা তাহার কেমন এক অদ্ভুত রকমের রোগাহইয়া গিয়াছে। মুখের চামড়ার নিচেই যেন শুষ্কতা,- ত্বকের লাবণ্য শুষিয়া লইতেছে।

তোর অসুখবিসুখ করেছে নাকি বিন্দু?

কিসের অসুখ? বেশ আছি আমি।

বাহিরে গিয়া বিন্দু কোথা হইতে একপাক ঘুরিয়া আসিল।

ভালোই আছিস বিন্দু, অ্যাঁ?

আছি বইকী!

সমস্ত ব্যাপারটা এমন বিস্ময়কর লাগে! এমন রহস্যময় মনে হয় বিন্দুর মুখের গোপন-করা বুড়োটে ভাব, বিন্দুর অবসারক্লিষ্ট, নিরুত্তেজ কথা। বিন্দু তার বোন, পাতানো সম্পর্ক নয়। ছুরি দিয়া আঙুল কাটিয়া দিলে দুজনের যে রক্ত বাহির হইবে তাহা এক, কোনো পার্থক্য নেই। অথচ বিন্দুকে সে একরকম চেনে না, বোঝে না।

শশী মমতার সঙ্গে বলিল, অত দূর বসলি যে এদিকে আয়, এখানে বোস।

বিন্দু উদ্ধতভাবে বলিল, কেন?

শশী বলিল, আয়, সরে আয়, কটা কথা শুধোই তোকে।

ইতস্তত করিয়া বিন্দু কাছে আসিল। তার দুচোখ দিয়া জল পড়িতেছে।

কাঁদিস কেন?

এ প্রশ্নে বিন্দু ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

কোনোদিন তুমি আমাকে কাছে ডেকেছ! কেউ ডেকেছে!

শশী অবাক হইয়া যায়। কিন্তু বলিতে পারে না। এ বাড়িতে আসিয়া পরের মতো আধঘণ্টা বলিয়া সে চিরদিন বিদায় লইয়াছে, তা সত্য। কিন্তু কী করিতে পারিত শশী? কদাচিৎ অতটুকু সময়ের জন্য সে যে আসিত, তাতেই নন্দ পাছে রাগ করিয়া বিন্দুকে কষ্ট দেয় শশীর সেজন্য ভয় করিত। বিন্দুর মনে তাতে এত ব্যথা লাগিত সেই নিরুপায় অনাদরে? বিন্দু তো কোনোদিন কিছু বলে নাই মুখ ফুটিয়া।

অনেক দিনের অভিমানে বিন্দু অনেকক্ষণ কাঁদিল। শেষে সে শান্ত হইল, শশী বলিল, তোর ব্যাপারটা খুলে বল তো বিন্দু?

কিছু না দাদা।

শশী বুঝাইয়া বলিল, আজ না বললে আর কোনোদিন বলতে পারবি না বিন্দুঅন্যদিন লজ্জা করবে। নন্দ খারাপ ব্যবহার করে?

হুঁ। আমাকে ভীষণ শাস্তি দিচ্ছে।

ভীষণ শাস্তি? নন্দ ভীষণ শাস্তি দিতেছে বিন্দুকে? বিন্দুর এমন বাড়ি, এত কাপড়গয়না, এত বিলাসিতার ব্যবস্থা!

হু। তোকে ভালোবাসে না, বিন্দু? বাসে–স্ত্রীর মতো নয়–রক্ষিতার মতো।

অ্যাঁ? কিসের মতো?–শশী যেন বুঝিতে পারে। গাওদিয়ার বিন্দুকে গ্রাসকরা কলিকাতার অনামী-রহস্য শশীর কাছে স্বচ্ছ হইয়া আসে।

বিন্দু বলিল, দেখবে? উনি এলে কোনো ঘরে বসেন দেখবে দাদা? চলো দেখাই।

কী সে তীব্র আলো! গোটা-তিনেক বালব ঘিরিয়া কাচের ঝাড় ঝলমল করে-শশীর চোখ যেন ঝলসিয়া গেল। দেওয়ালে আট-দশটা অশ্লীল ছবি। মেঝে জুড়িয়া ফরাশ পাতা। তাতে কয়েকটা বড় বড় তাকিয়া। হারমোনিয়াম, বাঁয়া তবলা এসবও আছে।

বিন্দু বলিল, গান শিখিয়েছেন। উনি তবলা বাজান, আমি গান করি।

শশীর আর কিছু দেখিবার অথবা শুনিবার ইচ্ছা ছিল না। সে মড়ার মতো বলিল, ওঘরে চল বিন্দু।

বিন্দু শক্ত করিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, না, আসল জিনিস দেখে যাও।

ঘরে ছোটো একটি আলমারি ছিল। টানিয়া দরজা খুলিয়া বিন্দু বলিল, দ্যাখো।

শশী না-দেখিয়াই অনুমান করিয়াছিল। আলমারির তাকগুলি নানা আকারের নানা লেবেলের বোতলে বোঝাই হইয়া আছে।

নিজেকে শশীর অসুস্থ মনে হইতেছিল। এমন কান্ডও ঘটে সংসারে? কত শক্ত মেয়ে বিন্দু! এতকাল একথা সে চাপিয়া রাখিয়াছিল? ছেলে হইয়া মরিয়া না গেলে, স্নেহ করিয়া কাছে না ডাকিলে, আজও হয়তো সে কিছু বলিত না।

তুই খাস?

না খেলে ছাড়ছে কে দাদা? দ্যাখো, আমার একটা দাঁত বাঁধানো–প্রথম দিন সাড়াশি দিয়ে দাঁত ফাঁক করে গলায় ঢেলে দিয়েছিল। তার পর থেকে নিজেই খাই।

এদিকের ঘরে আসিয়া শশী বলিল, জোর করে বিয়ে দেবার জন্যে, না?

বিন্দু বলিল, না। আমি হাবভাব দেখিয়ে ভুলিয়েছিলাম বলে।

কিন্তু তা তো তুই করিসনি? তুই তখন কতটুকু!

ও তাই মনে করে দাদা।

বিন্দুর শুষ্ক চোখ এতক্ষণ জ্বলজ্বল করিতেছিল, আবার স্তিমিত সজল হইয়া আসিল। চোখ মুছিয়া বলিল, কেন মিথ্যে তোমায় বললাম।

শশী ভাবিতেছিল, বিন্দুর কথায় চমকাইয়া গেল। এমন হতাশ হইয়া গিয়াছে বিন্দু? ভাবিতে ভাবিতে শশীর মুখ কালো আর কঠিন হইয়া ওঠে। অন্যদিকে চাহিয়া সে জিজ্ঞসা করিল, নন্দ আর কাউকে আনে,–বন্ধুবান্ধব?

বিন্দু বলিল, না না ছি, ও সব বুদ্ধি নেই। যা শাস্তি দেবার নিজেই দেয়। তারপর মৃদুস্বরে আবার বলিল, অসুখ-বিসুখ হলে খুব ভাবে দাদা, সেবাও করে।

শশী অনেকক্ষণ ভাবিল।

আমার সঙ্গে যাবি বিন্দু? বিন্দু উৎসুক হইয়া বলিল, কোথায় যাব তোমার সঙ্গে?

শশী বলিল, কাল আমরা দেশে বলে যাব,–যাবি?

বিন্দু ব্যগ্র হইয়া বলিল, যাব। চলো এখনি বেরিয়ে পড়ি দাদা, হঠাৎ যদি এসে পড়ে?

বিন্দুর যেন এক মিনিটও সবুর সইবে না। এতকাল এখানে সে কেমন করিয়া ছিল কে জানে। গাড়িতে শশী তাহাকে এই কথাই জিজ্ঞাসা করিল।

পথের পাশে সাজানো দোকানের দিকে চোখ রাখিয়া বিন্দু বলিল, ভেবেছিলাম ক্ষমা করবে।

এতকাল পরে এ কী প্রত্যাবর্তন বিন্দুর? গহনা কই, কাপড় কই, মোটবহর কই? গ্রামের লোক অবাক মানিল বিন্দুকে জ্বালাতনও কম করিল না। ব্যাপারটা বুঝিবার জন্য সকলেই উৎসুক। জেরায় জেরায় বাহিরে পুরুষদের এবং ভিতরে মেয়েদের জীবন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। শশী আর বিন্দু নিজে ছাড়া কেহ কিছু জানিত না, কেহ কিছু জানিতেও পারিল না। তাই মুখে মুখে নানা কথা প্রচারিত হইয়া গেল।

সেনদিদিই বিন্দুকে যন্ত্রণা দিল সবচেয়ে বেশি। শশীকে অবাক করিয়া কিছুদিন হইতে সেনদিদি হামেশা এ বাড়িতে আসিতেছিল। গোপালের সঙ্গে তার যেন একটা সন্ধি হইয়াছে। কুর্তায় ভুড়ি ঢাকিয়া গোপাল তামাক টান, অদূরে সিড়ি পাতিয়া বসিয়া সেনদিদি তার সঙ্গে করে আলাপ। সেনদিদির দাগী মুখ আর কানা চোখ দেখিয়া গোপালেরও যেন একটা রোগ আরাম হইয়া গিয়াছে। আজকাল সে প্রসন্ন প্রশান্ত। গ্রাম্য রমণীর আবেগপূর্ণ মমতায় সেনদিদি শশীকে আকর্ষণ করিত বটে এবং লাবণ্যবতীর স্নেহ স্বভাবতই মানুষ একটু বেশি পছন্দ করে বলিয়া সে মমতা দামিও ছিল শশীর কাছে। কিন্তু একথা শশী কখনও বিশ্বাস করে নাই যে পড়ন্ত সূর্যের মতো শেষ যৌবনের অত্যাশ্চর্য রূপের অস্ত্রে ছেলেকে বশ করিয়া গোপালের উপর একটা উপযুক্ত প্রতিরোধ গ্রহণের এতটুকু ইচ্ছাও সেনদিদির ছিল। গোপালের বাঁকা মন বাঁকা মানে খুঁজিত। তাই সেনদিদির বর্তমান

শ্রীহীনতায় গোপালের প্রসন্নভাব শক্র বুঝিতে পারে। বুঝিতে পারে না সেনদিদির আসা-যাওয়া। চিরকাল যে গল্প করিতে পারে, শশীকে তা যেন অপমান করে। মাঝে মাঝে হাসির কথাও বুঝি বলে গোপাল, কারণ সেনদিদির কুশ্রী মুখখানা অনিন্দ্য হাসিতে ভরিয়া যাইতেও দেখা যায়। শশী জানে, খুব অল্পবয়সে সেনদিদির ভার গোপালের ঘাড়ে পড়িয়াছিল। তারপর কত টাকার বিনিময়ে সেনদিদিকে গোপাল যামিনীর কাছে বিসর্জন দিয়াছিল তাও শশী জানেদেড়শো টাকা! গোপালের গ্রাম্য রসিকতায় সেই সেনদিদি আজ এমন অকুণ্ঠ হাসি হাসিতে পারে ভাবিলে গ্রামের উপরেই শশীর বিতৃষ্ণা যেন বাড়িয়া যায়।

বিন্দুকে সেনদিদি একদিন একাই প্রায় তিনঘণ্টা কোণঠাসা করিয়া রাখিল। বাক্যহারা মেয়েটাকে কত কথাই সে যে বলিল তার ঠিকঠকানা নাই। বিন্দু বেশির ভাগ কথার জবাব পর্যন্ত দিল না। তাতে দমিবার পাত্রী সেনদিদি নয়। নিজের প্রশ্ন করিয়া নিজেই একটা পছন্দসই জবাব আবিষ্কার করিয়া বিন্দুর সম্বন্ধে নিজের কাল্পনিক জ্ঞানকে সে অবাধে আগাইয়া লইয়া গেল। মোট কথাটা দাঁড়াইল এই : নন্দ আর একটা বিবাহ করিয়া বিন্দুকে দেখাইয়া দিয়াছে। নন্দর তাহলে তিনটে বিয়ে হল—না দিদি? কী মানুষ নন্দ, অ্যাঁ? শশী বুকি খবর পেয়ে আনতে গিয়েছিল? তাই তো বলি, হঠাৎ কেন শশী কলকাতা গেল। আমি জানি দিদি তোর এমন অদেষ্ট হয়েছে!

এমনি আবেগপূর্ণ মমতা সেনদিদির কানা চোখ ভরিয়া তাহার অশ্রু টলমল করিতে লাগিল!

কুসুম যেদিন শশীর ঘর দেখিয়া গিয়াছিল তারপরে নির্জনে কুসুমের সঙ্গে শশীর আর দেখা হয় নাই। একদিন ভোরবেলা সেই জানালা দিয়ে কুসুম তাহাকে ডাকিয়া তুলিল। শশী উঠিয়া দ্যাখে গোলাপের সেই চারটিকে আজও কুসুম পায়ের তলে চাপিয়া দাঁড়াইয়াছে। কাটা ফুটিবার ভয়ও কি নাই কুসুমের মনে?

আজও চারাটা মাড়িয়ে দিলে বউ! কত কষ্টে বাঁচিয়েছি সে বার।

ইচ্ছে করেই দিয়েছি ছোটোবাবু, চারার জন্যে এত মায়া কেন? দরকার আছে, তবু ডাকতে আসতে হবে,-রাগ হয় না মানুষের?

শশী বলিল, কী দরকার বউ?

কুসুম বলিল, তালপুকুরে আসুন একবার, বলছি।

শশী তালপুকুরে গেল। কনকনে শীতে তালগাছগুলি পর্যন্ত যেন অসাড় হইয়া গিয়াছে। পুকুরের অনেকখানি উত্তরে একটা তালগাছ মাটিতে পড়িয়াছিল, শশীকে কুসুম সেইখানে লইয়া গেল। নিজে তালগাছের গুড়িটাতে জাকিয়া বসিয়া হুকুম দিয়া বলিল, বসুন ছোটোবাবু, অনেক কথা, সময় নেবে বলতে।

শশী কিছু বলিল না। কুসুমের অনেকখানি তফাতে বসিল। কুসুম যেন একটু অবাক হইয়া গেল প্রথমে, তারপর হঠাৎ লজ্জায় মুখখানা তাহার লাল হইয়া উঠিল; বিন্দুর ব্যাপারটা শুনিবার জন্য কুসুম শশীকে এখানে ডাকিয়া আনিয়াছে। কৌতুহলের বশে এতক্ষণ তাহার খেয়ালও হয় নাই যে চুপিচুপি শশীকে এখানে ডাকিয়া আনিলে কতখানি উপযাচিকা অভিসারিকার মতো কাজ করা হয়।

তারপর বিন্দুর কথা জিজ্ঞাসা করিয়া কুসুম শশীকে একটু অবাক করিয়া দিল। খেয়ালি কম নয় কুসুম। বিন্দুর কাহিনী শুনিবার জন্য এত কাণ্ড! ও-কথা সে তো যেখানে খুশি বলিতে পারিত কুসুমকে!

ওর কথা শুনে কী করবে বউ?

কুসুম সবিস্ময়ে বলিল, আমাকে বলবেন না?

শশীর গোপন কথা কুসুমকে না-বলার মতো সৃষ্টিছাড়া ঘটনা যেন আর নেই। জীবনে আজ প্রথম শশী কুসুমের প্রকৃতির একটা আশ্চর্য দিক আবিষ্কার করিয়া অভিভূত হইয়া গেল। একটি বালিকা আছে কুসুমের মধ্যে, মতির চেয়েও যে সরল, মতির চেয়েও নির্বোধ।

সংসারকে দেখিয়া শুনিয়া কুসুমের যে-অংশটা বড় হইয়াছে, এই বালিকা কুসুমটি তার আড়ালে বাস করে। সংসারকে যখন সে ভুলিয়া যায়, জীবনের যত দায়িত্ব, যত জটিলতা আছে, কিছুই যখন তাহার নাগাল পায় না, তখন তাহার এই বিস্ময়কর দিকটা চোখে পড়ে। শশী বুঝিতে পারে, এতকাল কুসুমের যেসব পাগলামি সে লক্ষ্য করিয়াছে,-ওর শান্ত সহিষ্ণু ও গম্ভীর প্রকৃতির সঙ্গে যা কোনোদিন খাপ খাওয়ানো যায় নাই -সেসব বহু দূর-অতীতের ছেলেমানুষ কুসুমের কীর্তি-কুসুমের এখনকার পরিণত দেহমনে যার অস্তিত্ব কল্পনা করাও কঠিন।

বিন্দুর কথা ধীরে ধীরে শশী সব বলিয়া গেল। বলিতে বলিতে সে অন্যমনস্কও হইয়া গেল মাঝে মাঝে। কী রহস্যময়ী আজ তাহার মনে হইতেছে কুসুমকে। কুসুম যখন সেদিন দুপুরে তার ঘর দেখিতে গিয়াছিল, সেদিন প্রথম সে লক্ষ করিয়াছে, সব তাহার মন ভুলানোর জন্য বয়স্কা রমণীর প্রণয়-ব্যবহার। বড় দুঃখ হইয়াছিল সেদিন শশীর নিজের মনকে সে মহার্ঘ মনে করে, সে মন যেন বিকাইয়া গিয়াছিল কানাকড়ির দামে। শশী এখন তৃপ্তি বোধ করিল। তাই যদি হইত, কুসুমের সংস্পর্শে সে বছরের পর বছর কাটাইয়া দিয়াছিল, একদিনও সে কি টের পাইত না কুসুম কী চায়? একটি নারী মন জুলাইতে চাহিতেছে এটুকু বুঝিতে কি সাতবছর সময় লাগে মানুষের? এই কুসুমের মধ্যে যে কুসুম কিশোর-বয়সী, সে শুধু খেলা করিত শশীর সঙ্গে। শশী তো চিনিত না, তাই ভাবিত, এত বয়সে পাগলামি গেল না কুসুমের।

তালবন হইতে শশী সেদিন হালকা মনে বাড়ি ফিরিল।

কুসুমকে বিন্দুরও ভালো লাগিল। কুসুমের কৌতুহল মিটিয়াছিল। বিন্দুর কলিকাতার জীবন সম্বন্ধে সে কোনো কথা তুলিল না। সাধারণ নিয়মে বিন্দু বাপের বাড়ি আসিয়াছে, এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নাই, এমনি ভাব দেখাইল কুসুম। বিন্দুর কাছে সে অনেক সময় আসিয়া বসে, নানা কথা বলিয়া বিন্দুকে ভুলাইয়া রাখতে চেষ্টা করে। ওসব পারে সে। সত্যমিথ্যা জড়াইয়া জমজমাট উপভোগ কাহিনী রচনা করিতে কুসুম অদ্বিতীয়া। অপরূপ ভ্রান্তি সৃষ্টি করিবার কৌশল সে জানে চমৎকার। বলে, শহর থেকে শখ করে

গাঁয়ে তো এলে ঠাকুরঝি, মরবে ভুগে ম্যালেরিয়ায়। দুবার কাপুনি দিয়ে জ্বর এলে বাপের বাড়িতে পেন্নাম করে কর্তার কাছে ছুটবে তখন।

গোপাল রাগারগি করিল,-শশীর সঙ্গে তার কলহ হইয়া গেল। চেঁচামেচি করিয়া সে বলিতে লাগিল যে এমন কাণ্ড জীবনে সে কখনও দ্যাখে নাই। স্ত্রীকে মানুষ নিজের খুশিমতো অবস্থায় রাখিবে এই তো সংসারের নিয়ম। মারধোর করিলে বরং কথা ছিল। কিছুই তো নন্দ করে নাই। যা সে করিয়াছে বিন্দুর তাতে বরং খুশি হওয়াই উচিত ছিল। যদি নিজের একটা খাপছাড়া খেয়াল মিটাইতে চায়, স্ত্রীর সেটা ভাগ্যই বলিতে হইবে। স্বামীর সে অধিকার থাকিবে বইকী! মদ খায় নন্দ? সংসারে কোন বড়লোকটা নেশা করে না শুনি? তখন বলিলেই হইত, অত অষ্টে বড়লোক জামাই যোগাড় না করিয়া একটা হা-ঘরের হাতে মেয়েকে সঁপিয়া দিত গোপাল,—টের পাইত মজাটা!

কেন ওকে তুই নিয়ে এলি শশী! তোর কর্তালি করা কেন। ছেলেখেলা নাকি এসব, অ্যাঁ? রেখে আয় গে,-আজকেই চলে যা।

তা হয় না বাবা। আপনি সব জানেন না,-জানলে বুঝতেন ওখানে বিন্দু থাকতে পারে না।

এতকাল ছিল কী করে?

সেকথা ভাবিলে শশীও কি কম আশ্চর্য হইয়া যায়!

গোপাল মেয়েকে জিজ্ঞাসা করে, গয়নাগাটি জিনিসপত্র কী করে এলি?

আনিনি বাবা।

কেন, আনোনি কেন?

আমার কী ছিল যে আনব? আনলে চোর বলে জেলে দিত।

শুনিয়া গোপাল রাগিয়া ওঠে।-জেলে দিত! গোপাল দাসের মেয়েকে অত সহজে কেউ জেলে দিতে পারে না। তোরা সবকটা ছেলেমানুষ, কাঁচা বুদ্ধি তোদের। তোরা ঢের কষ্ট পাবি, এই আমি বলে রাখলাম।

গোলমাল করার ফল হইল এই, শশীর সঙ্গে গোপালের আবার কথা বন্ধ হইয়া গেল। ছেলের সঙ্গে এরকম মনান্তর গোপালের বাৎসল্যেরও জগতে মস্বত্তরের সমান, বড় কষ্ট হয়। দিন যায়, কলহ মেটে না। গোপাল উশখুশ করে। ছেলে যেন আকাশের দেবতা হইয়া উঠিয়াছে,-নাগাল পাওয়া কঠিন। শেষে গোপাল নিজেই একদিন মরিয়া হইয়া শশীর ঘরে যায়। শশী মোটা ডাক্তারি বইটা নামাইয়া রাখিলে সেটা সে টানিয়া লয়, পাতা উলটায়, আর ছেলের এত মোটা বই পড়িবার অমানুষি প্রতিভায় সুস্পষ্ট গর্ববোধ করে। বলে, যতক্ষণ বাড়িতে থাকো বই পড়ে সময় কাটাও, শরীর তোমার খারাপ হয়ে যাচ্ছে শশী। এত পড়ো কেন, পরীক্ষা তো নেই? আগে তো এরকম পড়তে না দিনরাত?

ডাক্তারের সর্বদা নতুন বিষয় জানতে হয়।-শশী বলে।

যা তুমি জানো শশী, গাঁয়ে ডাক্তারি করার পক্ষে তাই ঢের।

শহরে গিয়ে যদি বসি কখনও—

কী বিচিত্র চক্র কথোপকথনের বিন্দুর কথা আলোচনা করিতে আসিয়া কী কথা উঠিয়া পড়িল দ্যাখো। শহর? শহরে গিয়া ডাক্তারি করার মতলব আছে নাকি শশীর? তাই এত পড়াশোনা? গোপাল বিবর্ণ হইয়া যায়। এই গ্রামে একদিন কুঁড়েঘরে গোপালের জন্ম হইয়ছিল এইখানে একদিন সে ছিল পরের দুয়ারে অন্নের কাঙাল। আজ সে এখানে দালান দিয়াছে; একবেলায় তার দাওয়ায় পাত পড়ে ত্রিশখানা। চারিদিকে ছড়ানো টাকা, ছড়ানো জমি-জায়গা। ঘরে-বাইরে এখানে তাহার আদর্শ বাঙালি জীবনের বিস্তার। এইখানে মরিতে হইবে তাহাকে। শশী এখানে থাকিবে না, অনুসরণ করবে না তার পদাঙ্ক? গোপল ব্যাকুল হইয়া বলে, ওসব সর্বনেশে কথা মনে এনো না শশী।

শশী বলে, সময় সময় মনে হয় শহরে বসলে পয়সা বেশি হত–

ছাই হত! শহরে ঢের বড় বড় ডাক্তার আছে,-তুমি সেখানে পাত্তাও পাবে না শশী। এখানে মন্দ কী হচ্ছে তোমার? তা ছাড়া, ডাক্তারিতে পয়সা না এলেও তোমার চলবে। জমিজমা দেখবে, সুদ গুনে নেবে। ডাক্তারিতে কিছু হয় ভালো, নাহয় না-ই হবে। গায়ে আর ডাক্তার নেই, অচিকিচ্ছেয় মরে গায়ের লোক, সেটাও তো দেখতে হবে?–বড় তুই স্বার্থপর শশী।

গোপাল পালায়। কী বলিতে কী বলিয়া ফেলিবে, আবার হয়তো পনেরো দিন কথা বন্ধ থাকিবে ছেলের সঙ্গে। খানিক পরে গোপাল আবার শশীর ঘরে ফিরিয়া যায়। বলে, চাবিটা ফেলে গেলাম নাকি রে?

শশী বলে, চাবি? ওই যে আপনার পকেটে চাবি?

চাবির ভারে কর্তার পকেটটা বুলিয়াই আছে বটে। গোপাল অপ্রতিভ হইয়া যায়। পদে পদে জব্দ করে, কী ছেলে। খানিক সে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। তারপর করে কি, হঠাৎ অন্তরঙ্গভাবে জিজ্ঞাসা করে, হ্যা রে শশী, গাঁয়ে তোর মন টিকছে না কেন বল তো, গাঁয়ের ছেলে তুই?

মন টিকবে না কেন?

তবে যে শহরে যাবার কথা বলছিস?

ঠিক করিনি কিছু। কথাটা মনে হয় এই মাত্র।

শশীর শান্ত ভাব দেখিয়া নিজের উত্তেজনায় আর এক দফা অপ্রতিভ হয় গোপাল। ছেলে বড় হইয়া কী কঠিন হইয়া দাঁড়ায় তার সঙ্গে মেশা। সে বন্ধু নয়, খাতক নয়, উপরওয়ালা নয়, কী যে সম্পর্ক দাঁড়ায় বয়স্ক ছেলের সঙ্গে মানুষের, ভগবান জানেন।

একদিন নন্দর একখানা পত্র আসিল বিন্দুর নামে। লিখিয়াছে চিঠি পাওয়ার তিনদিনের মধ্যে ফিরিয়া গেলে এবারের মতো ক্ষমা করিবে। শশী আগুন হইয়া বলিল, ক্ষমাঃ তাকে কে ক্ষমা করে ঠিক নেই, কোন সাহসে ক্ষমার কথা লেখে? তুই যেন ভদ্রতা করে চিঠির জবাব দিতে বসিস না বিন্দু।

জবাব দেব না?

শশী অবাক হইয়া বলিল, জবাব দেয়ার ইচ্ছে আছে নাকি তোর? সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে এলি, চিঠির জবাব দিবি কীরকম?

বিন্দু বলিল, দেব না দাদা।-দেব কি না জিজ্ঞেস করলাম।

এও জিজ্ঞেস করতে হয়?

বিন্দু ম্লানভাবে হাসিল, মনটা বড় নরম হয়ে গেছে দাদা—একেবারে সাহস নেই। নিজে নিজে কিছু ঠিক করতে পারি না। নইলে দাখো না, আগে কি পালিয়ে আসতে পারতাম না আমি?

একখানা চিঠি লিখিয়া নন্দ আর সাড়াশব্দ দিল না। শীতের দিনগুলি তাড়াতাড়ি কাটিয়া যাইতে লাগিল। কুসুমের সঙ্গে শশীর কদাচিৎ দেখা হয়। দেখা করিবার জন্য কোনো পক্ষেই যেন তাড়া নাই। তা ছাড়া শশী বড় ব্যস্ত। শীতকালে গ্রামে অসুখবিসুখ কিছু কম থাকে বটে, সে শুধু অন্য সময়ের তুলনায় কিছুদিন আগে বাজিতপুরের হাসপাতালের ডাক্তারের সঙ্গে মুখচেনা ছিল শশীর। তাকে সে বলিয়া আসিয়াছিল, হাসপাতালে কোনো অসাধারণ রোগী আসিলে শশীকে তিনি যেন একটা খবর দেন,– শুধু বই পড়িয়া শেখা যায় না। মাঝে মাঝে শশী বাজিতপুরে যায়। বড় রকমের অপারেশন দেখিবার সুযোগ থাকিলে নিজের রোগীদের কথা ভুলিয়া দু-একদিন সেখানে থাকিয়া আসে।

কুসুম নালিশ করে না। কী যেন হইয়াছে কুসুমের। বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছে নালিশ করিতে। এমন অন্যমনস্কতা মাঝে মাঝে আসে বইকী মানুষের, অভ্যস্ত কাজের যাতে ভুল হইয়া যায়।

ফাল্গুনের গোড়ায় হঠাৎ একদিন কুমুদ আসিয়া হাজির।

কদিন থাকতে দিবি শশী?

যদ্দিন থাকবি,-শশী খুশি হয়, সত্যি থাকবি?

থাকব বলেই এলাম। ভালো লাগলে থাকব।

শশী হাসিল, ভালো লাগার মতো কীই-বা আছে গায়ে? ডোবা জঙ্গল আর মুখ্য মানুষ। ভালো না-লাগলেও থাকিস কুমুদ কিছুদিন। সঙ্গীর অভাবে বড় চিন্তাশীল হয়ে উঠেছি।

কুমুদ বলিল, সঙ্গীর অভাব? বিয়ে কর না?

শশীর হাসি দেখিয়া কুমুদ গম্ভীর হইয়া বলিল, ঠাট্টা করছি না শশী, সত্যি তোর বিয়ে দরকার। শান্ত হিসেবি সাধারণ সংসারী মানুষ তুই। সাধারণ মানুষের জীবন যেমন হয় তোরও তেমনি হওয়া দরকার। অন্যরকম করে বাঁচতে গেলে তুই সুখী হতে পারবি না।

শশী বলিল, তুই তো এরকম ছিলি না কুমুদ, এসব কী পরামর্শ দিচ্ছিস?—আমার ঘরে থাকবি, না, একটা ভিন্ন ঘরের ব্যবস্থা করে দেব তোকে? কুমুদ বলিল, ভিন্ন ঘরে হলে মন্দ নয় না শশী—দু-চার ঘণ্টা একা না থাকতে পারলে কি চলে?

কবিতা লিখিস, অ্যাঁ?

না ঠিক মতো বাঁচতেই জানি না, কবিতা লিখব। লিখতে লজ্জা করে।

কুমুদ লজ্জায় কবিতা লেখে না, এটা আশ্চর্য মনে হয়। জীবনে সে কী চায়, আজও কি কুমুদ তাহা বুঝিতে পারে নাই? জীবনকে লইয়া আজও সে পরীক্ষা করিয়া চলিতেছে? কোন সাগরে মুক্তা আহরণ করিবে তারই আম্বেষণে সাতসাগরে বাসিয়া বেড়াইতেছে? এর চেয়ে বিস্ময়কর কিছু নাই যে শান্ত আর বন্য কোনো মানুষই জীবনের রহস্য ভেদ করিয়া সেই চিরন্তন স্থিতির খোঁজ পায় না, যা অপরিবর্তনীয় হইলেও চলে, যেখানে অভিনবত্ব কাম্য নয় মানুষের। শশীর মতো জীবনকে কুমুদ আজ মন্থর করিতে চায়; আর শশী প্রার্থনা করে কুমুদের অতীত দিনের উত্তপ্ত উচ্ছল জীবনের আবর্ত সুখ যে তাতে বিশেষ হইবে না তা জানে শশী। তবু মনে কেমন করে!

কুমুদ যে কেন গাওদিয়ায় আসিয়াছে শশী ঠিক তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। কতদিন থাকিবে তাই বা কে জানে। জিজ্ঞাসা করিলে কুমুদ সেই একই জবাব দেয়। যত দিন থাকতে দিবি। একথার কোনো মানে হয় না। সে যদি ছ মাস একবছরও এখানে থাকিয়া যায়, শশী কি তাহাকে বলিবে যে এবার তুমি বিদেয় হও?

কুমুদের মধ্যে একটা নূতন পরিবর্তন এবার শশীর চোখে ধরা পড়িতেছিল। সেবার তাহার মুখে চোখে কথায় ব্যবহারে যাত্রার দলে অধঃপতনের পরিচয় ছিল স্পষ্ট, এবার সে যেন বহুদিন আগেকার মতো কবি ও ভাবুক হইয়া উঠিয়াছে। কেবল পুরানো দিনের মতো এবার আর তাহার বিদ্রোহী উদ্ধত ভাব নাই। কী যেন সে ভাবে, কী এক রসালো ভাবনা, চোখের দৃষ্টি তাহার হইয়া আসে উৎসুক এবং একান্ত বেমানানভাবে সেইসঙ্গে মুখে ফুটিয়া থাকে গভীর সন্তোষ। তা ছাড়া, গাওদিয়ার মাঠে ঘুরিয়া বেড়ানোর মধ্যে কী রস সে আবিষ্কার করিয়াছে সে-ই জানে—সময় নাই অসময় নাই, কোথায় যেন চলিয়া যায়।

একদিন শশী জিজ্ঞাসা করিল, বিনোদিনী অপেরার কী হল রে কুমুদ?

কুমুদ বলিল, ও দলটা ছেড়ে দিয়েছি। বৈশাখ মাসে সরস্বতী অপেরা বলে আর একটা দলে ঢুকব,-কথাবার্তা সব ঠিক হয়ে আছে। এরা মাইনে অনেক বেশি দেবে। এখনি যোগ

দেবার জন্য ঝুলোবুলি করছিল, কিন্তু পার্ট বলে বলে কেমন বিরক্তি জন্মে গেছে ভাই, তাই ভাবলাম কটা মাস একটু বিশ্রাম করে নিই।

কে জানে একথা সত্য কি মিথ্যা। শশীর মনে একটা সন্দেহ উকি দিয়া যায়। সে ভাবে যে হয়তো বিনোদিনী অপেরা হইতে কুমুদকে বিদায় করিয়া দিয়াছে, কোথাও কিছু সুবিধা করিতে না পারিয়া সে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে এখানে- সরস্বতী অপেরার কথাটার বানানো। টাকাকড়ি কিছুই হয়তো কুমুদের নাই।

একদিন শশী বলল, আমায় গোটা পনেরো টাকা দিবি কুমুদ? হাতে নগদ টাকা নেই, একজনকে দিতে হবে।

কুমুদ তাহার সুটকেস খুলিল, একোণ ওকোণ হাতড়াইয়া বলিল, আমার মানিব্যাগ?

কুমুদ ভাবিল, হুঁ, এবার মানিব্যাগ তোমার চুরি যাবে! ছি কুমুদ, আমার সঙ্গেও শেষে তুই ছলনা আরম্ভ করলি!

কিন্তু না ব্যাগ আছে। আমাকাপড় নামাইয়া খুঁজিতেই ব্যাগটা বহির হইয়া পড়িল। কুমুদ বলিল, তোর কাছে রাখতে দেব ভেবে একেবারে ভুলে গিয়েছি ভাই, চুরি গেলেই হয়েছিল আর কি! যা দরকার নিয়ে রেখে দে ব্যাগটা তোর কাছে।

ব্যাগটা হাতে করিতে শশী লজ্জা বোধ করিল।

কত আছে?

কে জানে কত আছে। গুনে দ্যাখ।

তারপর একদিন পুকুর-ডোবা-জঙ্গলভরা গাওদিয়া গ্রামে কুমুদের আত্মনির্বাসনের কারণটা জানা গেল।

শশী বিবর্ণ হইয়া বলিল, তুই কী বলছিস কুমুদ, মতিকে বিয়ে করবি? ওইটুকু মেয়ে।

কুমুদ বলিল, বিশেষ ছোট নয়। তা ছাড়া, ছোটই ভালো। বিয়েই যদি করব, ধাড়ি মেয়ে বিয়ে করব কোন দুঃখে?

শশীর রাগ হইতেছিল। কেমন একটা জ্বালাও সে বোধ করিতেছিল, বলিল, তুই তবে এইজন্য এসেছিলি কুমুদ, বন্ধুর বাড়ি, বিশ্রামের ছল করে?

কুমুদ বিস্মিত হইয়া বলিল, বিচলিত হইয়া পড়লি যে শশী? খুব কী একটা অন্যায় কাজ করতে বসেছি আমি? ছন্নছাড়ার মত ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছিলাম,-বিয়ে করে সংসারী হব, এতে তোর খুশি হওয়াই তো উচিত।

বাংলাদেশে তাই আর মেয়ে পেলি না?

কেন, মতি কী দোষ করেছে?

ওইটুকু একটা মুখ্য গেঁয়ো মেয়ে।

কুমুদ একটু হাসিল, তুই যে কার দিকে টানছিস বুঝে উঠতে পারছি না শশী। মতি মুখ্য গেঁয়ো মেয়ে বটে, আমিও তো যাত্রাদলের সঙ!

কুমুদের হাসি দেখিয়া শশী আরও রাগিয়া গেল। এ জগতে কিছুই যেন কুমুদের কাছে গুরুতর নয়, যখন যা খেয়াল জাগে খেলার ছলেই যেন তা করিয়া ফেলা যায়, জীবনে যেন মানুষের নিয়ম নাই, বাঁচিবার রীতি নাই। মনের রাগ চাপিয়া বিচারকদের রায় দেওয়ার ভঙ্গিতে শশী বলিল, এসব দুর্বদ্ধি ছেড়ে দে কুমুদ, যাত্রাদলের সং সেজে থাকতে তোকে কে বলেছে? সরস্বতী অপেরায় ঢুকে আর কাজ নেই, ফিরে যা তোর কাকার কাছে। কাকার তোর অত বড় মাইকার কারবার, একটা ভালোরকম কাজ তোকে তিনি দিতে পারবেন না? তখন সমান ঘরের কতো ভালো ভালো মেয়ে পাবি, তোর উপযুক্ত সঙ্গিনী

হতে পারবে। খেয়ালের বশে একটা গেঁয়ো মেয়েকে বিয়ে করে কেন জ্বলে মরবি আজীবন?

কুমুদ বলিল, কাকার দুটো গ্রেট ডেন কুকুর আছে জানিস?

শশী অবাক হইয়া বলিল, না।

কাকার বাড়ির গেটের ভেতর ঢুকলে কুকুর দুটো তিনি লেলিয়ে দেবেন।

কথাটা হইতেছিল শশীর ঘরে,–সন্ধ্যার পর। ঘরে সাত টাকা দামের একটা টেবিল ল্যাম্প জ্বলিতেছিল। এত আলোতে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিতে তাদের যেন কষ্ট হইতে লাগিল। রাগ শশীর মনে বেশিক্ষণ টেকে না। খানিক চুপ করিয়া থাকিয়া সে বলিল, মতিকে তোর ভালো লাগল কুমুদ বিশ্বাস হতে চায় না।

প্রথমে আমারও হয়নি। সেবার যখন চলে গেলাম, কে জানত ওর জন্যে আবার ফিরে আসতে হবে!

তারপর কুমুদ তালপুকুরের পাড়ে অবোধ গ্রাম্য বালিকার সঙ্গে তার ভালোবাসার জন্ম-ইতিহাস ধীরে ধীরে শশীকে শুনাইয়া দিল। এতটুকু মেয়ে মতি, তার যে এমন একটা মন থাকিতে পারে যাহাতে অতল স্নেহের সঞ্চার সম্ভব তা কি কুমুদ জানিত? সরল মনের স্নেহ ছাড়া আর সবই যে ফাকি মানুষের জীবনে, মতি কুমুদকে এ শিক্ষা দিয়াছে। সত্য কথা বলিতে কি, এ অপূর্ব অভিজ্ঞতা কুমুদ তো কোনোদিন কল্পনাও করে নাই। শুনিতে শুনিতে শশীর বিস্ময়ের সীমা থাকে না। মতি? ওই একরত্তি নোংরা মেয়েটা গোপনে গোপনে এত ভালোবাসিয়াছে কুমুদকে? শশীর মনে হয় সব কুমুদের বানানো,-দিবাস্বপ্ন, কল্পনা মুখে মুখে গীতগোবিন্দের মতো যে মহাকাব্য কুমুদ রচনা করিয়া চলিয়াছে, মতি কি কখনও তার নায়িকা হইতে পারে?

সেদিন অনেক রাত্রি অবধি শশী ঘুমাইতে পারিল না। কুমুদের সঙ্গে মতির বিবাহ? কেমন করিয়া ইহা ঘটিতে দেওয়া যায়। চিরদিন কুমুদ ছন্নছাড়া যাযাবরের জীবন যাপন করিয়াছে, সাময়িক একটা নীড় প্রেম তার মধ্যে দেখা দিলেও এটা যে স্থায়ী হইবে বিশ্বাস করা কঠিন। তা ছাড়া মতির মূর্খতা এবং গ্রাম্যতা অসহ্য হইয়া উঠিতে কুমুদের বোধ হয় ছমাস সময়ও লাগিবে না। কী উপায় হইবে মতির তখন? কুমুদ কষ্ট দিলে, ত্যাগ করিলে, নিরীহ বোকা মেয়েটার জীবন যে দুঃখে ভরিয়া উঠিবে কে তার দায়িত্ব গ্রহণ করিবে? একদা-প্রিয় বস্তুগুলি জীবন হইতে ছাঁটিয়া ফেলাই যে স্বভাব কুমুদের।

পরদিন কুমুদকে সে এ-বিষয়ে প্রশ্ন করিল। বলিল, মতিকে তোর বেশিদিন ভালো লাগবে কেন কুমুদ?

মতিকে আমার চিরদিন ভালো লাগবে।

কী করে লাগবে তাই ভাবছি।

কুমুদ বলিল, শশী, তুই কি ভাবিস বিয়ের পরেও মতি এমনি থাকবে? ওকে আমি মনের মতো করে গড়ে তুলব না? খনি থেকে তোলা হীরের মতো ওকে আমি গ্রহণ করছি,-নিজে কটিব, ঘষব, মাজব, উজ্জ্বল করে তুলব। ওর মনের কোনো গড়ন নেই, তাই ওকে বিয়ে করতে আমার এত আগ্রহ। ওর মনকে আমি গড়ে নেব। আমার সঙ্গিনী হতে পারে, এমন মেয়ে জগতে নেই ভাই-সঙ্গিনী আমার সৃষ্টি করে নিতে হবে আমাকেই।

শশীর অর্ধেক মন সংসারী, হিসাবী, সতর্ক-এসব বড় বড় কথা শুনিলে তার বিরক্তি জন্মে। মনের মতো গড়িয়া তুলিতে গেলে মানুষ যে মনের মতো হয় না, এটুকু জ্ঞান কি কুমুদের নাই? পরের চেষ্টায় মনের যে বিকাশ তাহা অস্বাভাবিক, অপ্রীতিকর। মতিকে ছাঁচে ঢালিয়া একটা সৃষ্টিছাড়া অদ্ভুত জীবে পরিণত করিবার ধৈর্য কুমুদের থাকিবে কিনা সন্দেহ-থাকিলেও, সেই পরিবর্তিত মতিকে কি তাহার ভালো লাগিবে? কীভাবেই বা মতিকে সে গড়িয়া তুলিবে? লেখাপড়া গানবাজনা ছবি-আকা-শুধু এইসব শিক্ষা তাকে দেওয়া সম্ভব। তার অতিরিক্ত আর কী করিতে পারবে কুমুদ? মতির নিজস্ব সত্তাটুকু পর্যন্ত কুমুদ যদি

তাকে দান করে, স্বতন্ত্র সম্পূর্ণ মানুষ হিসাবে কী মূল্য থাকিবে মতির? কুমুদ এত জানে, এটুকু জানে না যে প্রিয়াকে মানুষ গড়িয়া লইতে পারে না। মেয়ের মতো যাকে শিখাইয়া পড়াইয়া মানুষ করা যায় তাকে বসানো চলে না প্রিয়ার আসনে?

ভাবিয়া শশী কিছু ঠিক করিতে পারে না। একসময় সে খেয়াল করিয়া অবাক হয় যে মতির সঙ্গে কুমুদের ভালোবাসার খেলাটা তাহার বিশেষ খাপছাড়া মনে হইতেছে নাওদের বিবাহের কথাটাই তার কাছে সৃষ্টিছাড়া কাণ্ডের মতো ঠেকিতেছে। মতিকে নষ্ট করিয়া কুমুদ যদি চলিয়া যাইত, শশীর দুঃখের সীমা থাকিত না, তবু যেন মনে হইত অস্বাভাবিক কিছু ঘটে নাই, দুইজনের মধ্যে যে দুস্তর পার্থক্য তাহদের তাহাতে দুদিনের নিন্দনীয় ঘনিষ্ঠতা ছাড়া আর কী সম্পর্ক তাহাদের মধ্যে হওয়া সম্ভব? ওদের বিবাহ অবাস্তব, অর্থহীন।

এ চিন্তায় শশী লজ্জা পায়। মতির জন্য তার মনে বাৎসল্য-মেশানো একপ্রকার আশ্চর্য মমতা আছে, মতিকে কুমুদের বউ হওয়ার অনুপযুক্ত মনে করিতে তাহার কষ্ট হয়। সেদিন বিকালে মতির সঙ্গে শশীর দেখা হইল। মতি একডালা কুমড়াফুল লইয়া তাহাদেরই বাড়ি আসিয়াছিল। শশীকে যে কথাটা জানানো হইয়াছে, কুমুদ হয়তো মতিকে এ সংবাদ দিয়াছিল। শশীকে দেখিয়া মুখখানা তার রাঙা হইয়া উঠিল। তারপর একটু হাসিল মতি,–হঠাৎ লজ্জা পাইলে এ বয়সে ঠোঁটে একটু হাসির ঝিলিক দিয়া যায়। মতির মুখখানা আজ শশীর অসাধারণ সুন্দর মনে হল। সে ভাবিল, হয়তো কুমুদ ভুল করে নাই। হয়তো সত্যই একদিন সে মতিকে রূপে-গুণে অতুলনীয়া করিয়া তুলিবে।

মতি চলিয়া গেলে কুমুদের এই শক্তিতে কিন্তু শশীর আর বিশ্বাস রহিল না। খনিগর্তেও হীরার মতোই বটে মতি, তাকে একদিন অনুপমা ও জ্যোতির্ময়ী করিয়া তোলাও সম্ভব, কিন্তু কুমুদ তাহা পরিবে না। ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিবার প্রতিভা আছে কুমুদের, স্বপ্নকে সফল করিবার তপস্যা নাই। মতির মুখের পেলব ত্বকে দুদিনে সে দুঃখের রেখা আনিয়া দিবে।

মনটা শশীর খারাপ হইয়া থাকে। কুমুদের প্রতি সে বিতৃষ্ণা বোধ করে সীমাহীন। এ কি বন্ধুর কাজ বন্ধুর বাড়ি আসিয়া তাহার মেহের পাত্রীর সঙ্গে গোপনে ভালোবাসার খেলা করা? উপায় থাকিলে কুমুদকে সে তাড়াইয়া দিত। কিন্তু কুমুদের কথা শুনিয়া আর তো মনে হয় না মতির কোনোদিকে আশা-ভরসা আছে। কুমুদের সম্বন্ধে মতির উৎসুক প্রশ্ন, কুমুদকে দেখিবার আশায় মতির কলিকাতা যাওয়ার আগ্রহ, সব এখন শশীর মনে পড়িতে থাকে। প্রেম? কুমুদের জন্য এতখানি প্রেম জাগিয়াছে মতির বুকে? তা ছাড়া, হয়তো মতির বুকভরা প্রেমই শুধু নয়-কুমুদকে বিশ্বাস নাই, জীবনটা কুমুদের আগাগোড়া অসঙ্গতিতে পরিপূর্ণ।

কী করিবে শশী ভাবিয়া পায় না। এ ব্যাপারেও তার সিদ্ধান্তই চরম। সে যদি বলে হোক, তবেই এ বিবাহ হইবে-পরাণের কাছে কথাও পাড়িতে হইবে তাহাকেই। শশীর ইচ্ছা হয়, যাই ঘটিয়া থাক-কুমুদকে সে এইদণ্ডে দূর করিয়া দেয়। চিরদিনের জন্য বন্ধুত্বের অবসান হোক, কুমুদ চলিয়া যাক তাহার যাযাবর জীবন যাপনে– গায়ের মেয়ে মতি থাকে গাঁয়ে। চিরকাল মতি দুঃখ পাইবে জানিয়াও এ বিবাহ সে ঘটিতে দিবে কেমন করিয়া।

সন্ধ্যার পর কুসুমের সঙ্গে শশী এ বিষয়ে পরমাশ করার সুযোগ পাইল। আকাশে তখন চাঁদউঠিয়াছিল। ঘরের চালা যে জ্যোৎস্নার ছায়া ফেলিয়াছিল সে ছায়ায় দাঁড়াইয়া অনেক কথা বলিবার পর শশী বলিল, একটা উপায় আছে বউ।

কী উপায়? কুসুম জিজ্ঞাসা করিল।

আমি মতিকে বিয়ে করতে পারি।

এই উপায়! কুসুম হাসিয়া ফেলিল।

শশী কিন্তু হাসিল না, বলিল, হাসির কথা নয় বউ। কুমুদের হাতে ওকে সপে দিতে সত্যি আমার ভাবনা হচ্ছে।

কুসুম গম্ভীর হইয়া বলিল, সে আপনি ওকে ছোটবোনটির মতো ভালোবাসেন বলে। মেয়ে, বোন–এদের বিয়ে দেবার সময় মানুষের এরকম ভাবনা হয়।

শশী তবু বলিল, আমি যদি মতিকে বিয়ে করি–

যদি করেন! যদি! তীব্র চাপা গলায় এই কথা বলিয়া কুসুম পরক্ষণেই আবার হাসিয়া ফেলিল, সংসারে অত যদি চলে না ছোটোবাবু। আপনি করবেন মতিকে বিয়ে! জীবনটা আপনার নষ্ট হয়ে যাবে না?

তখন শশী বলিল, কুমুদ অবশ্য একেবারে অমানুষ নয়, রোজগার-পাতিও মন্দ করে না-

কুসুম বলিল, মতির ভাগ্যি ওকে কুমুদবাবুর পছন্দ হয়েছে। পড়ত গিয়ে কোনো চাষার ঘরে,–দুবেলা চেলাকাঠের মার খেয়ে প্রাণটা ছুঁড়ির বেরিয়ে যেত। অনেক পুণ্যতে এমন বর জুটেছে ওর।

হোক হবে, তাই হোক মতি কী বলে বউ?

কী বলবে? দিন গুনছে।

দিন গুনিতেছে মতি? গুনুক!

কুসুমের উপর রাগে শশীর মন জ্বালা করিতে থাকে। সেদিন প্রত্যুষে তালবনে কুসুমের মধ্যে যে সরলা বালিকাকে আবিষ্কার করিয়া সে পুলকিত হইয়াছিল, আজ সে কোথায় গেল? কী পাকা বুদ্ধি কুসুমের কী নিখুঁত কৌশলে মতির বিবাহ সম্বন্ধে সে তার মনের মোড় ঘুরাইয়া দিল। দুদিন ভাবিয়া সে যা স্থির করিতে পারে নাই, আধঘণ্টার মধ্যে দুটো আচল যুক্তি দেখাইয়া কুসুম কত সহজে সব সমস্যার মীমাংসা করিয়া দিল। কুসুমের কাছে দাঁড়াইয়া মতির ভালোমন্দ সম্বন্ধে এমন সে নির্বিকার হইয়া উঠিল কিসে যে অনায়াসে বলিয়া বসিল, হোক তবে, তাই হোক? তাছাড়া, এসব আজ কী বলিতেছে কুসুম?

এমনি চাঁদনি রাতে আপনার সঙ্গে কোথাও চলে যেতে সাধ হয় ছোটোবাবু।

গভীর দুঃখের সঙ্গে শশীর মনে হয়, একথা কুসুমের বানানো। মতিকে পাছে সে আবার নিজে বিবাহ করিয়া কুমুদের হাত হইতে বাঁচাইতে চায়, তাই কুসুম এই মনরাখা বলিয়াছে। বলুক। সে তো কুমুদ নয়, তার জীবনে সবই অভিনয়। তবু, চাঁদের আলোয় চারিদিক আজ কেমন স্বপ্ন দেখিতেছে দ্যাখো। এ যেন বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় ন কুসুমের কুটিলতার বিষে এমনি সময় এত কষ্ট পাওয়া তাহার ভাগে ছিল। কিন্তু কেন সে দাঁড়াইয়া আছে, কেন সে চলিয়া যাইতে পারে না? কে জানে, হয়তো জীবনের বিতৃষ্ণা ও আত্মপ্লানি-ভরা মুহূর্তগুলির আকর্ষণ তার কাছেই এত তীব্র? কুমুদ হয়তো ছুটিয়া পলাইত, বলিয়া যাইত, তুমি গোল্লায় যাও কুসুম। অথবা হয়তো নিজের আনন্দ দিয়া, এই জ্যোৎস্নার কবিতাটুকু ছাঁকিয়া লইয়া এমনি স্থূল মুহূর্তগুলিকে অপূর্ব করিয়া তুলিত?

কুসুম নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, আপনার কাছে দাঁড়ালে আমার শরীর এমন করে কেন ছোটোবাবু?

শরীর! শরীর! তোমার মন নাই কুসুম?

৭. মতিকে লইয়া কুমুদ চলিয়া গিয়াছ

বিবাহের পর মতিকে লইয়া কুমুদ চলিয়া গিয়াছ।

কোথায়! হনিমুনে! গাওদিয়ার গেঁয়ো মেয়ে মতি, তাকে লইয়া কুমুদ চলিল হনিমুনে। কিছু টাকা দে শশী।

পরাণের কাছে এ ব্যাপারটা বড় দুর্বোধ্য ঠেকিয়াছে। কনে-বউকে সঙ্গে লইয়া অনির্দিষ্ট ভ্রমণে বাহির হওয়া? এ কোনদেশী রীতি মতিকে লইয়া গিয়া উঠিতে পারে এমন আত্মীয়স্বজন কুমুদের কেহ নাই পরাণ তাহা জানিত। সে আশা করিয়াছিল কুমুদ এখন সস্ত্রীক কিছুদিন শশীর বাড়িতেই বাস করিবে। তারপর মতির রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করিয়া সংসার পাতিয়া বসিবে শহরে অথবা গ্রামে। রাতারাতি বোনটাকে লইয়া কোথায় উধাও হইয়া গেল কুমুদ?

এ বিবাহে পরাণের আনন্দ হয় নাই, শুধু শশীর মুখ চাহিয়া সে সম্মতি দিয়াছিল। হোক সে গরিব গ্রাম্য গৃহস্থ, মতির সে বড়ভাই, কুমুদের গুরুজন,-কিন্তু আগাগোড়া কী উদ্ধত অপমানজনক ব্যবহার কুমুদ তার সঙ্গে করিয়া গিয়াছে! শশীও এটা লক্ষ করিয়াছিল। রাগ তাহার কম হয় নাই। মতিকে যদি কুমুদ বিবাহ করিতে পারে, মতির দাদাকে সম্মান করিতে পারবে না? কিন্তু মুখে সে কিছুই বলে নাই কুমুদকে। শুধু তার সামনে পরাণের সঙ্গে করিয়াছিল প্রীতি ও শ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যবহার,-কুমুদ যাতে দেখিয়া শিখিতে পারে। শশীর এ চেষ্টার বিশেষ কিছু ফল হয় নাই। মতির আত্মীয়-পরিজনের প্রতি অসীম অবজ্ঞা দেখাইয়া মতিকে কুমুদ গ্রহণ করিয়াছিল।

মাঠে পরাণের খেজুররস জ্বাল হইতেছে। দুপুরে ছাড়া শশীর সময় হয় না বলিয়া পরাণ দেড় মাইল পথ হাটিয়া আসিয়া কাজের ক্ষতি করিয়া শশীর কাছে বসিয়া থাকে। চওড়া সবল কাঁধদুটি যেন তাহার শ্রান্তিতে ঢালু হইয়া আসে। বলে পত্র দেয় না কেন ছোটোবাবু?

শশী অপরাধীর মতো বলে, কী জানো পরাণ, চিঠিপত্র লেখা কুমুদের অভ্যাস নেই। কলেজে পড়বার সময় ওর বাবা হোস্টেলের সুপারিন্টেন্ডেন্টকে লিখে ওর খবর নিতেন।

তাই বলে একবারটি জানাবে না কোথায় গেল, কোথায় উঠল, কী বিত্তান্ত? মা ইদিকে কাঁদাকাটা জুড়েছে।

কুমুদকে মনে মনে অভিশাপ দিয়া শশী বলে, আসবে পরাণ, পত্র আসবে। খবর না দিয়া পারে? আজ হোক কাল হোক খবর একটা দেবেই।

পরাণ কেমন একপ্রকার স্তিমিত বিষন্ন দৃষ্টিতে শশীর দিকে চাহিয়া থাকে। নীরবে সে যেন কিসের নালিশ জানায়, মূক প্রাণীর মতো। শশীর অস্বস্তির সীমা থাকে না। হারু ঘোষের পরিবারে ভালোমদের দায়িত্ব শশীকে কেহ দেয় নাই, তবু চিরদিন ওদের মঙ্গল করিতে চাহিয়াছে বলিয়া আপনা হইতে দায়িত্ব যেন তাহার জন্মিয়াছে। কিন্তু কী মঙ্গল সে করিতে পারিয়াছে ওদের? তার দোষ নাই, তবু তারই জন্য কুসুম যেন কেমন হইয়া গেল। একটা খাপছাড়া বিপজ্জনক বিবাহ হইল মতির হয়তো পরাণ আজ এসব হিসাব করিয়া দেখিতেছে, হয়তো তাদের অসমান বন্ধুত্বের ফলাফলে বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে পরাণ, ভীত হইয়া ভাবিতেছে ভালো করিতে চাহিয়া আরও না জানি কত মন্দ শশী তাদের করিবে!

শশী জানে মুখ ফুটিয়া পরাণ কোনো বিষয়ে তাহাকে দোষী করিরে না।- শুধু বিষন্ন চিন্তিত মুখে দুর্বোধ্য-রহস্য-দ্রষ্টা শিশুর মতো তার দিকে চাহিয়া থাকিবে। দীর্ঘদেহ নির্ভরশীল সরল লোকটির জন্য শশীর মন মমতায় ভরিয়া যায়। ভাবে যেমন করিয়াই হোক মতিকে সুখী করিতে কুমুদকে সে বাধ্য করবে। মতি বদলাক, মতিকে কুমুদ যেমন খুশি গড়িয়া তুলুক-তার মুখে চোখে উপচানো সুখের সঙ্গে পরাণের ঘটা চাই।

শুধু মতির জন্য নয়, নানা দিকে শশীর চিত্তা বাড়িয়াছে। তার মধ্যে বিন্দুর সম্বন্ধে চিন্তাটা গুরুতর। দিন দিন বিন্দু কেমন হইয়া যাইতেছে। ভুলিয়া থাকিতে পারবে বলিয়া প্রকান্ড সংসারটা চালানোর ভার শশী মাসি-পিসির কবল হইতে ছিনাইয়া বিন্দুর হাতে তুলিয়া

দিয়াছিল। বিন্দু জীবনে কখনও সংসার পরিচালনা করে নাই। সে কেন এ ভার বহন করিতে পরিবে? তা ছাড়া বিন্দুর ভালোও লাগে নাই। সব ভার সে আবার একে একে মাসি-পিসিকে ফিরাইয়া দিয়াছে। কাজ করিতে বিন্দুর আলস্য বোধ হয়। মানুষের সঙ্গ তাহার ভালো লাগে না। কথাবার্তা কারো সঙ্গেই সে বেশি বলে না, নিজের মনে চুপচাপ ঘরের কোণে বসিয়া থাকে। বসিয়া বসিয়া ঝিমায়। কত কাল অনবরত রাত জাগিয়া সে যেন নিদ্রাতুরা হইয়া আছে এমনিভাবে সর্বদা হাই তোলে অথচ ঘুমায় সে খুব কম। কিছু সে খাইতে চায় না, দিন দিন শুকাইয়া যাইতেছে। আধমরা মানুষের মতো শিথিল নিস্তেজ ভঙ্গিতে সে দীর্ঘ দিবারাত্রি যাপন করে।

শশী ডাক্তার মানুষ, বিন্দুকে নিজের ঘরে ডাকিয়া লইয়া সে জিভ দ্যাখে, হার্ট পরীক্ষা করে, শরীরের অবস্থা সম্বন্ধে জেরা করে। তারপর সন্দিগ্ধভাবে মাথা নাড়িয়া বলে, কিছু বুঝতে পারলাম না বাপু। গায়ের ডাক্তার, পেটে তো বিদ্যে নেই তেমন একটা ওষুধ দিচ্ছি, কদিন খা, তারপর আবার পরীক্ষা করে দেখব।

বিন্দু বলে, উঁহু, ওষুধ আমি খাব না!

শশী বলে, খাবি। মুখ দিয়ে না খাস, গা ফুঁড়ে দেব। বাপের বাড়ি এসে তুই যদি মরে যাস বিন্দু আমি থাকতে, আমার তাতে কী অপমান হবে বল দিকি?

বিন্দু কাঁদিয়া ফেলে। কাঁদিতে কাঁদিতেই বলে, কী করব দাদা, মনে বল পাই না, দিনরাত হুহু করে জ্বলে মনের মধ্যে।

শশী বলে, কাঁদিস না। আমার ওষুধ খেলেই মন ভালো হয়ে যাবে। বিন্দুর রোগ-নির্ণয় করা শশীর অসাধ্য মনে হয়। মনের মধ্যে দিনরাত হুহু করিয়া জ্বলে। কার জন্য জ্বলে, কেন? জীবনটা ব্যর্থ হইয়া গেল বলিয়া মানুষ কি শোকে এমন নির্জীব মৃতপ্রায় হইয়া যায়? নন্দর প্রতি তীব্র বিদ্বেষই তো বিন্দুকে দুদিন সুস্থ ও সবল করিয়া তোলার পক্ষে যথেষ্ট। বিদ্বেষ যদি নাও হয়, আকাশছোয়া অভিমান বিন্দুকে নবজীবন দিতেছে না কেন? নন্দ ক্ষমা করিবে এই আশায় অতগুলি বছর বিন্দু যে অবস্থায় কাটাইয়া আসিয়াছে

তাহাতে যদি আজ নন্দর জন্যই বিন্দুর মন হাহাকার করে, শশী তাহাতে বিস্মিত হইবে না। সংসারে এরকম অদ্ভুত মেয়ে দু-চারটা থাকে। কিন্তু নন্দর জন্য মন কেমন করিলে বিন্দুর তো উচিত অস্থির চঞ্চল হইয়া থাকা, কাজ ও অকাজের ভানে ছটফট করা। এমন সে অলস ও অবসন্ন হইয়া আসিবে কেন,–তৈলহীন প্রদীপের মতো কেন সে নিভিয়া যাইতে থাকিবে?

একদিন বিন্দু বলিল, দাদা আলমারির চাবি দাও। বই নেব।

শশী বলিল, বাঙলা বই বেশি তো নেই আলমারিতে। বই যদি পড়িস তো আনিয়ে দেব শহর থেকে।

আলমারিতে যা আছে তাই তো এখন পড়ি, শহর থেকে যখন আনিয়ে দেবে দিও!

শশী চাবির গোছাটা তাহার হাতে দিল। আলমারি খুলিয়া একখানা বই বাহির করিয়া আবার বিন্দু আলমারি বন্ধ করিল বটে, চাবি ফেরত দিল না। বলিল, চাবি আমার কাছে থাক। তুমি তো বেড়াও রোগী দেখে, আর একটা বই বার করতে হলে সারাদিন তোমার দেখাই পাব না।

শশী বলিল, গোছাসুদ্ধ রেখে কী করবি? বই-এর আলমারির চাবিটা খুলে নে।

বিন্দু বলিল, থাক না গোছাসুদ্ধই–ইচ্ছে হলে তোমার বাক্স-প্যাটরা ঘেঁটেও তো সময় কাটাতে পারব দু-দণ্ড? বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাব না আমি, চাবির দরকার হলে আমায় ডেকো।

এমন সহজভাবে সে কথাগুলি বলিল যে শশীর মনে কোনো সন্দেহই আসিল না। হয়তো অন্যমনস্ক ছিল বলিয়াও শশীর মনে পড়িল না ওষুধের আলমারিতে চার-পাঁচ শিশির গায়ে লাল অক্ষরে বিষ লেখা আছে। বিন্দুকে সে যে কতদিন উৎসুক লোভাতুর দৃষ্টিতে

ওষুধের আলমারির দিকে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়াছে খেয়াল করিলে তাও হয়তো শশীর মনে পড়িত।

সেদিন বিকেলে মাইল পাচেক দূরে একটা গ্রামে শশী রোগী দেখিতে গিয়াছিল। গ্রামে ফিরিতে রাত প্রায় নটা হইয়া গেল। বাড়ির সামনে পৌঁছিয়াই অন্দরে একটা গোলমাল শশীর কানে আসিল। বাহিরের ঘরগুলি অন্ধকার, জনপ্রাণী নাই। কেবল সিন্ধু এক অন্ধকারে দাঁড়াইয়া মৃদুস্বরে কাঁদিতেছে। শশী ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কী হয়েছে রে সিন্ধু?

সিন্ধু কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, মেজদি মরে যাচ্ছে দাদা।

ভিতরে যাইতে শশীর পা উঠিতেছিল না। বিন্দু মরিয়া যাইতেছে? কেন মরিয়া যাইতেছে? সিন্ধু গুছাইয়া তাকে কিছু বলিতে পারিল না। তবু ব্যাপারটা অনুমান করিতে শশীর দেরি হইল না। সন্ধ্যার সময় কী যেন বিন্দু খাইয়া ছিল, তাই এখন মরিয়া যাইতেছে। শশীর বুকের ভিতরটা হিম হইয়া গেল। ডাক্তার মানুষ সে, এরকম খবর পাইয়া জড়ভরতের মতো এখানে দাঁড়াইয়া থাকা উচিত নয়, এসব শশী বুঝিতে পারিতেছিল, তবু খানিকক্ষণ সে নড়িতে পারিল না। বিন্দু বিষ খাইয়াছে। মরিতে চায় বিন্দু? পলকের জন্য শশীর যেন মনে হয় বিন্দুর এ ইচ্ছা সফল হইতে দিলে মন্দ হয় না। আলমারিতে কী বিষ ছিল শশী জানে, সন্ধ্যার সময় বিন্দু যদি তাহ খাইয়া থাকে ওকে সে বঁাচাইতে পারবে। কিন্তু কী হইবে বাঁচাইয়া? বিন্দু ছেলেমানুষ নয়, জীবন সম্বন্ধে দু”প্রাপ্য অভিজ্ঞতা তাহার, ভাবিয়া চিন্তিয়া দুঃখের হাত এড়াইবার চরম পন্থাই সে যদি অবলম্বন করা ঠিক করিয়া থাকে, বাধা দেওয়া কি উচিত হইবে?

কপালের ঘাম মুছিয়া, বাহিরের বিস্তৃত অঙ্গন পার হইয়া কুন্দর ঘরের পাশ দিয়া শশী অন্দরের অঙ্গনে আসিয়া দাঁড়াইল। বিন্দু উঠানেই পড়িয়া আছে, নিজের বমির মধ্যে, বিস্রস্ত বসনে। বাড়ির সকলে এবং পাড়ার অনেকে চারিদিকে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

শশীকে দেখিয়া সকলে কলরব করিয়া উঠিল। মুখরা কুন্দ সকলের কণ্ঠ ছাপাইয়া বলিল, ও শশীদাদা, কী কাণ্ড করছে বিন্দুদিদি দেখুন।

মদের তীব্র গন্ধ শশীর নাকে লাগিতেছিল, সে বিহবলের মতো জিজ্ঞাসা করিল, কী হয়েছে রে কুন্দ?

কুন্দ বলিল, বিকেল থেকে যা কাণ্ড বিন্দুদিদি আরম্ভ করেছিল, যদি দেখতে শশীদাদা এই হাসে, এই কাঁদে, এক্ষুনি আবার গান ধরে দেয়-ভয়ে তো আমাদের হাত-পা সেঁদিয়ে গেল পেটের মধ্যে। কী করেছে-জানেন? আপনার ওষুধের আলমারি খুলে–

আর কিছু শুনিবার দরকার ছিল না। শশী বিন্দুর কাছে গিয়া বসিল। নাড়ি দেখিয়া কুন্দকে বলিল, এখানে এমন করে পড়ে আছে, ধুইয়ে মুছিয়ে ঘরে নিয়ে শুইয়ে দিতে পারলি না তোরা কেউ?

কুন্দও কৈফিয়ত দিয়া বলিল, ধরতে গেলে কামড়াতে আসে যে!

শশী বলিল, এখন তো ইশও নেই কুন্দ? এক কলসি জল নিয়ে আয়।

বিন্দুকে শশী স্নান করাইয়া দিল। তারপর কয়েকজনের সাহায্যে ধরাধরি করিয়া ঘরে শোয়াইয়া দিল।

এও একটা কলঙ্ক বইকী! ক দিন গ্রামে খুব একচোট হৈচৈ হইয়া গেল। ভদ্রপরিবারের অন্তঃপুরে এ কী বিসদৃশ কাণ্ড পুরুষমানুষ মদ খায়, মাতলামি করে, বমি করিয়া ভাসাইয়া দেয়, লোকে নিন্দা করে, কিন্তু আশ্চর্য হয় না। বাড়ির মেয়ে এমন বীভৎস ব্যাপারের নায়িকা হইতে পারে তা যে কল্পনা করাও যায় না। যারা উপস্থিত থাকিয়া বিন্দুর মাতলামি দেখিতে পায় নাই তারা আপশোশ করিয়া মরে,–সকলকে বিস্তারিত বর্ণনা শুনাইতে শুনাইতে প্রত্যক্ষদর্শীদের হয় সুখকর প্রাণান্ত।

সেদিন রাত্রে গোপাল থতোমতো খাইয়া গিয়াছিল, সারারাত্রি নিষ্ক্রিয় অবস্থায় গুমরাইয়া গুমরাইয়া পরদিন সকালবেলা তাহার ক্রোধের আগুন দাউদাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। বিন্দুকে আনিবার অপরাধে শশীকে সে গালাগালি করিল। অকথ্য, চিৎকার করিয়া বিন্দুকে সে বারবার বলিল দূর হইয়া যাইতে। এমন হতভাগ্য যে মেয়ে, গোপালের বাড়িতে তার একদম ঠাঁই হইবে না। শশী নির্বাক হইয়া রহিল, বিন্দু ঘরে খিল দিয়াছিল, সেও কোনো সাড়াশব্দ দিল না। সমস্ত সকালটা বাড়ি তোলপাড় করিয়া, একজন মুনিষকে খড়ম দিয়া পিটাইয়া, জামা চাদর লইয়া ছাতা বগলে গোপাল বাহির হইয়া গেল। বলিয়া গেল, কলিকাতা যাইতেছে, কারণ গ্রামে তাহার মুখ দেখাইবার উপায় নাই। ফিরিয়া আসিয়া বিন্দুকে যদি গৃহে দেখিতে পায় বাড়িঘরে গোপাল আগুন ধরাইয়া দিবে।

মেজাজটা শশীর বিগড়াইয়া গিয়াছিল বিন্দুর উপরে কিন্তু তাহার রাগ হইল না। দিন-তিনেক বিন্দুর ঘরের বাহিরে আসিল না-দিবারাত্রি খিল দিয়া ঘরের মধ্যে নিজেকে নির্বাসিত করিয়া রাখিল। শুধু শশীর ডাকাডাকিতে বাহিরে আসিয়া পুকুরে একটা ডুব দিয়া আসে, ঘাড় গুঁজিয়া দুটি ভাত মুখে দেয়, তারপর আবার ঘরে গিয়া খিল বন্ধ করে। কেহ কথা বলিলে জবাবও দেয় না, মুখও তোলে না। তিনদিন পরে কী মনে করিয়া সে ঘরের বাহিরে আসিল, কুন্দর সঙ্গে সহজভাবে দুটি-একটি কথাও বলিল। কিন্তু মিশিতে পারিল না কারো সঙ্গে। এখানে আসিয়া অবধি যেরকম নির্জীব নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করিতেছিল তেমনিভাবে দিন কাটিতে লাগিল।

একটা অনাবশ্যক ব্যস্ততার সঙ্গে শশী ঘুরিয়া বেড়ায়, কর্তব্য কাজগুলি সম্পন্ন করে। এতদিন সে রোগীর পরিবারের আত্মীয়-বন্ধুর মতো রোগী দেখিয়াছে, ওষুধের সঙ্গে দিয়াছে আশ্বাস। এখন সে গম্ভীরমুখে রোগীর নাড়ি টেপে, সামান্য কারণে রাগিয়া আগুন হইয়া ওঠে। কোনো কথা একবারের বেশি দুবার বলিতে হইলে বিরক্তির তাহার সীমা থাকে না।

সময়টা চৈত্র মাস। কড়া রোদে মাঠ ভাঙিয়া শশীর পালকি গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যায়, হুহু করিয়া গরম বাতাস বহিতে থাকে। পালকির মধ্যে নিক্রিয় উত্তপ্ত অবসর শশী ভাবিয়া ভাবিয়া ক্ষয় করিয়া ফেলে। বিন্দুর কথা ভাবে, কুসুম ও মতির কথা ভাবে। কুসুম ও মতির সম্বন্ধে নূতন করিয়া কিছু ভাবিবার নাই। বিন্দুর কথা ভাবিয়া সে কুল-কিনারা দেখিতে পায় না। বিন্দুকে সে-ই নন্দর কবল হইতে ছিনাইয়া আনিয়াছে,-ওর সম্বন্ধেসমস্ত দায়িত্ব তাহার। বিন্দু যে বীভৎস কীর্তি করিয়া লোক হাসাইয়াছে, গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে অকথ্য দুর্নাম রটনা হইতেছে, এ জন্য শশী নিজেকে অরপাধী মনে করে। তারই দোষ। যে বিষয়ে সে দায়িত্ব গ্রহণ করে তাই ভেস্তাইয়া যায়। একটা অদৃশ্য দুর্বার শক্তি যেন অহরহ তার বিরুদ্ধে কাজ করিতেছে। রূপসী সেনদিদির স্নেহপাত্র ছিল, কুরূপা সেনদিদিকে এড়াইয়া চলিবার ইচ্ছার জন্য তাই নিজেকে আজ অশ্রদ্ধা করিতে হয়। পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিয়াছিল। তারপর যেদিন আপন হইতেই ওদের অভিভাবকের আসনটি সে পাইয়াছে, সেদিন চিনিতে পারিয়াছে কুসুমের মন, নষ্ট করিয়াছে মতির ভবিষ্যৎ। এবার বিন্দুর এই অবস্থা দাঁড়াইল। বিন্দুকে আনিবার সময় কত কল্পনাই সে করিয়াছিল!—ধীরে ধীরে বিন্দুর মনকে সুস্থ করিয়া তুলিবে, গ্রামের শান্ত আবেষ্টনীতে মনে ওর শান্তি আসিবে, তার স্নেহ যত্ন সাহচর্যে স্বামীহীনা নারীর যত রস ও আনন্দ জীবনে থাকা সম্ভব ক্রমে ক্রমে সব আসিবে বিন্দুর জীবনে : বই পড়িতে এবং ভাবিতে শিখাইয়া একটি অপূর্ব অন্তর্লোক ওর জন্য সে সৃষ্টি করিয়া দিবে। তা যে কতদূর অসম্ভব আজ আর বুঝতে শশীর বাকি নাই।

ভাবিতে শশীর কষ্ট হয়, তবু ইহা সত্য যে শুধু নেশার জন্য বিন্দু সেদিন মদ খাইয়াছিল, আর কোনো কারণে নয়। একদিন হয়তো সাড়াশি দিয়া দাঁত ফাঁক করিয়া তাহাকে নন্দর ও-জিনিসটা গিলাইতে হইয়াছিল, আজ মদ ছাড়া বিন্দুর চলে না। তা ছাড়া, শুধু মদের নেশা নয়, সাত বছর ধরিয়া নন্দ তাহাকে যে উত্তেজনায় অস্বাভাবিক জীবন দিয়াছিল, সেই জীবনও বিন্দুর অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে। তাহার বিপুল বিকারগ্রস্ত বিরহ তো শুধু নন্দর জন্য নয়—লজ্জাকর বিলাসিতার জন্য, সংগীত ও উন্মত্ততার জন্য। গ্রামের বৈচিত্র্যহীন স্তিমিত নিস্তেজ জীবন বিন্দুর সহিতেছে না।

কী উপায় হইবে বিন্দুর? নন্দর কাছে ফিরিয়া যাইবে? তাহাতেও লাভ নাই। যে বিকৃত অভ্যস্ত জীবনের জন্য বিন্দু মরিয়া যাইতেছে, সে জীবনে ফিরিয়া গেলেও তার সমস্যার মীমাংসা হইবে না। গায়ের জোরে এই অস্বাভাবিক জীবনে বিন্দুর অভ্যাস জন্মানো হইয়াছে, তাই, গৃহস্থকন্যার একটি সংস্কারও তার মরিয়া যায় নাই। ওই অশান্ত উদাম লজ্জাকর অবস্থায় দিন কাটাইতে না পারিলে তাহার চলিবে না, কিন্তু সেজন্য লজ্জায় দুঃখে অনুতাপে যন্ত্রণাও সে পাইবে অসহ্য। আকণ্ঠ মদের পিপাসার সঙ্গে বিন্দুর মনে মদের প্রতি এমন মারাত্মক ঘৃণা আছে যে নেশার শেষে আত্ম গ্লানিতে সে আধমরা হইয়া যায়।

কী হইবে বিন্দুর?

বিন্দুর লজ্জা ভাঙিয়াছে। কোণঠাসা ভীরু জন্তুর একটা হীন সাহস জাগিয়াছে তাহার। রাতদুপুরে উঠিয়া আসিয়া সে দরজা ঠেলিয়া শশীর ঘুম ভাঙায়, ঘুমের ওষুধ চায়, মাথা ধরার প্রতিকার প্রার্থনা করে।

শশী বলে, চুপচাপ শুয়ে থাকবি যা, ঘুম আসবে। মাথাধরাও কমে যাবে।

বিন্দু কাঁদিয়া বলে, না দাদা, দাও ঘুমের ওষুধ,-এত কষ্ট সইতে পারি না।

নিশুতি রাতে তাহার শীর্ণ কম্পিত শরীর আর জ্বলজ্বলে চোখের গাঢ় তৃষ্ণ শশীকে উতলা করিয়া তোলে। বুঝাইয়া সে পারিয়া ওঠে না। বিন্দু কোনো কথা কানে তোলে না-অবুঝ শিশুর মতো ঘুমের ওষুধ চাহিতে থাকে।

শশী বলে, তোর একটু মনের জোর নেই বিন্দু?

বিন্দু বলে, মরে গেলাম আমি, মনের জোর কোথা পাব?

শশী একটা ওষুধ তৈরি করিয়া তাকে দেয়। বিন্দু সে ওষুধ মেঝেতে ঢালিয়া ফেলে। শশীর পা জড়াইয়া ধরিয়া বলে, একটু ভালো ওষুধ দাও, একটুখানি দাও। দাও না একটু ভালো ওষুধ আমাকে?

ব্রান্ডির বোতল শশী বাক্‌সে বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল,-আলমারিতে রাখিতে সাহস পায় নাই। চাবির অভাবে কাচ ভাঙিয়া বোতলটা আয়ত্ত করা বিন্দুর পক্ষে অসম্ভব নয়। খানিকক্ষণ সে অবুলণ্ঠিতা বিন্দুর দিকে চাহিয়া থাকে। তারপর বলে, পা ছাড়, দিচ্ছি।

ওষুধের গ্লাসে ঘুমের ওষুধ খাইয়া বিন্দু ঘুমাইতে যায়। শশী চুপ করিয়া জাগিয়া বসিয়া থাকে। কত যে মশা কামড়ায় তাহাকে তাহার ইয়ত্তা নাই। শশী ভাবে, কেন সে এমন অক্ষম, এত অসহায়? শান্তি দিবে বলিয়া যাকে সে কুড়াইয়া আনিয়াছিল, রাতদুপুরে তাকে তার মদ পরিবেশন করিতে হয় কেন?

দিন-দশেক কলিকাতায় থাকিয়া গোপাল ফিরিয়া আসিল। বিন্দুর সম্বন্ধে সে আর কোনো উচ্চবাচ্য করিল না, মনে হইল বিন্দুর সেদিনকার অপরাধ সে বুঝি ক্ষমাই করিয়া ফেলিয়াছে। শশী তাহাকে চিনিত, গোপালের শান্তভাবে সেই শুধু একটু চিন্তিত হইয়া রহিল।

দিন-তিনেক নির্বিবাদে কাটিয়া গেল। তারপর একদিন সকালে শশীকে ডাকিয়া গোপাল বলিল, নন্দর সঙ্গে দেখা হয়েছিল শশী।

দেখা হইয়াছিল হঠাৎ, পথে!—গোপাল যাচিয়া দেখা করে নাই। গোপালের মানসিক প্রক্রিয়াটা ধরিতে না পারিয়া শশী একটু বিরক্ত হইয়া উঠিল।

বিন্দু অনেক দিন এসেছে, নন্দ ওদিকে রাগারগি করছে শশী,—দু-চার দিনের মধ্যে পাঠিয়ে দিতে বললে।

শশী স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করিল, পাঠিয়ে দিতে বললে না আপনি কথার ভাবে অনুমান করলেন?

গোপাল জোর দিয়া বলিল, বললে, পাঠিয়ে দিতে বললে। তুমি ওকে রেখে আসতে পারবে?

শশী বলিল, পারব।

কাল দিন ভালো আছে, কালকেই রওনা হয়ে যাও।

তাই হোক। যাইতে যদি হয় বিন্দুকে, কাল গেলে কোনো ক্ষতি নাই। বিন্দুকে শশী কথাটা তখনি শুনাইয়া দিল। বিন্দু একটু হাসিল।

তাই চলো দাদা, সেই ভালো।

শশী বলিল, এমন জানলে তোকে আমি আনতাম না বিন্দু। শুধু কষ্ট পেলি, ওদিকে নন্দ রেগে রইল, কোনো লাভ হল না।

বিন্দু বলিল, লাভ হল বইকী দাদা চলে না এলে কী করে বুঝতাম ওখানে ওমনিভাবে থাকা ছাড়া আমার গতি নেই? এবার আর কিছু না হোক, মুক্তির কল্পনা করে অযথা ব্যাকুল হব না। হয়তো এবার মনও বসবে। হয়তো এবার খুব সুখেই থাকব।

বিদায় নেওয়া ঠিক হইয়া গেল বলিয়া বোধ হয় বিন্দু এতদিন পরে গ্রামের দিকে চাহিয়া দেখিল,-আত্মীয় পরিজনের সঙ্গে মেলামেশা করিল। সেদিনকার কাণ্ডের পর সকলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করিতে আজ বিন্দুর সংকোচ হওয়া উচিত ছিল। এ বাড়ির উঠানে নিজের বমির মধ্যে সে যে একদিন গড়াগড়ি দিয়াছিল, সকলের সঙ্গে হঠাৎ তার অবাধ অকুণ্ঠ ব্যবহার দেখিয়া মনে হইল না সেকথা বিন্দুর স্মরণ আছে। রান্নাঘরে কুন্দর ছেলেকে কোলে করিয়া বসিয়া অনেকক্ষণ সে সকলের সঙ্গে গল্প করিল, হাসিল পর্যন্ত। সে যেন স্বামীর গৃহে সহজ ও সাধারণ বধূজীবন যাপন করিয়া বহুদিন পরে বাপের বাড়ি আসিয়াছে,-জীবনে তাহার গ্লানি নাই, অস্বাভাবিকতা নাই,–মনভরা তাহার নির্মল আনন্দ।

খবর পাইয়া পাড়াসুদ্ধ মেয়েরা বিন্দুকে দেখিতে আসিল। অনেকে তাহারা বিন্দুকে জন্মাইতে দেখিয়াছে। বিন্দু আজ তাদের কাছে আকাশের পরীর চেয়েও রহস্যময়ী। অনেক দিন আগে একবার আসিয়া গ্রামকে সে চমকাইয়া দিয়াছিল, এবারও দিয়াছে। আবার সে ফিরিয়া যাইতেছে তাহার অজ্ঞাত রহস্যময় প্রবাসে, তাদের গায়ের মেয়ে বিন্দু। কুসুম এবং পরাণও আসিল। কুসুম চুপিচুপি বিন্দুকে বলিল, বড্ড যে হাসিখুশি দিদি?

বিন্দু বলিল, বরের কাছে যাব যে ভাই!-শীর্ণ মুখে সে অকথ্য হাসি হাসিল।

আবার কবে আসবে?

আর তো আসব না বউ।

পরাণ শশীকে বলিল, মতিদের খোঁজ করবেন ছোটোবাবু?

শশী বলিল, করব বইকী। বৈশাখ মাস পড়ল না? বৈশাখ মাসে কুমুদ সরস্বতী অপেরায় যোগ দেবে বলেছিল পরাণ। দলটার ঠিকানা অবশ্য আমি জানি না, তবে খোঁজ পেতে কষ্ট হবে মনে হয় না।

খবর যদি পান ছোটোবাবু, মতিকে নিয়ে আসবেন। দু-মাস হল গেছে, ছেলেমানুষ তো, কাঁদাকাটা করছে হয়তো।

দু-মাস গিয়াছে? তাই তো বটে। পরাণের মুখের দিকে শশী চাহিতে পারে না! দুমাস হইল মতি গ্রামছাড়া, এর মধ্যে একটা খবরও আসে নাই টাকা চাহিয়াও কুমুদ যদি একখানা পত্র লিখিত! যদি দেখা হয় কুমুদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করিতে হবে। বুঝাইয়া দিতে হইবে সে কতবড় দায়িত্বজ্ঞানহীন রাস্কেল।

আচ্ছা, মতি তো একখানা চিঠি লিখিতে পারিত তাহার আকাবাঁকা অক্ষরে? কেন লিখিল না? কুমুদের সঙ্গে খেলা করিয়া সময় পায় না? এ ক্ষমতা কুমুদের আছে,- মানুষকে সে

আত্মভোলা করিয়া দিতে পারে। তা ছাড়া হয়তো কুমুদ যেমন বিবরণ যেমন লেখে, মিলনের তেমনি অতল উচ্ছল আনন্দে মতি বিশ্বসংসার ভুলিয়া গিয়াছে? শশী একটু হাসে। মতিকে উপন্যাসের নায়িকার মতো ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছে, সেও তো কম কল্পনাপ্রবণ নয়!

পরদিন বিন্দুকে সঙ্গে করিয়া শশী কলিকাতায় রওনা হইয়া গেল। দিন এবং রাত্রি কাটিল পথে, কথা তাহারা বলিল খুব কম। কে ভাবিয়াছিল এ ভাবে বিন্দুকে আবার ফিরাইয়া দিতে হইবে। বিন্দুর বাড়ির সেই ফরাশ-পাতা, তবলা তাকিয়া ও কুদৃশ্য ছবিতে সাজানো ঘরখানা শশীর মনে ভাসিয়া উঠিতেছিল। সে ভাবিতেছিল, তার আলমারিতে বোতলের পাশে লেবেল-আঁটা বিষের শিশি ছিল, বিন্দু কেন বিষ খাইল না?

বেলা প্রায় দশটার সময় তাহারা বিন্দুর বাড়ি পৌঁছিল। দারোয়ান খুব ঘটা করিয়া সেলাম করিল বিন্দুকে, বিন্দুর দাসী একগাল হাসিল। নন্দ নামিয়া আসিল, নির্লজ্জ অকুণ্ঠ নন্দ। হাসিমুখে শশীকে অভ্যর্থনা করিয়া সে বলিল, এসো এসো, আসতে আজ্ঞা হোক।

শশী বলিল, আসতে পারব না নন্দ। কাজ আছে।

বিন্দু মিনতি করিয়া বলিল, একটু বসে যাবে না দাদা?

কাজ আছে বিন্দু।

শশী নামিয়া দাঁড়াইয়াছিল, এবার গাড়িতে উঠিয়া বসিল। বিন্দু তাকে আর নামিতে অনুরোধ করিল না, শুধু বলিল, গাঁয়ে ফেরার আগে যদি সময় পাও, একবারটি খবর নিয়ে যেও।

বিন্দু ভিতরে চলিয়া গেল। শশীর গাড়ি চলিতে আরম্ভ করিবে, গাড়োয়ানকে থামিতে বলিয়া নন্দ কাছে আগাইয়া আসিল। শশীর মনে হইল নন্দ খুব রোগা হইয়া গিয়াছে, গিয়াছে, চোখে রাতজাগার চিহ্ন।

খবর নিতে বোধ হয় আসবে না?—নন্দ জিজ্ঞাসা করিল।

কী করে বলি? সময় পাব না হয়তো।—বলিল শশী।

নন্দ একটু ভাবিল, এলে ভালো করতে শশী। ওকে কাল বাড়ি নিয়ে যাব ভাবছি— মা ওরা সব যে বাড়িতে আছেন সেইখানে। এ বাড়িটা বেচে দেব। নতুন লোকের মধ্যে গিয়ে পড়ে একটু হয়তো বিব্রত হয়ে পড়বে, তুমি গিয়ে দেখা করলে ভালো লাগবে ওর। মন বসতে সাহায্য হবে।

শশী অবাক হইয়া বলিল, বিন্দুকে বাড়ি নিয়ে যাবে?

নন্দ বলিল, তাই ভাবছিলাম। এখানে যখন থাকতে চায় না, বাড়িই চলুক। একবার তোমার সঙ্গে চলে গেল, পরের বার যদি জন্মের মতো আমাকে ত্যাগ করে বসে? কী জানো শশী, বুড়োবয়সে এসব হাঙ্গামা ভালো লাগে না। এখানে নিজের মনে কত আরামে ছিল,-ভিড় নেই, ঝঞ্ঝাট নেই, সব বিষয়ে স্বাধীন। তা যদি ভালো না লাগে, চলুক তবে যেখানে থাকতে ভালো লাগবে সেইখানে—আমার কী? আমি কাজের মানুষ, কাজ নিয়ে থাকি নিজের।

এ সুবুদ্ধি তোমার আগে হল না কেন নন্দ?

নন্দ হঠাৎ একথার জবাব দিতে পারিল না। তারপর ছেলেমানুষের মতো বলিল, আগে কী করে জানব যে পালিয়ে যাবে? বেশ তো হাসিখুশি দেখতাম।

শশী একবার ভাবিল, নন্দকে বুঝাইয়া এ মতলব ত্যাগ করিতে বলে। সাত বছর ধরিয়া যে অন্যায় সে করিয়াছে, আজ অসময়ে কেন তার প্রতিকারের চেষ্টা? চেষ্টা সফল হইবার সম্ভাবনাও নাই। ঘোমটা টানিয়া বিন্দু আজ এতকাল পারে শাশুড়ি ননদ সতিনের সংসারে নিরীহ বধূটি সাজিতে পারবে কেন? তা যদি পরিত, গাওদিয়ার উত্তেজনাহীন সহজ জীবন তাহার অসহ্য হইয়া উঠিত না।

শেষ পর্যন্ত কিছু না-বলাই শশী মনে করিল। নন্দর সঙ্গে এ আলোচনা করা চলে না।

গতবার কুসুমদের সঙ্গে করিয়া যে হোটেলে উঠিয়াছিল এবারও শশী সেইখানে গেল। কুমুদের দেখা পাইবার আশায় মতি যে এখানে আগ্রহে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল সেকথা শশীর মনে আছে। মতি? অতটুকু মেয়ে মতি? কী মন্ত্রই কুমুদ জানে, বেহিসাবী নিষ্ঠুর যাযাবর কুমুদ!

পরদিন শশী কুমুদের খোঁজ করিল। একটা থিয়েটারের সাজপোশাকের দোকানে বিনোদিনী অপেরার ঠিকানা পাওয়া গেল, সরস্বতী অপেরার সন্ধান কেহ শশীকে দিতে পারিল না। কুমুদ বলিয়াছিল, বিনোদিনী অপেরার সঙ্গে তাহার সম্পর্ক চুকিয়াছে, ওখানে খোঁজ করিয়া লাভ হইবে কি না সন্দেহ। তবু শশী শেষবেলায় চিৎপুরে একটা বাড়ির দোতলায় অধিকারীর সঙ্গে দেখা করিল।

সদ্য-ঘুম-ভাঙা অধিকারী বলিল, কুমুদ? অঘ্রাণ মাস থেকে সে শালাকে আমরাও খুঁজছি মশায়। ভাওতা দিয়ে তিন মাসের মাইনে আগাম নিয়ে সরেছে। দুদিন পরে শ্রীপুরে রাজবাড়িতে বায়না ছিল, একেবারে ডুবিয়ে দিয়ে গেছে মশায়। অধিকারী আরক্ত চোখে কটমট করিয়া শশীর দিকে চাহিল, মশায়ের কী সর্বনাশটা করেছে শুনতে পাই?

শশী একটু হাসিল, সে কথা শুনে আর কী হবে? সরস্বতী অপেরার ঠিকানাটা বলতে পারেন?

সরস্বতী অপেরা? নামও শুনিনি।

এইখানে তবে ইতি কুমুদকে খোঁজ করার? শশী চলিয়া আসিতেছিল, অধিকারী বলিল, কুমুদের সঙ্গে আপনার দেখা হবে কি?

শশী বলিল, তা বলতে পারি না। হওয়া সম্ভব।

অধিকারী বলিল, দেখা হলে একবার জিজ্ঞেস করবেন তো এই কি ভদরলোকের ছেলের কাজ? আচ্ছা থাক, ওসব কিছু জিজ্ঞেস করে কাজ নেই, বাবুর আবার অপমানজ্ঞানটি টনটনে বলবেন যে আধর মল্পিক ও দুশো-চারশো টাকার জন্য কেয়ার করে না। পালাবার কী দরকার ছিল রে বাপু, অ্যাঁ? চাইলে ও কটা টাকা তোকে আর আমি দিতাম না,-তিন বছর তুই আমার দলে আছিল, ছেলের মতো তোর পরে মায়া বসেছে।

গলাটা অধিকারীর ধরিয়া আসিল, কে জানে শ্লেষ্মায় কি মমতার চোখ পিটপিট করিয়া বলি, আমার ছেলেপিলে নেই, জানেন? একটা মেয়ে ছিল, বাপ বটে আমি, তবু বলি দেখতে-শুনতে মেয়ের আমার তুলনা ছিল না মশায়-রঙ যাকে বলে আসল গৌর তাই। কুমুদের সঙ্গে বিয়ে দেব ভেবেছিলাম, তা ছোড়ার কি আর বিয়ে-টিয়ের মতলব আছে- একদম পাষণ্ড। তাই না কেষ্টনগরের এক ডাকাতের হাতে মেয়ে দিতে হল, যন্ত্রণা দিয়ে মেয়েটাকে তারা মেরে ফেললে। সেই থেকে কী যে হল আমার, সংসারে আর মন নেই- দল একটা করেছি, কেউ ডাকলে-ডুকলে পালা গেয়ে আসি-কিছু ভালো লাগে না মশায়। আছি শতেক জ্বালায় আধমরা হয়ে, কুমুদ ছোড়া কিনা ডুবিয়ে গেল আমাকেই,-ছোড়ার দেহে একফোঁটা মায়াদয়া নেই। আমি হলে তো পারতাম না বাপু একটা শোকাতুর মানুষের ঘাড় ভেঙে পালাতে,-পারতাম না। ছোঁড়াটা কী!

বিস্ময়ে ও আবেগে অধিকারী শুধু মাথাই নাড়িল খানিকক্ষণ। তারপর আরও বেশি অন্তরঙ্গ হইয়া বলিল, আপনাকে খুলেই বলি দাদা, কুমুদ গিয়ে থেকে দলটা কানা হয়ে গেছে। খাসা পার্ট বলত, বিশ বছর আছি এ লাইলে, অমনটি আর দেখিনি। দেখা হলে বলবেন, টাকা গেছে যাক, আসুক, কাজ করুক, পুরোনো কাসুন্দি ঘাটাবার পাত্র অধর মল্লিক নয়। দশ-বিশ টাকা মাইনে বেশি চায়, আমি কি বলেছি দেব না? ছোঁড়াটা কী!

দিন তিনেক শশী আরও কয়েকটা দলে কুমুদের খোঁজ করিল, কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না। অনেক রোগী ফেলিয়া আসিয়াছে, বেশিদিন কলিকাতায় বসিয়া থাকিবার উপায় শশীর ছিল না। পরদিন সে গাওদিয়া ফিরিয়া যাইবে ঠিক করিল। বাকি জীবনটা

কলিকাতায় বসিয়া মতির খোঁজ করিলে তো তার চলিবে না। গ্রামে ফিরিবার এই আভ্যন্তরিক তাগিদ সেদিন রাত্রে শশীকে একটু অবাক করিয়া দিল। শশীর ঘরখানা রাস্তার উপরে। অনেক রাত্রে চৌকির প্রান্তে জানালার ধারে সে বসিয়া ছিল। পথে তখন লোক চলাচল কমিয়াছে, দোকানপাট বন্ধ হইয়াছে। কাল তাহাকে গ্রামে ফিরিতে হইবে। একদিন গ্রাম ছাড়িয়া আসিয়া বৃহত্তর বিস্তৃততর জীবন গঠনের কল্পনা করিয়া সে দিন কাটায়, আর ইতিমধ্যেই এমন অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে এক সপ্তাহ বাহিরে আসিয়া তাহার থাকা চলেনা। কলেরা, বসন্ত, কালাজ্বর, টাইফয়েড এবং আরও অনেক ছোট-বড় রোগে আক্রান্ত যাদের সে ফেলিয়া আসিয়াছে, একে একে তাদের কথা মনে পড়িলে আর একটা দিনও অকারণে কলিকাতায় বসিয়া থাকিবার সংকল্পে নিজেকে তাহার খেয়ালি, বর্বর মনে হইতেছে। কে জানে ওদের কে ইতিমধ্যেই গিয়াছে মরিয়া, কার অবস্থা গিয়াছে খারাপের দিকে ফিরিয়া গিয়া আবার ওদের রোগশয্যা পার্শ্বে বসিতে না পারিলে মনে তো স্বস্তি পাইবে না। এ কী বন্ধন, এ কী দাসত্ব?

শশীর রাগ হয়। এ দায়িত্ব সে মানিবে না, এত কিসের নীতিজ্ঞান? গ্রামে তো সে ফিরিবে না এক মাসের মধ্যে-সে কি মানুষের জীবন-মরণের মালিক? যতদিন গ্রামে ছিল, যে ডাকিয়াছে চিকিৎসা করিয়া আসিয়াছে এখন যদি রোগীরা তার চিকিৎসার অভাবে মরিয়া যায়, মরুক। তিন বছর আগে সে ডাক্তারি পাস করে নাই, তখন কী করিয়াছিল গাঁয়ের লোক? এখনো তাই করুক। শশী কিছু জানে না।

৮. গ্রামে না-ফিরিবার প্রতিজ্ঞা

এক মাস গ্রামে না-ফিরিবার প্রতিজ্ঞা দুদিনের বেশি টিকিল না শশীর। এ-গাঁয়ে ও-গাঁয়ে অসহায় বিপন্ন রোগীরা যে পথ চাহিয়া আছে।

বিন্দুর সঙ্গে দেখা করিবার ইচ্ছা শশীর আর ছিল না। রওনা হওয়ার দিন বিকালে হঠাৎ অনিচ্ছা জয় করিয়া সে হাজির হইল নন্দও বাড়িতে। নন্দ বাড়ি ছিল। বিন্দু? না, বিন্দুকে এখনো এ-বাড়িতে আনা হয় নাই।

নন্দ বলিল, ও বাড়ি যাব বলে তৈরি হচ্ছিলাম। দেখা করবে তো চলো আমার সঙ্গে।

শশী বলিল, ও বাড়ি যাবার সময় হবে না নন্দ। আজ বাড়ি যাচ্ছি, সাতটায় গাড়ি।

আজকেই যাবে? বোসো, চা-টা খাও।

শশীর মনে কি এ আশা ছিল যে গাওদিয়ার বাড়িতে টিকিতে না পারিলেও নন্দর গৃহে গৃহিণী হইয়া বিন্দু থাকিতে পারবে? বিন্দু আসে নাই শুনিয়া সে যেন বড় দমিয়া গেল। নন্দর বাড়িঘর দেখিয়া সে একটু অবাক হইয়া গিয়াছিল। এখানে আগে সে কখনও আনে নাই, নন্দর গৃহে বনেদিত্বের ছাপ যে এত স্পষ্ট ও প্রীতিকর এ ধারণা তাহার ছিল না। সেকেলে ধরনের ভারী নিরেট সব আসবাব, দরজা জানলায় দামি পুরু পর্দা, দেয়ালে প্রকাণ্ড কয়েকটা অয়েলপেন্টিং, এমনি সব গৃহসজ্জা নন্দর এই ঘরখানাকে একটি অপূর্ব গম্ভীর শ্রী দিয়াছে। অন্দর বোধহয় বেশি তফাতে নয়—কোমল গলার কথা ও হাসি শশীর কানে আসিতেছিল,—সে অনুভব করিতেছিল অন্তরালে একটি বৃহৎ সুখী পরিবারের অস্তিত্ব। তারপর একসময় সাত-আট-বছর বয়সের একটি সুশ্রী ছেলে কী বলিতে আসিয়া শশীকে দেখিয়া নন্দর গা ঘেষিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। কী সুন্দর তার দুটি কৌতুহলী চোখ। আর কী মায়া নন্দর চোখে।

গরমে যে ঘেমে উঠেছিস? বলিয়া নন্দ নিজে ছেলের জামা খুলিয়া দিতে শশী যেন অবাক হইয়া গেল। একি অসঙ্গতি নন্দ ও নন্দর আবেষ্টনীর মধ্যে? তার এই পুরুষানুক্রমিক নীড়ে শান্তি আছে নাকি? এই গৃহের সীমাবদ্ধ জগতে কি সুখ ও আনন্দের তরঙ্গ ওঠে আর পড়ে?

নন্দর ছেলে চলিয়া গেলে শশী বলিল, বিন্দুকে বলেছিলে নন্দ, এখানে আসার কথা?

বলেছিলাম। সে আসবে না।

আসবে না? ইহা অপ্রত্যাশিত নয়। তবু শশী যেন নিভিয়া গেল।

চাকর তামাক দিয়া গিয়াছিল, নন্দর হাতের নলটা সাপের মতো দুলিয়া উঠিল, অন্যমনস্কভাবে সে বলিতে লাগিল, এমন জেদি মানুষ জন্মে দেখিনি শশী কথা বললে হেসে উড়িয়ে দেয়। রাগের মাথায় ঠিক থাকেনি দিকবিদিক,-কিন্তু সত্যি বলছি শশী, শেষের দিকে ওই আমাকে চালিয়ে নিয়ে এসেছে, থামতে দেয়নি। স্পষ্ট করে আমি অবশ্য এতদিন বলিনি কিছু মনটা আমার কদুর বদলে গেছে আগে ভালো বুঝতে পারিনি শশী। এবার যখন গাওদিয়া চলে গেল সেই থেকে কেমন–

নন্দ হেন লোক, সেও আজ তামাক টানার ছলে কাশিল।

এখানে আনবার জন্য কত তোশামোদ করছি, কী আর বলব তোমাকে। কত বলছি যে আর কেন, চলো এবার ও-বাড়িতে, সকলের সঙ্গে মিলেমিশে থাকবে-খোকার মা আজ এক বছর শয্যাশায়ী, তার ভালোমন্দ কিছু হলে এতবড় সংসার তো তোমারি। না, আমি আর একটা বিয়ে করতে যাব এই বয়েসে। তা শুনে এমন করে হাসে যেন ঠাট্টা করছি।

শশী বলিল, তোমার মুখে এসব কথা হয়তো ঠাট্টার মতোই শোনায় নন্দ।

নন্দর ভাবপ্রবণতা ভাঙিয়া গেল। মুখে দেখা দিল মেঘের মতো বিরাগের ছায়া। হাতের নল নামাইয়া, চোখের ভুরু কুচকাইয়া সে বলিল, তুমি যদি পরিহাস করতে এসে থাকো–

পরিহাস? তোমার সঙ্গে? এরকম কান্ডজ্ঞানের অভাব না হলে তুমি এমন সব কাণ্ড করতে পারো!

শশী আর বসিল না। তাঁহাকে আগাইয়া দিতে নন্দ উঠিয়া আসিল না, যে চা ও খাবার শশী স্পর্শ করে নাই সেদিকে চাহিয়া কী যেন ভাবিতে লাগিল।

গ্রামে ফিরিয়া দিনগুলি এবার অপ্রীতিকর মানসিক চাঞ্চল্যের মধ্যে কাটিতে থাকে। গরমে শরীরও কিছু খারাপ হইয়া যায় শশীর। এ বছর একেবারে বৃষ্টি নাই। গ্রামের শ্যামল রূপ রোদে পুড়িয়া একেবারে বাদামি হইয়া উঠিয়াছে। এটা কলেরার মরসুমের সময়, শ্মশানে ধুম লাগিয়াই আছে। বেশি খাঁটিতে হওয়ায় শশীর মেজাজ গিয়াছে আরও বিগড়াইয়া। স্নানাহারের সময় পায় না, অথচ তেমন পয়সা নাই। কলিকাতায় এরকম পশার হইলে এতদিনে সে বোধ হয় লাখপতি হইয়া যাইত।

পরাণ আশা করিয়াছিল কলিকাতা হইতে শশী তাহাকে মতির খবর আনিয়া দিবে। শশী ফিরিয়াছে শুনিবামাত্র সে ছুটিয়া আসিয়াছিল। শশী মুখ তুলিয়া চাহিতে পারে নাই। পরাণও চুপচাপ খানিক বসিয়া থাকিয়া উঠিয়া গিয়াছিল। সেটা সকাল। তারপর দুপুরে আসিয়াছিল কুসুম। বলিয়াছিল, কেন যে মরছে ভেবে ভেবে চুরি করে তো আর নিয়ে যায়নি বোনকে কেউ, সে গেছে সোয়ামির সঙ্গে, অত ভাবনা কিসের দিনরাত? –কী আনলেন আমার জন্যে?

তোমার জন্যে? কিছু আনিনি বউ।

কী ভুলো মন মাগো কত করে যে বলে দিলাম আনতে?

শশী অবাক হইয়া বলিয়াছিল, কী আবার আনতে বললে তুমি? কখন বললে?

ওমা, বলিলি বুঝি? তা হবে হয়তো বলব বলে বলিনি শেষ পর্যন্ত? কিন্তু না বললে কি আনতে নেই?

কী অকৃত্রিম ছেলেমানুষি কুসুমের, কী নির্মল হাসি তারপর কয়েকদিন কুসুমের সঙ্গে দেখা হয় নাই, এই হাসি শশীর মনে ছিল। জোর করিয়া মনে রাখিয়াছিল। ভাপসা গুমোট, শুষ্ক ডোবা-পুকুর- ভরা গ্রামের রুক্ষ মূর্তি আর কলেরা রোগীর কদর্য সান্নিধ্য, এই সমস্ত পীড়নের মধ্যে কুসুমের খাপছাড়া হাসিটুকু ভিন্ন মনে করিবার মতো আর কিছু শশী খুঁজিয়া পায় নাই।

কিছু ভালো লাগে না শশীর,-নাগ্রাম, না গ্রামের মানুষ। শেষরাত্রে ঢেঁকির শব্দে ঘুম ভাঙিয়া যায়। তখন হইতে সন্ধ্যার নীরবতা আসিবার আগে কায়েতপাড়ার পথের ধারে বটগাছটার শাখায় জমায়েত পাখির কলরব শুরু হওয়া পর্যন্ত, বন্য ও গৃহস্থ জীবনের যত বিচিত্র শব্দ শশীর কানে আসে, সব যেন ঢাকিয়া যায় যামিনীর হামানদিস্তার ঠকঠক শব্দে আর গোপলের গম্ভীর কাশির আওয়াজে। বাড়িতে মেয়ে-পুরুষ হাসে কাঁদে কলহ করে, বাহিরে যুবক ও বৃদ্ধের দল তাস খেলে আড্ডা দেয়, চাষি মজুর গয়লা কুমোর স্যাকরা জেলে দোকানি এরা ছাড়া অলস অকর্মণ্যতার অতিরিক্ত ভদ্র পেশা যাদের আছে আঙুলে গুনিয়া ফেলা যায়। শ্রীনাথের দোকানের লালচে আলোর কীর্তি নিয়োগীর মাথার তেলমাখা আবটি চকচক করিতে দেখিলে নৈশ আকাশের তারা ও চাঁদের আলোর দিকে চাহিতে শশীর লজ্জা করে! বাগদীপাড়ায় জেলফেরত কয়েকজন বীরপুরুষ রাতদুপুরে পরস্পরের মাথা ফাটাইয়া দেয়, শশীর হাতের বাধা ব্যান্ডেজ তাহাদের খোলা হয় জেলের হাসপাতালে। সুদেব বলিয়া বেড়ায়, মতির বিবাহটা মিছে, ছল–শশী কর্তৃক মতিকে গাপ করার কৌশল মাত্র।–ভদ্দরপানা যার সঙ্গে বিয়ে হয় মতির কত টাকা সে খেয়েছে জানো ছোটোবাবুর ঠেয়ে? হয়তো বাজিতপুরে হয়তো আর কোথাও মতিকে শশী লুকাইয়া রাখিয়াছে,-গাঁয়ে যে শশী থাকে না, রোগী দেখিবার ছলে কোথায় চলিয়া যায়, সুদেব ছাড়া আর কে তার অর্থ বুঝিবে! অন্ধকার রাত্রে গোয়ালপাড়ার আট-দশটা ছোকরা একদিন দু-তিন গামলা গোবর-গোলা জল শশীর গায়ে ঢালিয়া দেয়,-গোয়ালপাড়ার গোবর অতি সুপ্রাপ্য। পরদিন গোপালের গোমস্তা বাকি টাকার জন্য সদরে নালিশ রুজু করিতে গিয়াছে খবর পাইয়া গোয়ালপাড়ার মোড়ল বিপিন অবশ্য আসিয়া কাদিয়া পড়ে,-

গোটাকয়েক নিরীহ ছোকরাকে ধরিয়া আয়িা কান মলায়, নাকে খত দেওয়ায়। তাতে মন শান্ত হওয়ার কথা নয়।

তারপর আছে সেনদিদি। অন্ধকারে চোখের মতো পলায়নপর অবস্থায় সামনে পড়িয়া থমকিয়া দাঁড়ানো যেন আজকাল তার বিশেস একটা প্রিয় অভিনয়ে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। অদূরে হুকার লাল আগুন হঠাৎ কোথায় অদৃশ্য হয়, খানিক পরে অন্দরে শোনা যায় গোপালের গলা।

সেনদিদি নূতন একটা আব্দার আরম্ভ করিয়াছে শশীর কাছে। গ্রামের একটি বৃদ্ধের চোখের ছানি কাটিয়া শশী সম্প্রতি তাহার দৃষ্টিশক্তি ফিরাইয়া আনিয়াছে। সেই হইতে সেনদিদি তাহাকে রেহাই দেয় না। বলে, ও শশী, দাও বাবা দাও, কেটে-কুটে ওষুধ দিয়ে যেমন করে হোক, দাও চোখটা আমার সারিয়ে।

শশী বলে, চোখ আপনার নষ্ট হয়ে গেছে সেনদিদি, ও আর সারবে না।

সেনদিদি ব্যাকুল হইয়া বলে, তুমি কেটে-কুটে দিলেই সারবে শশী, আমি তো জন্মান্ধ নই, অ্যাঁ? আমার জন্যে তোমার এত মায়া ছিল সেসব কোথায় গেল বাবা?

সেনদিদিকে বোঝানো দায়। কিছুই সে বুঝতে চায় না। শশীর হাতে চাপিয়া ধরিয়া কাদিয়া ফেলে—সবাই কানী বলে, আমার তা সয় না শশী। ওরে বাপরে, আমি কানি!

নিরূপায় শশী ভাবিয়া চিন্তিয়া বলে, কাচের চোখ নেবেন সেনদিদি, নকল চোখ? দেখতে অবশ্য পাবেন না চোখে, তবে চোখটা আপনার আসল চোখের মতো দেখাবে, লোকে সহজে টের পাবে না।

কাচের চোখ দিয়ে কী করব শশী!—বলিয়া সেনদিদি রাগিয়া ওঠে, তুমি ছাইয়ের ডাক্তার শশী, কিছু জানো তুমি চিকিচ্ছের। কর্তা যা বলে তা তো মিথ্যে নয় দেখছি তা হলে। তুমি

চিকিচ্ছে করে চোখটা আমার খেয়েছ, অন্য কেউ হলে চোখ কি আমার নষ্ট হত। আজকে তুমি কাচের চোখ দিয়ে আমায় ভোলোতে চাও? পাজি, হতভাগা, জোচ্চোর মর তুই, মর!

শশী চুপ করিয়া থাকে। কত ভালোবাসিত সেনদিদি তাকে, তার উপর কত বিশ্বাস ছিল। তবু শশী আর অবাক হয় না। যে স্নেহ-মমতার ভিত্তি ভাবপ্রবণতা, তা যে বুদ্বুদের মতো অস্থায়ী, শশী তা অনেককাল জানে।

কদিন পরে সেনদিদি বলে, হ্যা শশী, কাচের চোখ লাগালে টের পাবে না লোকে?

ভূমিকা নাই, সেদিনকার গালাগালির জন্য আপশোশ নাই, সোজা স্পষ্ট প্রশ্ন!

সহজে পাবে না,–টের পেলেই বা কী এসে যায়? চোখটার জন্যে খারাপ দেখাচ্ছে এখন সেটা তো দেখাবে না।

কবে লাগাবে চোখ?

কাচের চোখের নামে সেদিন সেনদিদি খেপিয়া উঠিয়াছিল, আজ তাহার আগ্রহ দ্যাখো! শশী শান্তভাবেই বলে, আমি তো পারব না সেনদিদি, আমার কাছে যন্ত্রপাতি নেই। বাজিতপুরে হবে কি না তাও জানি না। কলকাতা গিয়ে করাতে হবে, সময় লাগবে অনেক। আপনার ভালো চোখটির সঙ্গে রংটং মিলিয়ে চোখ হয়তো তৈরি করেও নিতে হবে।

কবে নিয়ে যাবে কলকাতা?

একথা বলিতে সেনদিদির দ্বিধা হয় না, সঙ্কোচ হয় না! কত যেন দাবি তাহার কাছে শশীর উপর। প্রথমে শশীর রাগ হয়। তারপর মনে মনে সে হাসে। বলে, কবে যেতে পারব তা তো ঠিক নেই সেনদিদি। রোগী নিয়ে কী রকম ব্যস্ত হয়ে আছি তা তো দেখতে পান? পূজোর আগে আমার যাওয়া যাওয়া হবে কি না সন্দেহ, আর কারো সঙ্গে যান না?

সেনদিদি কাঁদোকাঁদো হইয়া বলে, আমার কে আছে শশী, কে আমাকে নিয়ে যাবে। আমি মরলে সবাই বাঁচে, কে আমার জন্যে এসব হাঙ্গামা করবে? সময় করে একবারটি আমায় নিয়ে চলো বাবা, চোখটা ঠিক করে আনি।

মুখের দাগ মিলাইয়া দিবার ওষুধও তাহাকে শশীর দিতে হয়। দুদিন না যাইতেই আসিয়া নালিশ জানায়, কই দাগ তো শশী মিলিয়ে যাচ্ছে না একটুও কীরকম ওষুধ দিচ্ছ?

শশী ক্লান্তস্বরে বলে, যাবে সেনদিদি যাবে, বসন্তের দাগ কি এত শিগগির যায়?

যত দিন যায়, গ্রাম ছাড়িয়া নূতন জগতে নূতন করিয়া জীবন আরম্ভ করিবার কল্পনা শশীর মনে জোরালো হইয়া আসে। সে বুঝিতে পারিয়াছে জোর করিয়া না গেলে সে কোনোদিন এই সংকীর্ণ আবেষ্টনী হইতে মুক্তি পাইবে না। ভবিষ্যতের জন্য স্থগিত রাখিয়া চলিতে থাকিলে জীবন শেষ হইয়া আসিবে, তবু নাগাল মিলিবে না ভবিষ্যতের। তা ছাড়া, জীবনে যে বিপুল ও মনোরম সমারোহ সে আনিতে চায় তাহা সম্ভব করিতে হইলে শুধু গ্রাম ছাড়িয়া গেলেই তাহার চলিবে না, আত্মীয়বন্ধু সকলের সঙ্গে মনের সম্পর্কও ভুলিতে হইবে। এদের সীমাবদ্ধ সংকীর্ণ জীবনের সুখ-দুঃখের ঢেউ যদি তাকে শক্তি সে পাইবে কেন? সে আবেষ্টনীতে যেভাবে সে বাঁচিতে চায় তার ব্যক্তিগত জীবনে তাহা বিপ্লবের সমান। এ বিপ্লব তাকে আনিতে হইবে একা, তারপর নবসৃষ্ট জগতে বাস করিতে হইবে একা-সেখানে তো এদের স্থান নাই। বিন্দুর কথা ভাবিয়া সে যদি কাতর হইয়া থাকে, কুসুম গোপনে কাঁদে কি না আর মতি কোথায় গেল তাই ভাবে সর্বদা, সিন্ধুকে মনের মতো করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারিল না ভাবিয়া ক্ষোভ করে, নিজের জীবনকে সে গুছাইবে কখন, কখন করিবে নিজের কাজ? যাদের সাহচর্য অশান্তিকর, যাদের সে কাছে চায় না, জীবনের সার্থকতা আনিতে হইলে নির্মমভাবে মন হইতে তাহাদের সরাইয়া দিতে হইবে।

যাদব বলেন, তা হবে না দাদা? বিরাগী হতে হলে মনে বিরাগ চাই। বাইশ বছর বয়সে এ গাঁয়ে এসে বাসা বাঁধলাম, কেউ জানে না কোথা থেকে এলাম, কী বৃত্তান্ত। আমার সব

ছিল শশী-বাড়িঘর, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব-চল্লিশ বছর কারো খবর রাখি না। বাপ-মা মরেছে, খবরও পাইনি, শ্রান্ধও করিনি। ভাইবোন ছিল গোটাকতক, আছে না গেছে তাও জানি না। সেজন্য দুঃখও নেই শশী। নতুন ঘর বাঁধতে হলে পুরোনো খড়কুটো বাদ দিতে হবে না?

কষ্ট হত না প্রথমে?-শশী বলে।

কদিন কষ্ট হত? ভুলো মন মানুষের, দুদিনে ভুলে যায়। সহ্য হল না বলেই ছেড়ে এলাম না সকলকে?

পাগলদিদি হাসিয়া বলেন, সুখে শান্তিতে আছি এখনে-নয় গো?

চল্লিশ বছরের সুখশান্তি! কোন গ্রামে কী জীবন ছিল যাদবের কে জানে? বাইশ বছর বয়সে কিসের লোভে সে গৃহ ছাড়িয়ছিল? গৃহী সাধকের এই জীবন কি তখনও কাম্য ছিল যাদবের, দশটা গ্রামের ভয় ও শ্রদ্ধায় সকলের উপরের একটি আসন? তা যদি হয়, জীবনে তিনি অতুলনীয় সাফল্য লাভ করিয়াছেন বলিতে হইবে। সিদ্ধপুরুষ বলিয়া চারিদিকে নাম রটিয়াছে, পদধূলির জন্য সকলে লোলুপ।

ভালো করিয়া যাদবকে শশী কোনোদিন বুঝিতে পারে না। নিস্পৃহ নির্বিকার মানুষ, কারো প্রণাম গ্রহণ করে না, ভক্তি-গদগদ কথা শুয়িা অবিচলিত থাকেন, কত লোক মন্ত্রশিষ্য হইবার জন্য ব্যাকুল, আজ পর্যন্ত একটি শিষ্যও করেন নাই। তবু, শশীর মনে হয়, প্রণাম যেন যাদব কামনা করেন। পদধূলি দেন না, আশীর্বাদ করেন না, পাষাণ দেবতার মতো উপেক্ষা করে ভক্তিকে,শশীর সন্দেহ জাগে লোকের মনে ভয় ও শ্রদ্ধা জাগানোর কৌশল এসব। তবে তাতে কী আসে যায়? মানুষের কাছে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন হইয়া থাকার অভ্যাস যে মিশিয়া আছে চল্লিশ বছরের সুখশান্তির সঙ্গে। নিলোভ সদাচারী শান্তিপূর্ণ নিরীহ মানুষ, মানুষের কাছে অপার্থিব ক্ষমতার অধিকারী হইয়া থাকিবার কামনাও পার্থিব কোনো লাভের জন্য নয়। ও যেন একটা শখ যাদবের, একটা খেয়াল।

পাগলদিদি আম কাটিয়া দেন শশীকে, একটা খোলা পুঁথির সামনে বসিয়া স্থূল শুভ্র উপবীতখানি যাদব আঙুলে জড়ান। দ্বিজত্বের এই চিহ্নটি শশী তাহার কখনও মলিন দেখিল না। শশীর দৃষ্টিপাতে যাদব হাসেন, পৈতে কখনও মাজি না শশী।

মাজেন না?

না। ও কাজের বরাত দিয়েছি সূর্যকে।

সূর্যকে? —শশী সবিস্ময়ে বলে।

যাদব গম্ভীর মুখে বলেন, সূর্যকে। সূর্যবিজ্ঞান বিশ্বাস করো না তাই অবাক হও, নইলে এ তো তুচ্ছ সূর্যজ্ঞান যে জানে তার উপবীত কখনও ময়লা হতে পারে? কী করি জানো? স্নান করে উঠে রোজ একবার রোদে মেলে ধরি, ধবধবে সাদা হয়ে যায়। আজ খানিকটা বাদ পড়ে ছিল, কেমন ময়লা হয়ে আছে দ্যাখো—

যাদব পইতা মেলিয়া ধরেন, শশী লক্ষ করিয়া দ্যাখে রোদের পাশে ছায়ার মতো পৈতার খানিকটা সত্যসত্যই নিস্প্রভ, মলিন। সূর্যবিজ্ঞানে আর নিজের অত্যাশ্চর্য ক্ষমতায় শশীর বিশ্বাস জন্মানোর জন্য কত যত্নে না-জানি যাদব পৈতার ওই অংশটুকু পাতলা জল-মেশানো কালিতে ডুবাইয়াছেন, কালি যাতে বুঝা না যায়। শশীর হাসিও পায়, মায়াও হয়। তাকে অভিভূত করার জন্য এত ব্যাকুল প্রয়াস কেন যাদবের? অলৌকিক শক্তিতে অবিশ্বাস করিলেও যাদবকে শ্রদ্ধা সে তো কম করে না!

যাদব বলেন, কত বললাম, শেখো, শশী শেখো, সূর্যবিজ্ঞানের ভূমিকাটুক অন্তত শেখো, ওষুধের বাক্স ঘাড়ে করে রোগী দেখে বেড়াতে হবে না। তা তো শিখলে না। যে বিজ্ঞানের ভিত্তিই মিথ্যে তাই নিয়ে মেতে রইলে। যাকে-তাকে দেবার বিদ্যা এ তো নয়, সারাজীবনে একটি শিষ্য পেলাম না যাকে শিখিয়ে যেতে পারি। এদিকে সময় হয়ে এল যাবার। শুধু তুমি একটু শিখতে পারো শশী, সবটা নয়, সবটা নেবার ক্ষমতা তোমারও নেই, শুধু ভূমিকাটুকু। তাই বা কজনে পায়? কায়মনোবাক্যে আজও তুমি ব্রহ্মচারী বলে—

বিব্রত, বিস্মিত শশী শুনিয়া যায়। এ-ধরনের কথা যাদব মাঝে মাঝে বলেন, শশীও সায় দেয় না, প্রতিবাদও করে না। যাদবের শান্ত ধূপগন্ধ ঘরে সে দুদণ্ডের জন্য জুড়াইতে আসে, তাকে এসব অবিশ্বাস্য কাহিনী শোনানো কেন? সে কি শ্রীনাথ মুদি যে শুনিতে শুনিতে গদগদ হইয়া মুখে ফেলা তুলিবে?

শশীর অবিশ্বাস যাদব টের পান। শশীকে জয় করিবার জন্য তার এত বেশি আগ্রহের কারণও বোধ হয় তাই।

বলেন, সূর্যবিজ্ঞান যে জানে, তার অসাধ্য কী? অতীত ভবিষ্যৎ তার নখদর্পণে। কবে কী ঘটিবে জীবনে কিছুই তাহার অজানা থাকে না। মৃত্যুর দিনটি পর্যন্ত দশ বিশ বছর আগে থেকে জেনে রাখতে পারে।

পৈতাটা যাদব আঙুলে জড়ান আর খোলেন। দুচোখ জ্বলজ্বল করে। সাধে কি ভীরু গ্রামবাসী ভয় করে যাদবকে এমন জ্যোতিষ্মান চোখে চাহিয়া এমন জোরের সঙ্গে যাই তিনি বলুন, অবিশ্বাস করিবার সাহস কারো হওয়া সম্ভব নয়।

আপনি জানেন? – শশী জিজ্ঞাস করে।

জানি না? বিশ বছর থেকে জানি।–বলেন যাদব।

হাসি পায় বলিয়া শশী ফস করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া বসে, কবে?

যাদবও সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়, রথের দিন। আমি রথের দিন মরব শশী। কবে কোন সালের রথের দিন যাদব দেহত্যাগ করবেন ঠিক হইয়া আছে, শশী আর সে কথা জিজ্ঞাসা করে না, কারণ কথাটা বলিয়াই যাদব হঠাৎ এমন ভীতভাবে স্তব্ধ হইয়া যায় এবং পাগলদিদি এমনভাবে অস্ফুট একটা শব্দ করিয়া ওঠেন যে শশী লজ্জবোধ করে। অবিশ্বাসের পীড়নে উত্তেজিত করিয়া অমন অসাবধানে যাদবকে ওকথা বলানো তাহার উচিত হয় নাই। আর ছ'মাস এক বছরের বেশি গ্রামে শশী থাকিবে না একথা যাদব

জানেন। তবু, তার মধ্যেই অসুখ-বিসুখ হইয়া যদি তিনি মরিতে বসেন আর শশীকেই তার চিকিৎসা করিতে আসিতে হয়, মরিতেও বেচারির সুখ থাকিবে না!

কথাটা চাপা দিবার জন্য শশী অন্য কথা পাড়ে। বলে, জানেন পণ্ডিতমশায়, চলে আমি যাব ঠিক, কিন্তু কেমন ভয় হয় মাঝে মাঝে। শুধু শহরে গিয়ে ডাক্তারি করার ইচ্ছা থাকলে কোনো কথা ছিল না, এত বড় বড় কথা আমি ভাবি! বিদেশে যাব, ফিরে এসে কলকাতায় বসব, মানুষের শরীর আর মনের রোগ সম্বন্ধে নতুন নতুন গবেষণা করব, দেশ-বিদেশে নাম হবে, টাকা হবে-।

যাদব যেমন করিয়া সূর্যবিজ্ঞানের কথা বলতেছিলেন, তেমনিভাবে শশী এবার নিজের কল্পনার কথা বলে।

সেই হল সূত্রপাত। রথের দিন দেহত্যাগ করিবার কথা যাদব যা বলিয়াছিলেন শশী জানে তা নেহাত কথার কথা, হঠাৎ মুখ দিয়া বাহির হইয়াছে। হারু ঘোষের বাড়ি গিয়া কথায় কথায় পরাণের কাছে এ গল্প সে কেন করিয়াছিল শশী জানে না। বোধ হয় কুসুমকে শোনানোর জন্য। যেখানে যা-কিছু বিচিত্র ব্যাপার সে প্রত্যক্ষ করে, পরাণকে বলিবার ছলে কুসুমকে সেসব শোনানোর কেমন একটা অভ্যাস তাহার জন্মিয়া যাইতেছে।

তারপর কেমন করিয়া কথাটা যে ছড়াইয়া গেল! ছড়াইয়া গেল একেবারে দিগদিগন্তে। ঝোঁকের মাথায় শশীর কাছে যাদব যে অর্থহীন কথাটা বলিয়াছিলেন গ্রামে তাহা এমন আলোড়ন তুলিবে কে জানিত।

শশী বাজিতপুরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, ছুটিয়া আসিল শ্রীনাথ। সত্যি ছোটোবাবু, দেবতা দেহ রাখবেন?

শশী বলিল, তুমি কী পাগল শ্রীনাথ? কথার ছলে কি বলেছেন না বলেছেন-

শ্রীনাথ বলিল, কথার ছলে তো বলছেন ছোটোবাবু, নইলে নিজে কী রটিয়ে বেড়াবে শুধু এই কথাটি আপনি বলেন ছোটোবাবু, নিজের মুখে দেবতা উচ্চারণ করেছেন কি রথের দিন দেহ রাখবেন?

শশী বলিল, বলেছেন বটে, কিন্তু কী জান–

হায় সর্বনাশ। বলিয়া শ্রীনাথ আকুল হইয়া ছুটিয়া গেল।

ব্যাপারটা যে এত বিরাট হইয়া উঠিবে তখনো শশী কল্পনা করে নাই। নতুবা শ্রীনাথকে ডাকিয়া সে বলিয়া দিত যে রথের দিন যাদব দেহ রাখিবেন বলিয়াছেন বটে কিন্তু সে কোনও এক রথের দিন, আগামী রথ নয়। হাসপাতালে ভরতি করিয়া দিবার জন্য একটি কঠিন অপারেশন রোগীর সঙ্গে শশী বাজিতপুরে যাইতেছিল। রোগীটির অবস্থা বড় শোচনীয়। হাসপাতালে লইয়া যাওয়ার ব্যবস্থা দেওয়া উচিত হইয়া কি না, পথেই যদি শেষ হইয়া যায় তবে বড়ই দুঃখের কথা হইবে, এইসব ভাবিতে ভাবিতে শশী অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছিল।

বাজিতপুরের সরকারি ডাক্তারের সঙ্গে শশীর ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। সম্প্রতি তিনি বদলি হইয়া যাইতেছেন। শশীকে সেদিন তিনি ফিরিতে দিলেন না। পরদিন গ্রামে ফিরিয়া কায়েতপাড়ার পথে লোকের ভিড় দেখিয়া শশী অবাক হইয়া গেল। যাদবের ভাঙা জীর্ণ বাড়ির সম্মুখে অনেক লোক জমিয়াছে। যাদব বাহিরে আসিয়া বসিয়াছেন, পদধূলির জন্য সকলে কাড়াকাড়ি করিতেছে। সজল কণ্ঠে শ্রীনাথ করিতেছে হায় হায়।

একজন শশীকে বলিল, সামনের রথের দিন পণ্ডিত মশায় দেহ রাখবেন ছোটোবাবু।

সামনের রথের দিন? কে বললে একথা? শ্রীমুখে নিজেই বলেছেন। দূর-গাঁ থেকে লোক আসছে ছোটোবাবু, খবর পেয়ে। শেতলবাবু এই মাত্তর ঘুরে গেলেন।

ওদিক দিয়া ঘুরিয়া শশী বাড়ির ভিতের গেল। মেয়েরা দল বাঁধিয়া আসিতে শুরু করিয়াছিল, পাগলদিদি দরজা খোলেন নাই। শশীর ডাকাডাকিতে দুয়ার খুলিয়া দিলেন, কাদিয়া বলিলেন, ও শশী, এমন সর্বনাশ কেন করলি আমার, কেন রটালি ও কথা?

শশী বিবর্ণমুখে বলিল, আমি তো ওকথা রটাইনি পাগলদিদি।

পাগলদিদি বলিলেন, একদল লোক সঙ্গে নিয়ে শ্রীনাথ এসে কেদে পড়ল শশী, বলল, তুই নাকি বলেছিস ওঁর নিজের মুখে শুনে গেলি এবার রথের দিন–

এবার রথের দিন? আমি তো বলিনি পাগলদিদি। পণ্ডিতমশায় স্বীকার করলেন?

পাগলদিদি সায় দিলেন।

শশী ব্যাকুল হইয়া বলিল, কেন তা করলেন? এ কী পাগলামি! পণ্ডিতমশায় বলতে পারলেন না এবারকার রথের কথা বলেননি?

কই তা বললেন? হাসিমুখে মেনে নিলেন। কী হবে এবার?

বাহিরের কলরব ভাসিয়া আসিতেছিল, শশী দরজাটা ভেজাইয়া দিল। সমস্ত ব্যাপারটা এমন দুর্বোধ্য মনে হইতেছিল শশীর যাদবের সম্বন্ধে এরকম একটা জনরব একেবারেই বিস্ময়কর নয়, মাঝে মাঝে তার সম্বন্ধে অনেক অস্তুত কথা রটে। যাদব সমর্থন করিলেন কেন? মাথা তো খারাপ নয় যাদবের, পাগল তো তিনি নন। একদল লোক সঙ্গে করিয়া শ্রীনাথ আসিয়া কাদিয়া পড়িল, অমনি কোনো কথা বিবেচনা না করিয়া যাদব স্বীকার করিয়া বসিলেন যে আগামী রথের দিন তিনি স্বেচ্ছায় মরিবেন? এরকম স্বীকারোক্তির ফলাফলটা একবার ভাবিয়া দেখিলেন না? কে জানে কী হইবে এবার রথের দিন যাদব যদি না মরেন, মানুষের কাছে মিথ্যাবাদী হইয়া থাকিতে হইবে তাকে; তার সিদ্ধিতে, তার শক্তিতে লোকের বিশ্বাস থাকিবে না,-যাদবের কাছে তাহা মৃত্যুর চেয়ে শতগুণে ভয়ংকর মানুষের অন্ধ ভক্তি ছাড়া বাঁচিয়া থাকিবার আর তো কোনো অবলম্বন তাহার

নাই। একথা যাদব কেন স্বীকার করিয়া লইলেন? বলিলেই হইত এ শুধু জনরব, ভিত্তিহীন গুজব! যাদবের কথা কে অবিশ্বাস করিত রথের তো বেশিদিন বাকি নেই। সেদিন যাদব কেমন করিয়া মরিবেন? না মরিলে কেমন করিয়া মুখ দেখাইবেন গ্রামে?

অনেকক্ষণ পরে ক্লান্ত যাদব বিশ্রামের জন্য ভিতরে আসিলেন। কয়েকটি ভক্তও সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে আসিতেছিল, রূঢ়ভাবে ধাক্কা দিয়া তাহাএর বাহির করিয়া করিয়া কানি সদর দরজা বন্ধ করিয়া দিল। ভিড়ে, গরমে যাদব ঘামিয়া বিবর্ণ হইয়া গিয়াছেন, পাগলদিদি তাড়াতাড়ি পাখা আনিয়া বাতাস করতে লাগিলেন ফোকলা মুখের চিরন্তন হসিটি তাঁহার নিভিয়া গিয়াছে। দুচোখ-ভরা জল-বার্ধক্যের স্তিমিত দুটি চোখ।

এ কী করলেন পণ্ডিতমশায়? স্বীকার করলেন কেন? ব্যাকুলভাবে শশী জিজ্ঞাসা করিল।

কেন করলাম? রথের দিন মরব যে আমি। বলিনি তোমাকে? শান্তভাবে জবাব দিলেন যাদব।

এবারকার রথের কথা তো বলেননি আমাকে?

বলেছিলাম বইকী। এবারকার রথের কথাই বলেছিলাম। তুমি এত বিচলিত হচ্ছ কেন শশী? আমার কাছে কী জীবন-মরণের ভেদ আছে? গুরুর কৃপায় সূর্যবিজ্ঞান যেদিন আয়ত্ত হল, যেদিন সিদ্ধিলাভ করলাম, ও-পার্থক্য সেদিন ঘুচে গেছে শশী। এমনি হিসাবও যদি ধরো, মরবার বয়েস কি আমার হয়নি?

শশী কাতর হইয়া বলিল, আমার জন্যই এ কাণ্ড হল। আমার যে কীরকম লাগছে পণ্ডিতমশায়–

যাদব হাসিয়া বলিলেন, বাসাংসি জীর্ণানি…

শশীর মনে পড়িতেছিল, সেদিন রাতের কথা। কলিকাতা-ফেরত যাদব শ্রীনাথের দোকান হইতে সাপের ভয়ে যেদিন লাঠি ঠুকিয়া ঠুকিয়া বাড়ি আসিয়াছিলেন। জীবনের সেই ভীরু

মমতা কোথায় গেল যাদবের? কোথা হইতে আসিল মৃত্যু সম্বন্ধে এই প্রশান্ত ঔদাস্য? যাদবের সম্বন্ধে সে কি আগাগোড়া ভুল করিয়াছে? লোক যে অলৌকিক শক্তির কথা বলে সত্যই কি তা আছে যাদবের? খানকয়েক ডাক্তারি-বইপড়া বিদ্যায় হয়তো এসব ব্যাপারের বিচার চলে না, হয়তো তার অবিশ্বাস শুধু অজ্ঞানতার অন্ধকার!

অনেক যুক্তিতর্ক অনুরোধ উপরোধেও যাদবকে শশী কিছুঁতেই টলাইতে পারিল না। আগামী রথের কথা বলেন নাই, একথা কিছুঁতেই স্বীকার করিলেন না। শশী কোনো ক্ষতি করে নাই। কথাটা না রটিলে রথের দিন তিনি অবশ্যই দেহত্যাগ করিতেন। জনরব তুলিয়া দিয়া শশী যদি তার কোনো অসুবিধা করিয়া থাকে তা শুধু এই যে, লোক পদধূলির জন্য জ্বালাতন করিতেছে, আর কিছু নয়।

কিছুতেই এ মতলব ছাড়বেন না পণ্ডিতমশায়?

তাই কী হয় শশী? বিশ বছর আগে থেকে এ যে ঠিক হয়ে আছে।

কই পাগলদিদি তো কিছু জানতেন না?

ওকে কি বলেছি যে জানবে? সময় এগিয়ে এসেছে তাই কথায় কথায় সেদিন তোমায় বললাম। নইলে একেবারে সেই যাবার দিন বলে বিদায় নিতাম।

পিছিয়েও দিতে পারেন? তাই বলুন না সকলকে? বলুন যে আপনার অনেক কাজ বাকি, তাই ভেবেচিন্তে দু-চার বছর পিছিয়ে দিলেন দিনটা?

কথাটা বোধ হয় যাদবের মনে লাগে। উৎসুক দৃষ্টিতে তিনি শশীর মুখের দিতে চাহিয়া থাকেন, শশীর মনে হয় একটি ফাঁদে-পড়া জীবন যেন হঠাৎ বেড়ার গায়ে ছোট একটি ফাঁক দেখিতে পাইয়াছে। তারপর আত্মসম্বরণ করিয়া যাদব মাথা নাড়েন।

লোকে হাসবে শশী, টিটকারি দেবে।

বলিয়া তাড়াতাড়ি যোগ দেন, সেজন্যও নয়। যোগসাধন করে যেসব শক্তি পাওয়া যায়, ভগবানের নিয়মকে ফাঁকি দেবার জন্য তার ব্যবহার নিষেধ শশী।

একে ওকে জিজ্ঞাসা করিয়া সারাদিনের চেষ্টায় শশী কিছু কিছু বুঝিতে পারিল, বিনা প্রতিবাদে যাদব কেন জনরবকে মানিয়া লাইয়াছেন। কথাটা ছড়াইয়াছিল পল্পবিত হইয়া। ভক্তদের মধ্যে অনেকে জানিত যাদব বহুদিন হইতে শশীকে শিষ্য করিবার চেষ্টা করিতেছেন, শশীর এ সৌভাগ্যে তাহারা হিংসা করিয়াছে। কাল কুসুম নাকি ব্যস্ত ও উত্তেজিতভাবে বলিয়া বেড়াইয়াছিল যে স্নান করিয়া পাগলদিদিকে সে একবার প্রণাম করিতে গিয়াছিল, স্বকর্ণে শুনিয়া আসিয়াছে রথের দিন মরিবেন বলিয়া তাড়াতাড়ি শিষ্যত্ব গ্রহণের জন্য শশীকে যাদব পীড়াপীড়ি করিতেছেন। এসব ছাড়া আরও অনেক কথাই রটিয়াছিল। তবু, তখনও জনরবটা অস্বীকার করিবার উপায় হয়তো থাকিত যাদবের। বাজিতপুরে যাওয়ার আগে শ্রীনাথকে শশী যা বলিয়া গিয়াছিল তাহাই যাদবের সবচেয়ে বড় বিপদের কারণ হইয়াছে। শশীর কথা সহজে লোকে অবিশ্বাস করে না। তা ছাড়া, যাদবের বিশেষ প্রিয়পাত্র বলিয়াই লোকে তাহাকে জানে। তবু, শশী গ্রামে থাকিলে যাদব হয়তো স্বীকার করিবার আগে তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইতেন, বলিতেন, এরা কী বলছে শোনো শশী। কিন্তু তাকে পাওয়া যায় নাই। গ্রামে আলোড়ন তুলিয়া দিয়া সে চলিয়া গিয়াছিল, তারপর সারাজীবনের চেষ্টায় গড়িয়া তোলা মানুষের অস্বাভাবিক ভক্তি ক্ষুন্ন হইবার ভয়ে, খানিকটা এই ভক্তি বাড়ানোর লোভে যাদব জনমতের স্রোতে ভাসিয়া গিয়াছেন।

কীরকম হইয়াছিল শশী কিছু কিছু অনুমান করিতে পারে। রথের দিন মরিবার কথা শশীকে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন সেকথা যাদবের স্মরণ ছিল। শশীর কথায় গ্রামের লোক কতখানি বিশ্বাস রাখে তাও তিনি মনে রাখিয়াছিলেন। শশী গ্রামে নাই শুনিয়া ভাবিয়াছিলেন, এখন যদি অস্বীকার করেন যে আগামী রথের দিন মরিবার কথা শশীকে বলেন নাই, শশী গ্রামে ফিরিবামাত্র সকলে তাহাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করবে। হয়তো ধৈর্য ধরিতে না পারিয়া কেহ বাজিতপুরে ছুটিয়া গিয়াও শশীর সঙ্গে দেখা করিয়া আসিবে।

ব্যাপারটির গুরুত্ব শশী কিছু বুঝিতে পারবে না, একবার সে যা বলিয়াছে আবার সেই কথাই বলিবে। লোকে তখন মনে করিবে, হয় শশী মিথ্যাবাদী–নয় যাদব নিজে।

আরও কত কী হয়তো যাদব ভাবিয়াছিলেন। হয়তো জলরবের পিছনে কিরূপ এবং কতখানি শক্তি আছে বুঝিতে না পারিয়া যাদবের ভয় হইয়াছিল যে বিরোধিতা করিলে জীবন অপেক্ষা যাহা তার প্রিয় তাহা বিনষ্ট হইয়া যাইবে। হয়তো সমবেত মানুষগুলির উচ্ছ্বাস নেশার মতো আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছিল যাদবকে। ভাববার তাহার সময় থাকে নাই।

শশী কুসুমকে বলিল, মিথ্যে কথাগুলো বলে বেড়ালে কেন বউ?

কুসুম বলিল, বলতে কেমন ইচ্ছে হচ্ছিল ছোটোবাবু, তাই।

মাথাটা তোমার খারাপ নাকি সময় সময় তাই ভাবি বউ, অবাক মানুষ তুমি।

কয়েকটা দিন চলিয়া গেল। কলিযুগের ইচ্ছামৃত্যু মহাপুরুষ যাদবকে দেখিবার জন্য নিকট ও দূরবর্তী গ্রামের লোক কায়েতপাড়ার পথটিকে জনাকুল করিয়া রাখল। মুড়িচিড়া বেচিয়া শ্রীনাথ আর লোচন ময়রা বোধ হয় বড়লোকই হইয়া গেল। শ্রীনাথ দু হাতে মুড়ি-চিড়া বেচে, দু হাতে পয়সা লইয়া কাঠের বাক্সে রাখে, সর্বক্ষণ হায় হায় করে। কয়েক দিনে পাগলদিদি শীর্ণ হইয়া গেলেন। শশীর মনেও গুরুভার চাপিয়া আছে। রথের দিন কী হইবে সে বুঝিতে পারে না। সত্যই কি মনের জোরে যাদব সেদিন দেহত্যাগ করিতে পারবেন? এ যে বিশ্বাস করা যায় না। না মরিলেই বা যাদবের কী অবস্থা হইবে?

যেখানে যায় শশী, এই কথাই আলোচিত হইতে শুনিতে পায়। যাদব মরিবেন বলিয়া অনেকেরই আপসোস নাই, সংগ্রহে রথের দিনটির প্রতীক্ষা করিতেছে। শশীকে চুপ করিয়া থাকিতে হয়। মিথ্যার ভিত্তিতে যে এতবড় ব্যাপারটা গড়িয়াছে, মুখ ফুটিয়া প্রকাশ করিবার উপায় নাই। এই জনমতের উৎস সে, কিন্তু এ গুজবকে পরিবর্তিত করিবার ক্ষমতা তাহার নাই। এই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হইতে শুকনো চালে আগুন ধরিয়াছে, কারো ক্ষমতা নাই আগুন নিভাইতে পারে। একটা অদ্ভুত অসহায়তার উপলব্ধি হয় শশীর। প্রাত্যহিক জীবনে

যাদবের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকে না মানুষের, তাদের সমবেত মতামত যে কতদূর অনিবার্য একটা অন্ধ নির্মম শক্তি হইয়া উঠিতে পারে, আজ সে তাহা প্রথম বুঝিতে পারে।

যাদবের বাড়ি গিয়া শশী বসে, যাদবের ভাব লক্ষ করে। মনে হয় কী একটা তীব্র নেশায় যাদব আচ্ছন্ন, অভিভূত হইয়া গিয়াছেন। ব্যাপারটা যেন তার কাছে ক্রমে ক্রমে পরম উপভোগ্য হইয়া উঠিতেছে। বিশ্রাম করিতে কিছুক্ষণের জন্য ভিতরে আসেন, তারপর আবার বাহিরে গিয়া দর্শনার্থীদের সামনে বসেন, মুখ দিয়া ফোয়ারার মতো ধর্ম ও দর্শন, যোগসাধনার কথা বাহির হয়,-সেসব অপূর্ব বাণী শুনিয়া শশী অবাক মানে। কী এক অত্যাশ্চর্য প্রেরণা যেন আসিয়াছে যাদবের। মুখের উপদেশ শুনিয়া অভিভূত হইয়া যাইতে হয়, এক অপরূপ আনন্দে অন্তর ভরিয়া যায়, এক অনায়ত্ত অধ্যাত্মজগতে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য ব্যাকুলতা জাগে অপরিসীম।

পাগলদিদি কাতরকণ্ঠে বলেন, এ কী হল শশী?

শশী চুপচাপ ভাবে। একদিন সে যাদবকে বলে, পণ্ডিতমশায়, রথের দিন আমাদের ছেড়ে যাবেন যদি ঠিক করেই থাকেন, এখানে থেকে কী করবেন? পুরী চলে যান না? রথের আসল উৎসব হয় সেখানে, এখানে তো কিছুই নেই। বাবুদের রথ সবচেয়ে বড়, তাও তিন হাতের বেশি উঁচু হবে না। আপনার পুরী যাওয়াই উচিত।

যাদবের যেন চমক ভাঙে।--পুরী যেতে বলছ?

শশীর ভয় যে পুরী যাইতে বলার আসল অর্থ যাদব হয়তো বুঝতে পারেন নাই। কত ভাবিয়া যাদবের সমস্যার এই সমাথা ন সে আবিষ্কার করিয়ারেছ। পুরী যান না যান যাদব, এতবড় দেশটা পড়িয়া আছে, পুরী যাওয়ার নাম করিয়া যেখানে খুশি তিনি চলিয়া যাইতে পারেন, বাস করিতে পারেন অজানা দেশে অচেনা মানুষের মধ্যে, রথের দিন না মরিলেও যেখানে তাহার লজ্জা নাই। স্পষ্ট করিয়া যাদবকে কথাটা বুঝাইয়া বলা যায় না। ভান তো যাদব শশীর কাছেও বজায় রাখিয়াছে। সে ইঙ্গিতে বলে—জিনিসপত্র নিয়ে পাগলদিদিকে সঙ্গে করে পুরই চলে যান পণ্ডিতমশায়,-গাঁয়ের লোক হৈচৈ করে যে কষ্টটা

আপনাকে দিচ্ছে! শেষ সময়টা স্বস্তি পাচ্ছেন না। সেখানে কেউ আপনার নাগাল পাবে না।

পাগলদিদি মেঝেতে এলাইয়া পড়িয়া ছিলেন, সহসা উঠিয়া বসেন। যাদব সবিস্ময়ে চাহিয়া থাকেন শশীর দিকে। শশী আবার ইঙ্গিতে বলে, পুরী যাবার নাম করে বেরিয়ে পড়ুন। তারপর পুরীই যে আপনাকে যেতে হবে তার তো কোনো মানে নেই? অন্য কোনো তীর্থে যেতে চান, পথে মত বদলে তাই যাবেন। অচেনা লোকের মধ্যে শেষ কটা দিন শান্তিতে কাটিয়ে দিতে পারবেন। গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ে শশী, -বেয়াড়া গাঁয়ের লোকের হাত থেকে আপনার রেহাই পাবার আর তো কোনো পথ দেখতে পাই না।

কী বলছ শশী? শেষকালে পালিয়ে যাব?-যাদব বলেন।

পালিয়ে কেন? তীর্থে যাবেন।-বলে শশী।

যাদব কী ভাবেন কে জানে, দপ্ করিয়া জ্বলিয়া ওঠেন আগুনের মতো। রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলেন-আমার সঙ্গে তুমি পরিহাস করছ শশী, ঠাট্টা জুড়েছ। আমি ভণ্ডামি আরম্ভ করেছি ভেবে নিয়েছ, না? কোনোদিন আমাকে তুমি বিশ্বাস করনি, চিরকাল ভেবে এসেছ সব ভড়ং,-লোক ঠকিয়ে আমি জীবন কাটিয়েছি! দুপাতা ইংরেজি পড়ে সবজান্তা হয়ে হয়ে উঠেছ, এসব তুমি কী বুঝবে? কী তুমি জানো যোগসাধনের? তুমি তো ম্লেচ্ছাচারী নাস্তিক। স্নেহ করি বলে কখনও কিছু বলিনি তোমাকে-উপদেশ দিয়ে ধর্মের কথা বলে বরং চেষ্টাই করেছি যাতে তোমার মতিগতি ফেরে। আসল শয়তান বাস করে তোমার মধ্যে, আমার সাধ্য কি কিছু করি তোমার জন্যে। যাও বাপু তুমি সামনে থেকে আমার, তোমার মুখ দেখলে পাপ হয়।

কে জানিত শশীকে যাদব এমন করিয়া বকিতে পারেন!

এ জগতে পাগলদিদির পর সে-ই যে তার সবচেয়ে স্নেহের পাত্র!

মুখ দেখিলে পাপ হয়! ম্লেচ্ছাচারী, নাস্তিক মরণ অথবা অপযশের মধ্যে একটা যাকে বাছিয়া লইতে হইবে কদিনের মধ্যে, তাকে বাঁচিবার উপায় বলিয়া দিতে যাওয়ার কী অপরূপ পুরস্কার! যাদবের তিরস্কারে শশী ছেলেমানুষের দুঃখে অভিমানে কাতর হইয়া থাকে।

তবে কি যাদব সত্যিই রথের দিন দেহত্যাগ করবেন? মৃত্যুর ওই দিনটি যে তাহার নির্ধারিত হইয়া আছে, যোগের শক্তিতে বহুদিন হইতেই যাদব তবে তাহা জানিয়া রাখিয়াছিলেন? তা যদি হয় তবে সন্দেহ নাই যে সে মেচ্ছাচারী নাস্তিক। এখন তো তাহার বিশ্বাস হয় না যে মানুষ নিজের ইচ্ছায় মরিতেও পারে, মরিবার আগে জানিতে পারে কবে মরণ হবে।

বিশ্বাস হয় না, তবু শশীর মনের আড়ালে লুকানো গ্রাম্য কুসংস্কার নাড়া খাইয়াছে। এক এক সময় তাহার মনে হয়, হয়তো আছে, বাধা যুক্তির অতিরিক্ত কিছু হয়তো আছে জগতে, যাদব আর যাদবের মতো মানুষেরা যার সন্ধান রাখেন। দলে দলে লোক আসিয়া যে যাদবের পায়ে লুটাইয়া পড়িতেছে, এদের সকলেরই বিশ্বাস কি মিথ্যা? সাধারণ মানুষের চেয়ে অতিরিক্ত কিছু যদি নাই থাকে যাদবের মধ্যে, এতগুলি লোক কি অকারণে এমনি পাগল হইয়া উঠিয়াছে? দশ-বারো ক্রোশ দূরবর্তী গ্রাম হইতে সপরিবারে গৃহস্থ আসিয়াছে, বাসা বাঁধিয়া আছে গাছতলায়। কত নরনারীর চোখে শশী জল পড়িতে দেখিয়াছে। কায়েতপাড়ার পথে নামিয়া দাঁড়াইলেই মনে হয় এ যেন তীর্থ। সকল বয়সের যে-সমস্ত নরনারী এদিক-ওদিক বিচরণ করিতেছে, প্রাত্যহিক জীবনে হিংসা-দ্বেষ স্বার্থপরতার সঞ্চিত গ্লানি তারা পিছনে ফেলিয়া আসিয়াছে; ভুলিয়া গিয়াছে পার্থিব সুখের কামনা, লাভের হিসাব। হয়তো সাময়িক, ফিরিয়া গিয়া সম্পূর্ণ জীবনের কদর্যতায় আবার সকলে মুখ গুড়িয়া দিবে, তবু ওদের মুখের উৎসুক একাগ্রতা আজ তো মুগ্ধ করিয়া দেয়।

সকলে যাদবকে লইয়া ব্যাপৃত থাকায় শশীর সঙ্গে দেখা করার সুবিধা হইয়াছে কুসুমের। সে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলে, মুখ এত শুকনো কেন?

মনটা ভালো নেই বউ।

ওমা, কী হল মনের?

শশী বিরক্ত হইয়া বলে, তোমার কাছে অত কৈফিয়ত দিতে পারব না বউ।

কুসুম সগর্বে মাথা তুলিয়া বলে, কৈফিয়ত কেউ চায়নি আপনার কাছে। মুখ শুকনে দেখে মায়া হল, তাই জানতে এলাম অসুখবিসুখ হয়েছে না কি। সংসারে জানেন, ছোটোবাবু, যেচে মায়া করতে গেলে পদে পদে অপমান হতে হয়। আমি এদিকে চলে যাচ্ছি বাপের বাড়ি, কৈফিয়ত চাইব!

শশী নরম হইয়া বলে, গাঁয়ে এতবড় ব্যাপার ঘটছে, দেখা হলে ও-বিষয়ে তুমি কিছুই বলো না,–শুধু আমার তোমার নিজের কথা। বলবার কি আর কথা নেই জগতে?

নেই? কত আজেবাজে কথা আছে, সীমা নেই তার।

বলিয়া কুসুম হাসে। শশী বলে, হালকা ভাবটা একটু কমাও বউ। বাপের বাড়ি যাবে তো শুনছি ঢের দিন থেকে, যাওয়া তো হল না।

কুসুম সপ্রতিভভাবেই বলে, যেতে যে পারি না।

তারপর বলে, যেসব মজার কাণ্ড গাঁয়ে। সত্তর বছরের একটা বুড়ো মরবে, তাই নিয়ে দশটা গাঁয়ের লোক হৈ হৈ করছে। বেঁচে থাকলে আরও কত দেখব!

কুসুমের এ ধরনের কথাবার্তা শশীর যে খুব ভালো লাগিল তা নয়, তবু একা একা ভাবিতে ভাবিতে মনের মধ্যে যে বদ্ধ আবহাওয়ার সৃষ্টি হইয়াছিল, খানিকট খোলা বায়ু আসিয়া তা যেন কিছু হালকা করিয়া দিল। তাই বটে। এত সে বিচলিত হইয়াছে কেন একটা গ্রাম্য ব্যাপারে? মরেন, তো মরিবেন যাদব, তার কী আসিয়া যায়? দুদিন পরে এ গাঁয়ে বাস করিবার স্মৃতিটুকু মনে আনিবার সময়ও কি থাকিবে তাহার?

বিকালে সেদিন শ্রীনাথ আসিয়া শশীকে ডাকিয়া গেল। পরদিন আসিলেন পাগলদিদি স্বয়ং। না গিয়া শশীর উপায় থাকিল না।

পাগলদিদি বলিলেন, তীর্থে যাবার কথা তো বলে এলি ভাই, গিয়ে কী হবে? দল বেঁধে গাঁয়ের লোক সঙ্গে যাবে। এতলোক দিনরাত পাহারা দিচ্ছে, সকলের নজর এড়িয়ে পালাব কোথা?

একটু যেন গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়াছেন পাগলদিদি, কোনোদিকে আশার আলো দেখিতে পাইছেন কি-না কে জানে। মুখখানা খুব বিষন্ন কিন্তু শান্ত, ভয় ও উদ্বেগের ছাপটা গিয়াছে। চলিতে চলিতে বলেলেন, পালিয়ে গিয়েই বা কী হবে বলো? ক বছর আর বাঁচিব। বিদেশে নতুন লোকের মধ্যে কত কষ্ট হবে, মনে একটা আপসোসও থাকবে। অমন করে দুটো একটা বছর বেশি বেঁচে থেকে সুখটা কী হবে, তাই ভাবে। তার চেয়ে এভাবে যাওয়া ঢের বেশি গৌরবের।

শশী বলিল, কিন্তু নিজের ইচ্ছায় যখন খুশি কেউ কি যেতে পারে দিদি?

ও যে সিদ্ধিলাভ করেছে পাগল। ওর অসাধ্য কিছু আছে?

পাগলদিদি বোধহয় লুকাইয়া আসিয়াছিলেন, তাহাকে দেখিবামাত্র একদল নরনারী আসিয়া ছাঁকিয়া ধরিল। শশীর সঙ্গে অতি কষ্টে বাড়িতে ঢুকিয়া তিনি দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। ভিড় পাগলদিদির সহ্য হয় না। তাহাকে দেখিবার জন্যও জনতা চেঁচামেচি করে কিন্তু তিনি কখনও বাহিরে আসেন না। তেল সিঁদুর হাতে করিয়া মেয়েরা তাহার রুদ্ধ দরজার সম্মুখ হইতে ফিরিয়া যায়।

যাদব ভিতরে আসিয়া বলিলেন, শশী এসেছ? সেদিন একটু বকেছিলাম বলে রাগ করে কদিন আর দেখাই দিলে না ভাই! তোমার কথা ভাবছিলাম শশী কত ক্ষতি করে গিয়েছিলে সেদিন, তোমার সে ধারণা নেই, মায়ার বশে কুপরামর্শ দিয়ে গেলে, থেকে থেকে কথাটা বিমনা করে দিয়েছে, সহজে তুচ্ছ তো করতে পারি না তোমার কথা।

অনেক কথা বলেন যাদব; তিনি তো চলিলেন, পাগলদিদিকে শশী যেন দেখাশোনা করে। এতকাল অসুখবিসুখ হইলে সূর্যবিজ্ঞানের জোরে আরোগ্য তিনিই করিয়াছেন, এবার হয়তো শশীর ওষুধ খাইতে হইবে। -শিখলে পারতে শশী সূর্যবিজ্ঞান। বামুনের ছেলে নও, মন্ত্রশিষ্য তোমাকে করতে পারি না, বিদ্যেটা শিখিয়ে দিতে পারতাম। শিখবে? যাদব হাসিলেন।–আর তো শেখবার সময় নেই শশী!

রথের দুদিন আগে খুব বৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল। সেদিনও সকালের দিকে কখনও গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়িল, কখনও মেঘলা করিয়া রহিল। আগের দিন সন্ধ্যা হইতে সংকীর্তন আরম্ভ হইয়াছিল, সারারাত্রি একমুহূর্ত বিরাম হয় নাই। সকালবেলা নূতন নূতন লোক আসিয়া দল ভারী করিয়াছে, কীর্তন আরও জাকিয়া উঠিয়াছে। যাদব স্নান করিয়া পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়াছেন, সকালে ফুলের মালায় তাহাকে সাজাইয়াছে। পাগলদিদিও আজ রেহাই পান নাই, তার গলাতেও উঠিয়াছে অনেকগুলি ফুলের মালা। তবে তেল সিঁদুর দেয়া সধবারা বন্ধ করিয়াছে। আজ যার বৈধব্যয়যোগ তাকে ওসব আর দেয়া যায় না। বেলা বাড়িবার সঙ্গে যাদবের বাড়ির সামনে আর কায়েতপাড়ার পথে লোকে লোকারণ্য হইয়া উঠিল। গাওদিয়া, সাতগাঁ আর উখার গ্রামের একদল ছেলে ভলান্টিয়ার হইয়া কাজ করিতেছে, উৎসাহ তাদেরই বেশি। বাঁশ বাঁধিয়া দর্শনার্থী মেয়ে-পুরুষের পথ পৃথক করি দেওয়া হইয়াছে। ভাঙা দাওয়ায় যাদবের বসিবার আসন। অঙ্গনে কয়েকটা চৌকি ফেলিয়া গ্রামের মাতব্বরেরা বসিয়াছেন। তাদের হুঁকা টানা ও আলাপ-আলোচনার ভঙ্গি উৎসব-বাড়ির মতো। যেন বিবাহ উপনয়ন সম্পন্ন করাইতে আসিয়াছেন। শীতলবাবু ও বিমলবাবু সকালে একবার আসিয়াছিলেন, দুপুরে আবার আসিলেন। বাবুদের বাড়ির মেয়েরা আসিলেন অপরাহ্ণে। যাদব এবং পাগলদিদির তখন মুমূর্ষ অবস্থা।

শশী আগাগোড়া দুজনকে লক্ষ করিয়াছিল। বেলা এগারোটার পর হইতে দুইজনেই ধীরে ধীরে নিস্তেজ ও নিদ্রাতুর হইয়া আসিতেছেন দেখিয়া, মনের মধ্যে তাহার আরম্ভ হইয়াছিল তোলপাড়। আরও খানিকক্ষণ পরে শশীর দিকে ঢুলঢুল চোখ মেলিয়া একবারমাত্র চাহিয়া যাদব এক অদ্ভুত হাসি হাসিয়াছিলেন, পাগল দিদি তখন চোখ

বুজিয়াছেন। যাদবের মুখ ঢাকিয়া গিয়াছিল চটচটে ঘামে আর কালিমায়, চোখের তারা দুটি সংকুচিত হইয়া আসিয়াছিল। তিন-চার হাজার ব্যগ্র উত্তেজিত লোকের মধ্যে ডাক্তার শুধু শশী একা, সে শিহরিয়া উঠিয়াছিল। তবু পলক ফেলিতে পারে নাই। যাদব ও পাগলদিদির দেহে পরিচিত মৃত্যুর পরিচিত লক্ষণগুলির আবির্ভাব একে একে দেখিয়াছিল।

সকলে যখন টের পাইল যাদবের সঙ্গে পাগলদিদিও পরলোকে চলিয়াছেন, যাদবের আগেই হয়তো তাহার শেষ নিশ্বাস পড়িবে, চারিদিকে নূতন করিয়া একটা হৈচৈ পড়িয়া গেল। ছেলে-বুড়ো স্ত্রী-পুরুষ একেবারে যেন খেপিয়া উঠিল! ভলান্টিয়ারদের চেষ্টায় এতক্ষণ সকলের দর্শন ও প্রণাম শৃঙ্খলাবদ্ধভাবেই চলিতেছিল, এবার আর কাহাকেও সংযত করা গেল না। যাদব আর পাগলদিদি বুঝি পিষিয়াই যান ভিড়ে। পাগলদিদির দুটি পা ঢাকিয়া গেল সিঁদুরে।

তারপর ছেলেদের চেষ্টায় জনতা ঠেকাইবার ব্যবস্থা হইলে শয্যা রচনা করিয়া পাশাপাশি দুজনকে শোয়োনো হল। কায়েতপাড়ার সংকীর্ণ পথে কোনোবার রথ চলে নাই, শীতলবাবুর হুকুমে বেলা প্রায় তিনটার সময় বাবুদের রথটি অনেক চেষ্টায় যাদবের গৃহের সম্মুখে পর্যন্ত টানিয়া আনা হইল। পাগলদিদিকে কোনোমতে চোখ মেলানো গেল না, যাদব কষ্টে চোখ মেলিয়া একবার চাহিলেন। চোখের তারাদুটি এখন তাহার আরও ছোট হইয়া গিয়াছে।

তারপর যাদবও আর সাড়াশব্দ দিলেন ন। সকলে বলিল, সমাধি। পাগলদিদি মারা গেলেন ঘণ্টাখানেক পরে, ঠিক সময়টি কেহ ধরিতে পারিল না। একটি ব্রাহ্মণ সধবা গঙ্গাজলে মুখের ফেনা ধুইয়া দিলেন। যাদবের শেষ নিশ্বাস পড়িল গোধূলিবেলায়।

শশীর স্পর্শ করিবার অধিকার নাই! তফাত হইতে সে ব্যাকুলভাবে বলিল—ওঁর মুখে কেউ গঙ্গাজল দিন।

সত্যি-মিথ্যায় জড়ানো জগৎ। মিথ্যারও মহত্ত্ব আছে। হাজার হাজার মানুষকে পাগল করিয়া দিতে পারে মিথ্যার মোহ। চিরকালের জন্য সত্য হইয়াও থাকিতে পারে মিথ্যা। যারা যাদব ও পাগলদিদির পদধূলি মাথায় তুলিয়া ধন্য হইয়াছিল, তাদের মধ্যে কে দুজনের মৃত্যুরহস্য অনুমান করিতে পরিবে? চিরদিনের জন্য এ ঘটনা মনে গাঁথা রহিল, এক অপূর্ব অপার্থিব দৃশ্যের স্মৃতি। দুঃখযন্ত্রণার সময় একথা মনে পড়িবে। জীবন রুক্ষ নীরস হইয়া উঠিলে এ আশা করিবার সাহস থাকিবে যে, খুঁজিলে এমন কিছুও পাওয়া যায় জগতে, বাঁচিয়া থাকার চেয়ে যা বড়। শোক, দুঃখ, জীবনের অসহ্য ক্লান্তি—এসব তো তুচ্ছ, মরণকে পর্যন্ত মানুষ মনের জোরে জয় করিতে পারে। কত সংকীর্ণ দুর্বল চিত্তে যে যাদব বৃহতের জন্য, মৃদু হোক, প্রবল হোক, ব্যাকুলতা জাগাইয়া রাখিয়া গিয়াছেন, শশী তাই ভাবে। যখন ভাবে, তখন আপিমের ক্রিয়ায় যাদবের চামড়া ঢাকিয়া চটচটে ঘাম, বিন্দুর মতো ছোটো হইয়া আসা চোখের তারকে আর মুখে ফেনা উঠিবার কথা সে ভুলিয়া যায়।

বর্ষা আসিয়াছে। খালে জল বাড়িল, ডোবা-পুকুর ভরিয়া উঠিল। চারিদিকে কাদা, ভাঙা পথে কোথাও যাওয়া মুশকিল। পালকি-বেহারাদের পা কাদায় ডুবিয়া যায়, ধীরে ধীরে চলিতে হয়। এমনি বৃষ্টিবাদলার মধ্যে একদিন কুসুমের বাবা মেয়েকে লইয়া আসিল। সেইদিন তালপুকুরের ধারে কুসুম কেমন করিয়া পড়িয়া গেল সে-ই জানে। বলিল, কোমরে চোট লাগিয়াছে আর হাতটা গিয়াছে ভাঙিয়া।

কী করে যাব তোমার সঙ্গে? আমি তো যেতে পারব না বাবা! পুজোর সময় এসে আমারয় নিয়ে যেয়ো।

কুসুমের বাবা অত্যন্ত আপসোস করিয়া বলিল, কতকাল যাওয়া হয়নি, তোর মা কাঁদাকাটা করেন কুসি। দুটো দিন বরং দেখে যাই, ব্যথাটা যদি কমে।

কুসুম বলিল, দু-চার দিনে এ ব্যথা কি কমবে বাবা? কোমরের ব্যথায় নড়তে পারি না। হাড়-টাড় কিছু ভেঙেছে নাকি কে জানে!

হাতটা সত্যই মচকাইয়া গিয়াছিল। শশী আসিয়া পরীক্ষা করিবার সময় এক ফাঁকে জিজ্ঞাসা করিল, ইচ্ছে করে পড়নি তো বউ?

কী যে বলেন ছোটোবাবু! ইচ্ছে করে পড়ে কেউ কোমর ভাঙে?

হাতে তবে তোমার কিছু হয়নি, শুধু কোমর ভেঙেছে, না?

হাতও ভেঙেছে।–কুসুম বলিল।

শশী হাতটা নাড়িয়া চাড়িয়া বলিল, কই, বেশি ফোলেনি তো?

কুসুম রাগিয়া বলিল, আবার কী ফুলবে ছোটোবাবু, ফুলে কি ঢোল হবে?

পরদিন দুপুরবেলা আকাশ-ঢাকা মেঘে চারিদিকে অন্ধকার হইয়া আসিয়াছিল। শশী বসিয়া ছিল নিজের ঘরে। গ্রামান্তরে রোগী দেখিতে যাইবার কথা ছিল, মেঘ দেখিয়া বাহির হয় নাই। নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে জোরে বৃষ্টি নামিয়া আসিল। পরক্ষণে আসিল কুসুম। হাতের ব্যথা সহিতে না পারিয়া ওষুধ লইতে আসিয়াছে।

শশী বলিল, হাতে এমন কী ব্যথা হল যে, এ বৃষ্টি মাথায় করে ওষুধ নিতে এলে? এলেই বা কী করে? কোমর না তোমার ভেঙে গেছে?

কুসুম অস্পষ্টভাবে বলিল, কষ্ট করে এলাম।

কেন তা এল? বিকেলে আমিই তো যেতাম।

সইতে পারি না ছোটোবাবু।

এবার শশী একটু বিবর্ণ হইয়া গেল। চিরকাল এমনভাবে চলিবে না সে জানিত, একদিন ছেলেখেলায় আর কুলাইবে না। তবু এমন বাদলায় কুসুম বোঝাপড়া করিতে আসিল? কুসুমকে দোষ দেওয়া যায় না। ভাসা-ভাসা হালকা ভাবের আড়াল দিয়া এই দিনটিকে

এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা বড় নির্মম। কুসুম যে এতদিন সহ্য করিয়াছে তাই আশ্চর্য। যাই থাক তার মনে, কুসুমের কী আসিয়া যায়? সে কেন চিরকাল তার ভীরু নীরবতাকে প্রশ্রয় দিয়া যাইবে? দীর্ঘকাল ধরিয়া কুসুমের প্রতি নিজের অন্যায় ব্যবহার মনে করিয়া শশীর লজ্জা বোধ হইল।

মৃদুস্বরে সে বলিল, কিছু মনে কোরো না বউ, আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল।

কুসুম কথা বলিল না, শশী যেন তাতে আরও বিবর্ণ হইয়া গেল। জানালা দিয়ে ঘরে ছাট আসিতেছিল। উঠিয়া জানালাটা বন্ধ করিয়া এতক্ষণে সে হঠাৎ অত্যন্ত বেখাপ্পা ভদ্রতা করিয়া বলিল, বোসো না বউ, বোসো ওইখানে।

কুসুম বসিল এবং বসিয়া যেন বাঁচিল। শশী আরও মৃদুস্বরে বলিল, অনেক দিন থেকে তোমায় কটা কথা বলব ভাবছিলাম বউ। বলি বলি করে বলতে পারিনি। বলা কিন্তু দরকার,–নয়? আমরা ছেলেমানুষ নই, ইচ্ছে হলেই একটা কাজ কি আমরা করতে পারি? সুঝে-বুঝে কাজ করা দরকার। এই তো দ্যাখো পরাণ আমার বন্ধু, উপকার করতে গিয়ে চিরকাল শুধু অপকারই করেছি। তবু, তাও আমি গ্রাহ্য করতাম না বউ। এই বৃষ্টিতে তুমি এলে, তোমার কাছে সরে বসতে না পেরে আমার যা কষ্ট হচ্ছে, কারো মুখ চেয়ে আমি তা সইতাম না। কিন্তু আমি গাঁয়েই থাকব না বউ। আজ বাদে কাল চলে যাব বিদেশে, আর কখনও ফিরব না। এরকম অবস্থায় একটু মনের জোর করে–

কুসুম হঠাৎ মুখ তুলিয়া বলিল, হাতে ব্যথা বলে ওষুধ নিতে এলাম, এসব আমাকে কি শোনাচ্ছেন?

শশী থতমথত খাইয়া গেল। তারপর শুদ্ধস্বরে বলিল, কী বললে? ওষুধ নিতে এসেছ?

হাতটার ব্যথা সইতে পারি না ছোটোবাবু।

শশী স্নানমুখে বলিল, হাতের ব্যথার ওষুধ তো জানি না বউ। মালিশের ওষুধ যা দিয়ে এসেছি তাই মালিশ করো গে।-কী করে যাবে এই বৃষ্টিতে?

কী করে এলাম?—বলিয়া কুসুম দরজা খুলিয়া বৃষ্টির মধ্যে নামিয়া গেল। চলন দেখিয়া মনে হইল না কাল সে কোমরে চোট খাইয়া শয্যাগত ছিল। শশীর মনে বর্ষার মতো বিষন্নতা ঘনাইয়া আসে। কুসুম শেষে এমন দুর্বোধ্য হইয়া উঠিল! সে কত আশা করিয়াছিল কুসুম ধীর শান্তভাবে তার সমস্ত কথা শুনিবে, সমস্ত বুঝিতে পারবে। কোথাও একটুকু না-বোঝার কিছু না-থাকায় তাদের দুজনের করো মনে দুঃখ থাকিবে না, অভিমান থাকিবে না, লজ্জাও থাকিবে না। বোঝাপড়া শেষ হইবে গভীর অন্তরঙ্গতায়,-নিবিড় সহানুভূতিতে। তার বদলে এ কী হইল? ভাবিয়া ভাবিয়া শশীর মনে হইল, গ্রাম্য মন কুসুমের, কিছু তার বুঝিবার ক্ষমতা নাই।

পরদিন পরাণের কাছে সে খবর পাইল, কুসুমের হাত আর কোমরের ব্যথা কমিয়াছে, কাল সে বাপের বাড়ি যাইবে।

কদিন থাকবে বাপের বাড়ি?

বলছে তো পুজো পেরিয়ে আসবে। কদিন থাকে এখন।

তোমার কষ্ট হবে পরাণ।-শশী বলিল।

পরাণ গম্ভীরমুখে বলিল, কিসের কষ্ট, দুবেলা ভাত দুটো মা-ই ফুটিয়ে দিতে পারবে। ভেবেচিন্তে আমিই একরকম পাঠাচ্ছি ছোটোবাবু। বাপের বাড়ি যেতে না পেলে মেয়েমানুষের মাথা বিগড়ে যায়।

রাত্রে কিছু ঠিক ছিল না, ভোর রাত্রে গোবর্ধন এবং আরও দুজন মাঝিকে তুলিয়া শশী বাজিতপুরে যাইবে বলিয়া বাহির হইয়া পড়িল। একা বাজিতপুর যাইতে বড় নৌকা সে ব্যবহার করে না, ছোট নৌকোয় গোবর্ধন একাই তাহাকে লইয়া যায়। আজ তাহার বড়ো

নৌকাটির প্রয়োজন হইল কেন কেহ বুঝিতে পারিল না। বিছানা পাতিয়া, জলের কুঁজো, বাড়ির তৈরি খাবার ভরা টিফিন ক্যারিয়ার, এক ডালা পাকা আম, চায়ের সরঞ্জাম, ওষুধের ব্যাগ প্রভৃতি নৌকায় তুলিয়া গোবর্ধন সব ঠিক করিয়া ফেলিল। শশী কিন্তু নৌকা খুলিল না। তীরে দাঁড়াইয়া টানিতে লাগিল সিগারেট।

রোদ উঠিবার পর কুসুমের ডুলি আসিল ঘাটে। সঙ্গে অনন্ত আর পরাণ। শশীকে দেখিয়া পরাণ বলিল, ছোটোবাবু যে এখানে?

শশী বলিল, বাজিতপুর যাব পরাণ। তোমাদের জন্য দাঁড়িয়ে ছিলাম। তোমাদের ও ছোট নৌকায় এদের দিয়ে কাজ নেই, বাজিতপুর পর্যন্ত আমার নৌকায় চলো। সেখানে ভালো দেখে একটা নৌকা ঠিক করে দেব।

তাই হোক। কারো আপত্তি নাই।

পরাণকে ধরিয়া কুসুম শশীর নৌকায় উঠিল। তার তোরঙ্গ, বোঁচকা ও অন্য সব জিনিস তোলা হইলে শশী বলিল, তুমি ছইয়ের মধ্যে বিছানায় বসবে যাও বউ। সামনের দিকে এগিয়ে বসো, তাহলে চাদ্দিক দেখে যেতে পারবে।

৯. নৌকার দোলনে দুলিয়া

নৌকার দোলনে দুলিয়া চুলিয়া কুসুমের বাবার ঘুম আসে। কুসুম ছইয়ের মধ্যে পিছনে হালের দিকে তাহার শোবার ব্যবস্থা করিয়া দিল। সে ঘুমাইয়া পড়িলে শশীকে ডাকিয়া বলিল, হঠাৎ আমাকে বাপের বাড়ি পৌঁছে দেবার শখ হল কেন শুনি?

বলিয়া মৃদু হাসিল কুসুম।

শশী বলিল, তুমি ভাবছ কাজ নেই, না? তোমার জন্য যাচ্ছি শুধু? উকিলের সঙ্গে দেখা করব।

মামলা আছে বুঝি?

মামলা তো দুটো-একটা লেগেই আছে, সেজন্য নয়। কী কারণে যেতে লিখেছেন, জরুরি। তবে আজ না-গেলেও চলত।

কুসুম একটু হাসিল।

আড়চোখে একবার বাপের দিকে চাহিয়া কুসুম বলিল, আমার জন্য এলেন আজ, না?

শশী বলিল, হ্যা।

গভীর সুখে কুসুমের মুখখানা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তবু নিশ্বাস ফেলিয়া দুঃখের সঙ্গেই বলিল, ভেবেছিলাম বাপের বাড়ি গিয়ে কমাস থাকব, তা আর হবে না বুঝতে পারছি।

আশ্চর্য চরিত্র কুসুমের! এতক্ষণে শশী একটু লজ্জা বোধ করিলা সেদিন রহস্য সৃষ্টি করে নাই কুসুম। ওরকম বাঁকা তার মনের কথা বলিবার ধরন। সে কিছু বুঝিবে না, কিছু মানিবে না। কেন ভাবিয়া মরে শশী? সেদিন কুসুমের ব্যবহারের মানে ছিল শুধু এই। আর

এক বিষয়ে শশী বিস্মিত হয়! সেদিন সে গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার কথা বলিয়াছিল। সে সম্বন্ধে কুসুমের কি বলিবার কিছু নাই? কথাটা সে বিশ্বাস করে নাই নাকি?

বাজিতপুরের ঘাটে নৌকা বাঁধিয়া শশী নামিয়া গেল। গোবর্ধনকে বলিয়া দিল, কুসুমকে বাপের বাড়ি পৌঁছাইয়া দিয়া বিকালে যেন নৌকা আনিয়া ঘাটে রাখে।

বাজিতপুরের সিনিয়র উকিল রামতারণবাবুর কাছে মকদ্দমা উপলক্ষে শশীকে মাঝে মাঝে আসিতে হয়, এবারেও দেখা করিবার জন্য দিনতিনেক আগে তার একখানা চিঠি পাইয়া শশীর কোনো অসাধারণ প্রত্যাশা জাগে নাই। ব্যাপার শুনিয়া খানিকক্ষণ তাই সে বিস্ময়ে হতবাক হইয়া রহিল। দশটা গ্রামকে বিচলিত ও উত্তেজিত করিয়া যাদব মরিয়াছেন, কিন্তু আরও যে চমক তিনি সঞ্চিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন সকলের জন্য, শশী তো তাহা ভাবিতেও পারে নাই।

গ্রামে একটি হাসপাতাল করার জন্য যা-কিছু ছিল যাদবের, সব তিনি দান করিয়া গিয়াছেন। ব্যবস্থার ভার শশীর, দায়িত্ব শশীর।

কী ছিল যাদবের? হাসপাতাল করার উপযুক্ত দান হিসাবে অত্যধিক কিছু নয়, যাদবের দান হিসাবে বিস্ময়কর, প্রচুর। হাজার পনেরো টাকার কোম্পানির কাগজ, বারো-তেরো হাজার নগদ, আর যেখানে যাদব বাস করিতেন সেই বাড়ি ও জমি। এত টাকা ছিল যাদবের? পুরানো ভাঙা বাড়িটার সাতস্যাতে ঘরে যাদব ও পাগলদিদির সাদাসিধে ঘরকন্নার ছবি শশীর মনে পড়িতে লাগিল, ক-খানা বাসন, মাটির হাড়িকলসি, কাঠের জীর্ণ সিন্দুক-গৃহসজ্জার অভাবজনিত দীনতা। তাও অপূর্ব ছিল সত্য,- সে ঘরের পরিচ্ছন্নতা, ধূপগন্ধী শান্ত আবহাওয়া চিরদিন শশীকে অভিভূত করিয়াছে, কিন্তু টাকার ছাপ তো কোথাও ছিল না সেই গৃহী সন্ন্যাসীর গৃহে!

রামতারণের বয়স হইয়াছে। আদালতে যাওয়া তিনি অনেক কমাইয়া ফেলিয়াছেন। ভোর চারটেয় উঠিয়া আহ্নিক করিতে বসেন,-মানুষটা ধার্মিক। বলিলেন, স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করবেন এরকম একটা খবর কানে এসেছিল, গুজব বলে বিশ্বাস করিনি। নইলে একবার

দেখতে যেতাম। এখন আপসোস হয়। কতবার পায়ের ধূলো দিয়েছেন, এর বড়ো মহাপুরুষ ছিলেন জানলে পরকালের কিছু কাজ করে নিতাম। এসেছেন গিয়েছেন, টেরও পাইনি কী জিনিস ছিল তার মধ্যে।

শশী বলিল, অনেকে সিদ্ধপুরুষ বলত।

তাই ছিলেন। এমন আত্মগোপন করে থাকতেন, বুঝবার কোনো উপায় ছিল না। আগে যদি জানতাম!

অনেক কথা হয়, অনেক আলোচনা, অনেক পরামর্শ। রামতারণের ছেলে, জামাই, মুহুরি, আমলারা চারিদিকে ঘিরিয়া আসিয় স্তব্ধ বিস্ময়ে শশীর কথা শুনিয়া যায়। যাদবের দেহত্যাগের বর্ণনা শুনিতে শুনিতে রামতারণ আবেগের সঙ্গে বলেন, মরছে সবাই, অমন মরণ হয় কজনের? অসুখ নেই বিসুখ নাই, ইচ্ছা হল আর দেহ ছেড়ে আত্মা অনন্তে মিশিয়া গেল। তোমার ডাক্তারি শাস্ত্রে একে কী বলে শশী?

কী বলবে? কিছুই বলে না।

রামতারণ আরও আবেগের সঙ্গে বলেন, কোথেকে বলবে? ভারতবর্ষ ছাড়া জগতের কোথায় আছে এ জ্ঞান? ভাবলেই গায়ে কাটা দিয়ে ওঠে। দুপাতা ইংরেজি পড়ে এসব আমরা অবিশ্বাস করি, ফাকি বলে উড়িয়ে দিই-কই এবার বলুক দেখি কেউ কোথায় এতটুকু ফাকি ছিল? নিজে তুমি ডাক্তার মানুষ আগাগোড়া দাড়িয়ে সব দেখেছ। যাও শশী, সমস্ত বিবরণটা লিখে কাগজে ছাপিয়ে দাও, পড়ে মতিগতি একটু ফিরুক মানুষের।

অল্পবয়স হইতে এ-বাড়িতে শশীর আনাগোনা আছে। দুপুরে খাওয়াদাওয়া করিয়া এখানেই সে বিশ্রাম করিল। মৃত্যুর কয়েকদিন আগে শহরে আসিয়া যাদব শেষ উইল করিয়া গিয়াছিলেন। প্রাণ ও মন বাঁচানোর জন্য পালানোর পরামর্শ দিয়া যেদিন শশী তার বকুনি শুনিয়াছিল, তারও পরে। মরিবার জন্য যাদব হয়তো সেই সময়েই মনস্থির করিয়াছিলেন, তার আগে বোধহয় নয়! শশী আজ সব বুঝিতে পারে। যেরকম অপূর্ব ও

লোভনীয় হইয়া উঠিয়াছিল মরণ, মানুষ কি সে লোভ ছাড়িতে পারে? নিজে দাঁড়াইয়া সব সে দেখিয়াছিল আগাগোড়া, মরণ এবং কারণ চিরদিনের জন্য তারই মনে গাঁথা হইয়া রহিল।

তাকে জড়াইয়া গেলেন কেন? সে স্লেচ্ছ নাস্তিক, শেষপর্যন্ত সে অবিশ্বাস করিয়া আসিয়াছে যাদবের অলৌকিক শক্তিতে; তবু হাসপাতাল করার ব্যাপারে তারই হাতে সমস্ত কর্তৃত্ব ছাড়িয়া দিয়া গেলেন। তাকে বিশ্বাসী করার জন্য কী ব্যাকুলতা ছিল যাদবের, শশীর সে কথা মনে পড়ে। মানুষটার চরিত্রের কত আশ্চর্য দিক যে একে একে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে থাকে। এই উইলের বিষয় তাকে কিছু না-জানানো, এও এক অসাধারণত্ব যাদবের। জানাইয়া গেলে ভার গ্রহণ করিতে সে অস্বীকার করিতে পারিত না, তবু যে যাদব জানান নাই তার কারণ হয়তো আর কিছুই নয়,-এতগুলি টাকা তার অধিকারে রাখিয়া যাওয়ার জন্য যদি তার সহজ ব্যবহারের ব্যতিক্রম হয়? কৃতজ্ঞতায় হোক আর যে কারণেই হোক, মন-রাখা কথা যদি শশী বলে? শেষ কয়েকটা দিনে তার যোগসাধনার ক্ষমতায় শশীর বিশ্বাস জন্মিলে যদি বুঝিতে না পারা যায় ও-বিশ্বাস স্বতোৎসারিত, এর পিছনে আর কোনো পার্থিব বিবেচনার প্রেরণা নাই?

বিকালে গোবর্ধন আসিল। গ্রামে ফিরিতে হইয়া গেল রাত। শশীর কাছে সমস্ত কথা শুনিয়া বিস্ময়াবিষ্ট গোপাল বলিল, এত টাকা লোকটা পেল কোথায় রে, এ্যা?

বড়লোকের ছেলে ছিলেন বোধ হয়।

ওয়ারিশ থাকিলে খবর পেয়ে তারা বোধহয় গোলমাল করবে শশী, মামলা মোকদমা না করে ছাড়বে না সহজে। তুই না বিপদে পড়িস শেষে।

আমার কিসের বিপদ? আমাকে তো দেননি টাকা! এসব উইল সহজে ওলটায় না।

গোপাল অকারণে গলা নিচু করিয়া বলিল, কারো কাছে হিসাবনিকাশ দিতে হবে না তোকে?

শশী বলিল, টাকাপয়সার ব্যাপার হিসাবনিকাশ থাকবে না? তবে আমাকে কৈফিয়ত দিতে হবে না কারো কাছে। আমার খুশিমতো তিনজন ভদ্রলোককে বেছে নিয়ে কমিটি করব, তারা শুধু আমাকে পরামর্শ দেবেন,–সববিষয়ে কর্তৃত্ব থাকবে আমার।

এত খাটবি-খুটবি, তুই কিছু পাবি না শশী?

হাসপাতালের ডাক্তার হিসাবে ইচ্ছা করলে কিছু মাইনে নিতে পারব।

সমস্ত রাত ভাবিয়া পরদিন গোপাল বলিল, দ্যাখ শশী, তুই ছেলেমানুষ, এসব গোলমেলে ব্যাপারে তোর থেকে কাজ নেই,–এসব নিয়ে থাকলে ডাক্তারি করবি কখন? হাঙ্গামা তো সহজ নয়! তার চেয়ে আমার হাতে ছেড়ে দে সব, আমি সব ব্যবস্থা করব। গাঁয়ের হাসপাতাল হবে, এতসব বয়স্ক বিচক্ষণ লোক থাকতে সব ব্যাপারে ছেলেমানুষ তুই তোর কর্তৃত্ব থাকলে সকলে চটে যাবে শশী, শত্রুতা করে সব পক্ষ করে দেবে। তুই সরে দাঁড়া।

শশী বলিল, তা হয় না।

হয় না? কেন হয় না শুনি? তুই বুঝি অবিশ্বাস করিস আমাকে?

শশী এবার বিরক্ত হইয়া বলিল, অবিশ্বাসের কথা কোথা থেকে আসে? আর কারোকে ভার দেবার অধিকার নেই। আমি দায়িত্ব না নিলে গভর্নমেন্টের হাতে চলে যাবে।

গোপাল বোধহয় কথাটা বিশ্বাস করিল না। পরদিন সে চলিয়া গেল বাজিতপুর। ফিরিয়া আসিয়া বলিল, উইলটা দেখে এলাম শশী। সব দায়িত্ব তোকে নিতে হবে, কিন্তু কাজের কনট্রাক্ট তুই যাকে খুশি দিতে পারিস, তাতে কোনো বাধা নেই। তাই দে আমাকে। এজেন্ট করে নে আমায়।

শশী বলিল, কোথাও কিছু নেই, আগে থেকে আপনি এত ব্যস্ত হয়ে পড়লেন কেন?

গোপাল বলিল, ব্যস্ত কি হই সাধে? তুই ছেলেমানুষ, কী করতে কী করে বসবি–

আপনার সঙ্গে পরামর্শ করেই করব।

একজন সৎকাজে যথাসর্বস্ব দান করিয়া গিয়াছে, আর একজন তাতে কিছু ভাগ বসাইতে চায়। কিছু ভালো লাগে না শশীর। অসংখ্য দুর্ভাবনা ঘনাইয়া আসে। এদিকে অবিশ্রাম বর্ষা নামিয়াছে। তাও অসহ্য। গ্রাম! কী শ্রীহীন কদার্য প্রকৃতির এই লীলাভূমি বর্ষার নির্মল বারিপাতে গলিয়া হইল পাক, পচিয়া হইল দুর্গন্ধ। পালানোর দিন আরও কতকাল পিছাইয়া গেল কে জানে। কুসুম ফিরিবার আগে গ্রাম ছাড়িতে পারিলে হইত। আর সে উপায় নেই! দেশে এত গণ্যমান্য লোক থাকিতে যাদব শেষে এমন বিপদে ফেলিয়া গেলেন তাহাকেই।

যাদবের মহামৃত্যুর উত্তেজনা এখনো কাটিয়া যায় নাই, উইলের খবরটা প্রকাশ পাওয়া মাত্র আর একদফা উত্তেজনার প্রবাহ বহিয়া গেল। শীতলবাবু শশীকে ডাকিয়া সব শুনিলেন, বলিলেন, পণ্ডিতমশাই বলে এবং তিনি স্বর্গীয় বলে শশী, নইলে, আমি থাকতে আমার গায়ে আমাকে ডিঙিয়ে হাসপাতাল দেবার স্পর্ধা কখনও সইতাম না। তা শোনো তোমার ফান্ডে আমি হাজার টাকা চাঁদা দেব।

শশীর ফান্ড! টাকাগুলি যাদব যেন শশীর কল্যাণেই দান করিয়া গিয়াছেন। গ্রামের মান্যবরেরাও সদলে শশীর কাছে যাতায়াত শুরু করিলেন। শীতলবাবুর মতো মনে সকলের আঘাত লাগিয়াছে। এতসব ধনী নামি বয়স্ক লোক থাকিতে এতবড় একটা ব্যাপারের সম্পূর্ণ ভার শশীকে দিয়া গেলেন, কী বিস্ময়ের কাণ্ড যাদবের কী অপমান সকলের অপমান বোধ করিয়াও তাহারা কিন্তু থাকিতে পারলেন না দূরে, শশীকে ছকিয়া ধরিলেন। তিনজনের বদলে অযাচিতভাবে পরামর্শদাতা ত্রিশজন সভ্যের কমিটিই যেন গড়িয়া উঠিল শশীকে ঘিরিয়া। আর গোপাল অবিরত ছেলের কানে মন্ত্র জপিতে লাগিল, পারবি না শশী তুই, পারবি না,-আমায় ছেড়ে দে সব।

যাদবের ভাঙা ঘরের চাবি গ্রামের জমিদার হিসাবে শীতলবাবুর কাছে জমা ছিল। একদিন দেখা গেল তালা ভাঙিয়া ঘরের জিনিসপত্র কে তছনছ করিয়াছে, এখানে ওখানে শাবল

দিয়া করিয়াছে গভীর গর্ত। ঘটিবাটি কয়েকটি যায় নাই দেখিয়া বোঝা গেল ঘরে ছ্যাঁচড়া চোর আসে নাই, আসিয়াছিল কল্পনাপ্রবণ অনুসন্ধিৎসু,-গুপ্তধনের সন্ধানে।

শ্রীনাথ চেঁচাইয়া বলিতে লাগিল, মরবে ব্যাটারা, মরবে।-যে হাত দিয়া শাবল ধরেছিল খসে খসে পড়বে ব্যাটাদের।

আইনঘটিত হাঙ্গামাগুলি সহজে মিটিল না। সাধারণের উপকারার্থে দান করা অর্থের উপর একজন যুবকের অধিকার, উইলে স্পষ্ট লেখা থাকিলেও, আইনের চোখে কেমন কটু ঠেকিতে লাগিল। কোন পক্ষ হইতে ঠিক বোঝা গেল না, সম্ভবত আকাশ ফুড়িয়া গোপাল দাসের ছেলেটার পকেটে এতগুলি টাকা আসিবার সম্ভাবনায় গায়ে যাদের ধরিয়া গিয়াছিল জ্বালা, তাদের পক্ষ হইতেই তদ্‌বিরের ফলে, উইলের কয়েকটা গলদ বাহির করিয়া উইল বাতিল করার চেষ্টাও হইল হইল। অনুসন্ধান হইল অনেক, শশী বাজিতপুরে ছুটাছুটি করিল অনেকবার, উইলের সাক্ষীদের অনেক জেরা করা হইল, তারপর বেওয়ারিশ যাদবের অর্থ ও সম্পত্তি দিয়া গাওদিয়া হাসপাতাল করিবার অধিকার শশী পাইল। কমিটি গঠন করিবার সময় শশী পড়িল আর এক বিপদে কাকে রাখিয়া কাকে আহবান করিবে? উইলে নির্দেশ আছে মান্যগণ্য তিনজন বয়স্ক ভদ্রলোক। মান্যগণ্য ভদ্রলোকের অভাব নাই, কিন্তু শশী যাদের মানে, কমিটিতে আসিলে শশীকে তারা মানিবেন না, শশীর যারা অনুগত তারা আসিলে অনুগতেরা অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিবে। শীতলবাবুকে অনুরোধ করিতে তিনি অস্বীকার করিলেন, রাগও করিলেন। শশী কর্তালি করিবে, গ্রামের জমিদার, তিনি শুধু দিবেন পরামর্শ? স্পর্ধা বটে শশীর।

শশী সবিনয়ে বলিল, আমি কেন, আপনিই সব বিষয়ে হেড থাকিবেন।

উইলে তো কই তা লেখেনি বাপু?

অবস্থা বিবেচনা করিয়া শশী তখন বলিল, তবে থাকে, ব্যস্ত মানুষ আপনি, এসব হাঙ্গামায় আপনার থেকে কাজ নেই। হাসপাতাল হলে যে স্থায়ী কমিটি হবে আপনাকে তো তার

প্রেসিডেন্ট হতেই হবে। মাঝে মাঝে আমি আসব, উপদেশ নিয়ে যাব আপনার। আপনি সহায় না থাকলে এতবড় ব্যাপার আমি কেন সামলাতে পারব বলুন?

প্রেসিডেন্ট হতে হবে নাকি আমায়?

আপনি থাকতে আর কে প্রেসিডেন্ট হবে?–শশী যেন আশ্চর্য হইয়া গেল।

তখন প্রীত হইয়া শীতল শশীকে খাতির করিয়া বসাইলেন, হুকুম দিলেন জলখাবার আনিবার। বলিলেন, আর কে কে থাকিবে কমিটিতে?

শশী বলিল, কাকে নিয়ে সুবিধা হয় আপনিই যদি তা বলে দিতেন–

শীতল বলিলেন, আমাদের মুনসেফকে নাও না, উখারার সত্যহরিবাবুকে? আইনজ্ঞ মানুষ।

শশী বলিল, বলব ওঁকে। তা হলে দুজন হল–আপনি আর সত্যহরিবাবু। আরও একজন চাই। সাতগাঁর হেডমাস্টার কেশববাবুকে নিলে কেমন হয়?

এমন কৌশলে শীতলকে বশ করিতে পারায় এবার সহজেই যথারীতি কমিটি গঠিত হইল। শীতলের গৃহে সভ্যেরা একত্র হইয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন। মতান্তরের যে আশঙ্কা শশীর ছিল, দেখা গেল সেটা প্রায় অমূলক। মতান্তরের ভয়টা তার চেয়ে ওঁদেরও কম নয়। বিনয় ও নম্রতার মধ্যেও কোনো বিষয়ে শশীর দৃঢ়তা উকি দিলে শীতলও সে বিষয়ে আর প্রতিবাদ করেন না, সংঘর্ষ বাঁচাইয়া চলেন। সত্যহরি ও কেশৰ বৃদ্ধ, অত্যন্ত নিরীহ মানুষ। ঠিক হইল, ফল্ড খুলিয়া চাদা তোলা হইবে, যাদবের ভাঙা বাড়ি ও জমি বেচিয়া সাতগাঁ, উখরা ও গাওদিয়ার সংযোগস্থলে হাসপাতালের জন্য জমি কেনা হইবে। শীতলের সভাপতিত্বে একদিন গ্রামে একটা সভা হইয়া গেল। সভায় নিজের বক্তৃতা শুনিয়া নিজেই শশী হইয়া গেল অবাক। কে জানিত সে এমন সুন্দর বলিতে পারে। সভায় যথেষ্ট উৎসাহ ও উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল বটে কিন্তু শেষের দিকে হঠাৎ মুষলধারে বৃষ্টি

নামায় উত্তেজনা একটু নরম হইয়া আসিল। ছেলেরা চাদরের প্রান্ত ধরিয়া অর্থ সংগ্রহের জন্য সভায় ঘুরিতে আরম্ভ করা মাত্র মেঘের অজুহাতে অনেকে বাড়িও চলিয়া গেল।

প্রথমে অনেক ভয়-ভাবনা ছিল, এখন শশীর মন উৎসাহে ভরিয়া উঠিয়াছে। বড় কিছু করিবার যে আগ্রহ চাপা পড়িয়া তাহাকে উতলা করিয়া তুলিয়াছিল, তারই যেন একটা মুক্তি হঠাৎ তাহার জুটিয়া গিয়াছে। সারাদিন জলকাদায় ছুটাছুটি করিয়া হিসাবের খাতাপত্র বগলে বাড়ি ফিরিয়া সে গভীর শ্রান্তি ও নিবিড় তৃপ্তি অনুভব করে। জীবনে নতুনত্ব আসিয়াছে, বৈচিত্র্য আসিয়াছে। যাদবের কাছে সে বোধ করে কৃতজ্ঞতা। তার সম্বন্ধে গ্রামবাসীর মনে যে দ্রুত পরিবর্তন আসিতেছে তাতেও শশী এক উত্তেজনাময় আনন্দের স্বাদ পায়। এতদিন সে ছিল ডাক্তার, এবার যেন আপন হইতে ছোটখাটো একটি নেতা হইয়া উঠিতেছে। কাজের মানুষ বলিয়া গ্রামের ছেলেরা শশীকে এতদিন এড়াইয়া চলিত, এবার দল বাঁধিয়া আসিয়া কাজের নামে হৈচৈ করার সুযোগ প্রার্থন করিতেছে শশীর কাছে।-এই বর্ষায় গায়ে গায়ে শশীর নির্দেশমতো সকলে তাহারা চাঁদা সংগ্রহ করিতে ছুটিয়া গেল উখারায় পাশের গ্রামে কিসের সভা হইবে, ডাক আসিল শশীর কিছু বলা চাই। শুধু তাই নয়, গ্রামের সামাজিক ব্যাপারের জটলায় জীবনে এবার প্রথম ছেলেমানুষ শশীর আহবান হইল, সে গিয়া না-পৌঁছানো পর্যন্ত সভার কাজ স্থগিতও রাখা হইল। যারা বয়স্ক, শশীর বয়স যেন তারা ভুলিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু সামাজিক ব্যাপারে শশী যোগ দিল না। সে জানে এ শুধু বার্ধক্যের অস্থায়ী আবেগ, যৌবনের সঙ্গে দুদিনের অন্ধ সন্ধি। আজ যে ইকা ও কাশির শব্দে মুখরিত সভায় তাকে সম্মানের আসন দেওয়া হইবে, কাল সেখানে তার জুটিবে টিটকরি!

এদিকে গেপাল কেমন যেন মুষড়াইয়া গেল। হাসপাতাল-সংক্রান্ত কোনো ব্যাপারে শশী যে তাকে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার দিল না তা যেন তাকে গভীরভাবে আঘাত করিল। উদ্ধত প্রকৃতি গোপালের, অভিমানী মন। শশী তার একমাত্র ছেলে। তার কাছে এমন ব্যবহার গোপাল কল্পনা করিতে পারিত না। মাঝে মাঝে সে অবাক হইয়া শশীর দিকে চাহিয়া থাকে, কিছু যেন বুঝিতে পারে না। ছেলের মনেও শ্রদ্ধা বজায় রাখিতে হইলে

নিজের জীবনকে যে বাপের পর্যন্ত শ্রদ্ধার উপযুক্ত করিয়া রাখতে হয় এ শিক্ষা গোপালের ছিল না। অদৃষ্টকে দোষারোপ করিয়া সে তাই মনে-মনে হায় হায় করে। অনুতাপও যেন আসে গোপালের। মাঝে মাঝে সে ভাবে যে, যত অন্যায় করিয়াছে জীবনে এই তার শাস্তি!

একদিন সে শশীকে বলিল, জানিস শশী, অনেক পাপে ভগবান আমাকে তোর মতো ছেলে দিয়েছেন। তোর এত মহত্ত্ব কিসের তা কি আমি আর কিছু বুঝি না ভাবিস। আমার সঙ্গে রেষারেষি করিস তুই, আমাকে লজ্জা দেবার জন্য ন্যায়বান সেজে থাকিস!—মহত্ত্ব! বাপ পাপিষ্ঠ, উনি মহৎ লজ্জা করে না শশী তোর?

গোপালের মুখ দেখিয়া শশী একটু ভীতভাবে বলিল, আপনাকে আমি কখনও সমালোচনা করিনি বাবা।

অবিশ্বাস তো করিস।

শশী মৃদুস্বরে বলিল, কিছু বোঝেন না, যা-তা ভেবে রাগ করেন। এতে বিশ্বাসঅবিশ্বাসের কথা তো কিছুই নেই। আপনি যা বলেছিলেন তা যদি করতাম, লোকে বলত না বাপ-ব্যাটায় মিলে হাসপাতালের টাকা লুটছে?

কথাটা সাময়িকভাবে গোপালের কানে লাগে। তবে গোপালের অভিযোগ তো শুধু যাদবের টাকাগুলি নাড়াচাড়া করার অধিকার হইতে বঞ্চিত হওয়ার জন্য নয়। যত দিন যাইতেছে সে টের পাইতেছে, শশীর মনে, শশীর জীবনে তার স্থান আসিতেছে সংকুচিত হইয়া। শশী যে তাকে শুধু শ্রদ্ধা করে না তা নয়, সেজন্য আপসোসও যেন শশীর নাই। এইটুকুই গোপালকে পাগল করিয়া দিতে চায়।

গোপাল কত কী ভাবে। রাত্রে তার ঘুম হয় না। মাঝরাত্রে ঘুম ভাঙিয়া শশী তাহার তামাক টানার শব্দ শুনিতে পায়। সামান্য একটু সুবিধার জন্য মানুষের জীবন নষ্ট করিয়া যে মানুষটার একমুহূর্তের জন্য কখনও অনুতাপ হয় নাই, গভীর ও অপরূপ এক হীনতা

থাকার জন্য যার কঠোর কর্মঠ প্রকৃতি শুধু নিষ্ঠুতায় গড়া; শশী কি তাকে ভাবপ্রবণ করিয়া তুলিল? সেনদিদির কাধে হাত রাখিয়া সে যখন শ্রান্ত গলায় বলে, জনিস সরোজ, ছেলেমেয়ের কাছ থেকে একদিনের তরে সুখ পেলাম না-তখন কাছে উপস্থিত থাকিলে শশী বোধ হয় চমকিয়া যাইত। সেনদিদির কাধে হাত রাখিবার জন্য নয়, গোপালের মুখ দেখিয়া, গলার স্বর শুনিয়া। হয়তো সে বুঝিতেও পারিত কত দুঃখে কানা সেনদিদির কাছে গোপাল আজ সান্তনা খুঁজিয়া মরে।

একদিন গোপাল একেবারে পাঁচশত টাকা শশীর হাতে তুলিয়া দিল।

কিসের টাকা?

হাসপাতাল ফন্ডে আমি দিলাম শশী।

শশী বলিল, মোটে পাঁচশো লোকে কী বলবে বাবা?

কী আশা করিয়াছিল গোপাল, কী বলিল শশী! নোটগুলি গোপাল ছিনাইয়া লইল, আগুন হইয়া বলিল, কত দেব তবে? লাখ টাকা? দেব না যা এক পয়সা আমি!

শশীকে ঘিরিয়া যখন এমনি গোলমাল চলিতেছে একদিন আসিল কুসুম, কয়েক দিন পরে আসিল মতির খবর।

১০. মতির কথা

মতির কথা গোড়া হইতে বলি।

রাজপুত্র প্রবীরকে স্বামী হিসাবে পাইয়া মতির সুখের সীমা নাই। গ্রাম ছাড়িতে চোখে জল আসে, অজানা ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া একটা রহস্যময় ভীতি বুক চাপিয়া ধরে, তবু আহ্লাদে মেয়েটা মনে মনে যেন গলিয়া গেল। এইটুকু বয়সে এমন উপভোগ্য মনকেমন-করা! স্টিমার ছাড়িলে জেটিতে দাঁড়ানো পরাণকে ঘোমটার ফাঁকে দেখিতে দেখিতে ভিতরটা যখন তোলপাড় করিতে লাগিল আর চোখের জল সব ঝাপসা হইয়া গেল, রাজপুত্র প্রবীর পাশে বসিয়া আছে অনুভব করার মধ্যেই তখন কী উত্তেজনা, কী আশ্বাস!

কলিকাতায় পৌঁছিয়া আগে সে যে এবার কুমুদের খোজেই কলিকাতা আসিয়াছিল, মতি সে বিষয়ে কিছুই বলিল না। প্রথম এই শহরটা দেখাইয়া কুমুদ তাহাকে থ বানাইয়া দিতে চায় বুঝিয়া মতি যথোচিত থ-ই বনিয়া গেল। একটু বোকার মতো কথা বলিতে লাগিল মতি, এটা কী ওটা কী জিজ্ঞাসা করিয়া কুমুদকে অস্থির ও আনন্দিত করিয়া তুলিল-কী অনিন্দ মতির বানানো উচ্ছ্বাস!

কোথায় উঠব আমরা?

হোটেলে উঠব। কদিন হোটেলে থেকে, তোমায় সব দেখিয়ে শুনিয়া বাসা-টাসা যদি করি তো করব, নয় তো বেড়াতে চলে যাব কোথাও। কেমন?

তাই হোক। যা-খুশি ব্যবস্থা করুক কুমুদ, মতির কোনো আপত্তি নাই! নতুন বউ সে, স্বামী এখন যেমন রাখিবে তেমনি থাকিবে, তারপর সংসার পাতিয়া দিলে তখন শুরু হইবে গৃহিণীপনা। এখন তাহার কিসের দায়িত্ব, কিসের ভাবনা? নিজের সৌভাগ্যে মতি পুলকিত হইয়া থাকে। গায়ের কোন মেয়ে তার মতো এমন ভাগ্যবতী মনের মতো বরের সঙ্গে তো বিবাহ হয়ই না, শ্বশুরবাড়ি গিয়া প্রথমে ঘোমটা দিয়া ঘরের কোণে বসিয়া থাকে, তারপর

বাসন মাজে, ঘর লেপে, রান্না করে আর গালাগালি খায়! কত ভয়, কত ভাবনা, কত তারা পরাধীন। আর তার নিজের পছন্দ-করা বর, বিবাহের পরেই এমন স্ফূর্তি করিয়া বেড়ানো, সব বিষয়ে স্বাধীনতা। হোটেলের ঘরখানা মতির পছন্দই হইল। রাস্তার দিকে দুটি জানালা আছে, ঝুঁকিলে দুদিকে অনেক দূর অবধি দেখা যায়। ঠিক সামনে একটা ছোট গলি সোজা গিয়া পড়িয়াছে ওদিকের বড় রাস্তায়! সেখানে ট্রাম চলে। কুমুদের সাহায্যে বিছানা পাতিয়া মতি ঘর গুছাইয়া ফেলিল! হোটেলের চাকরদের দিয়া দুটি একটি দরকারি জিনিস আনানো হইল। তারপর মতি সাবান মাখিয়া স্নান করিয়া আসিল, স্নানের ঘরের বন্ধ দরজার সামনে কুমুদের প্রহরী হইয়া দাঁড়াইয়া থাকা কী মজার ব্যাপার! হোটেলের বুড়ো উড়িয়া বামুন,-বেঁটে লিকলিকে বাদামি রঙের মানুষ সে, কিন্তু কথায় কাজে চটপটে ঘরে ভাত দিয়া গেল। নিজের থালায় ভাতের পরিমাণ দেখিয়া মতি বলিল, মাগো, কত ভাত দিয়েছে দ্যাখো আমাকে আমার মতো সাতটার কুলিয়ে যাবে যে!

মেসে হোটেলে এমনি দেয়।

নষ্ট হবে তো? ডেকে বলো না তুলে নিয়ে যাক?

হোক না নষ্ট, আমাদের কী?

তবু মতির মন খুঁতখুঁত করিতে লাগিল। আহা, ভাত যে লক্ষ্মী, ভাত কি নষ্ট করতে আছে। খাইতে খাইতে আবার সে আপসোস করিল। কুমুদ বলিল, তুমি তো আচ্ছা মেয়ে দেখছি। একটা তুচ্ছ কথা নিয়ে এত ভাবছ? খাত নষ্ট হবে তাও হোটেলের ভাত, এ আবার মানুষের মনে আসে?

খাওয়াদাওয়ার পর সিগারেট টানিতে টানিতে কুমুদ ঘুমাইয়া পড়িল। জ্বলন্ত সিগারেটটা তার প্রসারিত হাত হইতে মেঝেতে খসিয়া পড়িলে মতি সেটা কুড়াইয়া নিভাইয়া তুলিয়া রাখিল। অর্ধেকও পোড়ে নাই সিগারেটটা, ঘুম হইতে উঠিয়া কুমুদ আবার খাইতে পরিবে। তারপর গাড়ির কষ্টে মতিরও ঘুম আসিতে লাগিল। চৌকিতে কুমুদ এমনভাবে গা এলাইয়া শুইয়াছে যে পাশে জায়গা খুব কম। নতুন বউ সে, বরের পাশে শোয়াই তো

নিয়ম, না? নিয়ম বজায় রাখিতে না পারিয়া মতি দুঃখিত মনে মেঝেতে একটা কম্বল বিছাইয়া শুইয়া পড়িল। তিনটার সময় ঘুম ভাঙল কুমুদের। মুখহাত ধুইয়া জামা-কাপড় পরিয়া সে মতিকে ডাকিয়া তুলিল। বলিল, দরজা দিয়ে বসো, আমি একটু বাইরে যাচ্ছি। কটা জিনিস কিনেই ফিরে আসব।

কুমুদ বাহির হইয়া গেলে মতি দরজায় খিল বন্ধ করিল। মিনিট পনেরো পরেই দরজায় ঘা পড়িতে খিল খুলিয়া সে বলিল, এর মধ্যে ফিরে এলে?

কিন্তু ও তো কুমুদ নয় কুড়ি-বাইশ বছরের চশমা-পরা একটা ছেলে মতিকে দেখিয়া সেও যেন অবাক হইয়া গেল। ঘরের ভিতর একবার চোখ বুলাইয়া আনিয়া বলিল, এঘরে আমার একজন বন্ধু থাকত। ঘর ছেড়ে চলে গেছে জানতাম না।

মতি কিছু বলিতে পারিল না।

পরশু দিন দেখে গেলাম আছে, এর মধ্যে সে গেল কোথায়?

কেমন যেন চোখ ছেলেটার, কেমন তাকানোর ভঙ্গি। মতির ইচ্ছা হইতেছিল দরজাটা দড়াম করিয়া বন্ধ করিয়া দেয়। কিন্তু ওর বন্ধু যদি এ-ঘর থেকে উধাও হইয়া গিয়া থাকে, দু-চারটে কথা জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার হয়তো ওর আছে। মতির ভয় করিতেছিল, জড়ানো গলায় সে বলিল, আমরা মোটে আজ সকালে এসেছি।

এমন সময়ে হাঠাত ম্যানেজার আসিয়া হাজির। বোধ হয় পাশেই কোন মেম্বারের ঘরে ছিল।

কাকে খোঁজেন? এদিকে আসুন মশায়, সরে আসুন।

মতি দরজাটা এবার বন্ধ করিল। শুনিল ছেলেটা বলিতেছে, শ্যামলবাবুকে খুঁজছি।

শ্যামলবাবুকে? শ্যামলবাবু তেতলায় গেছেন একুশ লম্বরে। তার ঘরেই তো দেখলাম মশায় আপনাকে এতক্ষণ? ব্যাপারখানা কী বলুন দেখি সারা দুপুরটা শ্যামলবাবুর সঙ্গে আড্ডা দিয়ে এখানে তাকে খুঁজতে এসেছেন?

মতি বুঝিতে পারিল, আশেপাশের ঘর হইতে দু-চারজন লোক বাহির হইয়া আসিয়াছে। একটা গোলমাল আরম্ভ হইয়া গেল। রুদ্ধ ঘরের ভিতরে মতি লজ্জায় ভয়ে কাঠ হইয়া রহিল। কোন দেশী ব্যাপার এসব? কী মতলব ছিল ছেলেটার? এ কেমন জায়গায় কুমুদ তাহাকে একা ফেলিয়া রাখিয়া গেল?

একটু পরে গোলমালটা দূরে সরিয়া গিয়া অস্পষ্ট হইয়া আসিল, তারপর একেবারে থামিয়া গেল। ঘন্টাখানেক পরে দরজায় আবার ঘা পড়িতে মতির বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিল, কে? হোটেলের চাকর জানিতে আসিয়াছে কিছু দরকার আছে কি-না। মতি বলেল, না কোনো দরকার নেই!

কুমুদ ফিরিয়া আসিল সন্ধ্যার পর।

কুমুদকে ব্যাপারটা বলিবার সময় মতির ভয় করিতে লাগিল যে, শুনিয়া হয়তো সে রাগিয়া অনর্থ করবে, খুন করিয়াই ফেলিতে চাহিবে সেই দুর্বত্ত ছেলেটাকে। কুমুদ কিন্তু শুধু একটু হাসিল। বলিল, ছেলেটা তো চালাক কম নয়!

চালাক পাজি নয়, শয়তান, নয়, লক্ষ্মীছাড়া নয়, শুধু চালাক?

এমন ভয় করছিল আমার! মতি বলিল।

কুমুদ বলিল, কিসের ভয়? খেয়ে তো ফেলত না। এত লোক রয়েছে চারিদিকে, ছল করে তোমার সঙ্গে কথা বলে যাওয়ার বেশি সাহস কী আর হত ছোড়ার। হয়তো কার সঙ্গে বাজি-টাজি রেখেছিল, তোমার সঙ্গে কথা বলবে। অল্পবয়সের পাগলামি ওসব।

হয়তো তাই, তবু কুমুদ কেন তাহা বরদাস্ত করিবে? মনে মনে মতি বড় ক্ষুন্ন হইয়া গেল। শশী হইলে হয়তো এরকম হাসিয়া উড়াইয়া দিত না ব্যাপারটা, ছড়ি হাতে ছোঁড়াটাকে ঘা-কতক বসাইয়া দিয়া আসিত। মতির হঠাৎ মনে হয় কুমুদের এ যেন ভীরুতা। ব্যাপারটা সে হালকা করিয়া চাপা দিতে চায়, তার কারণ আর কিছুই নয়, যদি গুরুতর হইয়া ওঠে, যদি তার কোনো অসুবিধা বা ক্ষতি হয়, কুমুদের এই আশঙ্কা আছে। ছোট ছোট অপমান কি কুমুদ তবে হাঙ্গামার ভয়ে গ্রাহ্য করে না? এ বিষয়ে সে কি গাওদিয়ার কীর্তি নিয়োগীর মতো?

মতির জন্য কুমুদ একজোড়া জুতা কিনিয়া আনিয়াছিল। বিবাহের পর মতিকে এই তার প্রথম উপহার।

একে একে এই হোটেলেই সাতদিন কাটিয়া গেল! এর মধ্যে মতিকে কুমুদ একদিন দেখাইল সিনেমা আর একদিন লইয়া গেল গঙ্গাতীরে বেড়াইতে। কত কী সে বলিয়াছিল। ঘুরিয়া ঘুরিয়া শহর দেখাইবে, আজ সিনেমা, কাল থিয়েটার করিয়া বেড়াইবে, গৃহকোণে মুখোমুখি বসিয়া থাকিবে কপোত-কপোতীর মতো। সেসব সংকল্প কোথায় গেল কুমুদের? তার অপরিমেয় আলস্যপ্রিয়তায় মতি অবাক হইয়া থাকে। কোথাও লইয়া যাওয়া দূরে থাক, মতির সঙ্গে খেলা করিতেও তার যেন পরিশ্রম হয়, অমন কোমল হালকা দেহ মতির, তবু কুমুদের বুকে তার এতটুকু ক্ষণস্থায়ী আশ্রয়! শুইয়া বসিয়া হাই তুলিয়া বই পড়ে কুমুদ, আলস্যের মধুর আরামে দিনে একটিন সিগারেট খায়, বা করিয়া মতিকে খানিক আদর করিয়া জানালা দিয়া পুরা দশ মিনিট চাহিয়া থাকে বাহিরে, অন্যমনে শিস দেয়। বলে, চা করো মতি।

মতি বলে, কোথাও নিয়ে যাবে না আমাকে আজ?

কুমুদ বলে, কোথায় যাবে? কী আর দেখবার আছে কলকাতায়? একদিন থিয়েটার দেখো, ব্যস, তাতেই অরুচি। তারপর চলো না একদিন বেরিয়ে পড়ি, পুরী ওয়ালটেয়ার সব

বেড়িয়ে আসি? এখানে অদ্রলোক থাকে? কলকাতা কি শহর, এ তো একটা বাজার রাস্তায় বেরুলে মাথা ঘোরে।

কবে যাবে পুরী-টুরীর দিকে?

যাব যাব, ব্যস্ত কী। কুমুদ হাসে, আচল ধরিয়া বিব্রত মতিকে কাছে টানিয়া বলে, একটা ঘরে শুধু আমরা দুজনে কেমন আছি! ভালো লাগে না মতি?

হুঁ, লাগে।

তারপর ভয়ে ভয়ে-যা বই পড় সারাদিন।

তুমিও পড়বে মতি, তুমিও পড়বে।

ব্যস, তারপর এক পেয়ালা চা খাইয়া কুমুদ আবার চিত। আবেগ-মূর্ছনায় একটা সম্পূর্ণতা মতির কখনও পাইবার উপায় নাই। খানিক অন্যমনস্ক চিন্তা, এক পরিচ্ছেদ বই, দশ মিনিট মতি-এ যেন পালা করা খেলা কুমুদের, বৈচিত্র্য সৃষ্টি!

ভালোবাসার এত ক্রমশ মতির ভালো লাগে না। তবে ছোট-বড় সেবার সুযোগ মতিকে কুমুদ অফুরন্তই দিয়াছে। মতি চা করে, খাবার দেয়, তৃষ্ণার জল যোগায়। দাড়ি কামানোর আয়োজন করে, ক্ষুর ধুইয়া সরঞ্জাম গুছাইয়া রাখে, কুমুদের টেরিও মতিই কাটে, দিয়াশলাই সিগারেট প্রভৃতি যোগান দেয়। আরও কত কী মতি করে।

একদিন কুমুদ বলিয়াছিল, পা-টা কামড়াচ্ছে বউ।

কেন?

এমনি কামড়াচ্ছে। কেউ যদি একটু টিপে দিত।

মতি আরক্ত মুখে বলিয়াছিল, চাকরকে ডেকে বলো না?

হোটেলের চাকর পা টিপবে? তবেই হয়েছে। দাও না, তুমিই একটু দাও না আস্তে আস্তে!

সেই হইতে দুপুরবেলা কুমুদের ঘুম পাইলে মতি তার পাও টিপিয়া দেয়। শহরের শব্দে তখন স্থানীয় একটু স্তব্ধতার চাপ পড়ে। এ সময়টা মতির মন ভারি খারাপ হইয়া যায়। কলের মতো এক হাতে কুমুদের পা টিপিতে টিপিতে অন্য হাতে তাহাকে চোখ মুছিয়া ফেলিতে হয়। নিজেকে কেমন বন্দিনী মনে হয় মতির। মনে হয়, কুমুদ তাকে চিরকাল এই ছোট ঘরটিতে পা-টেপানোর জন্য আটকাইয়া রাখিবে, তার খেলার সাথি কেহ থাকিবে না, আপনার কেহ থাকিবে না, মাঠ ও আকাশ আর জীবনে পড়িবে না চোখে, বালিমাটির নরম গেঁয়ো পথে আর সে পরিবে না হাঁটিতে।

সাত দিন। মোটে সাত দিন যে এখানে কাটিয়াছে মতির!

তারপর একটি দুটি করিয়া কুমুদের বন্ধুরা আসিতে আরম্ভ করে। প্রতিদিন ইহাদের সংখ্যা বাড়িতে থাকে। আশ্চর্য সব বন্ধু কুমুদের। এরকম লোক মতি জন্মে কখনও দ্যাখে নাই। আসিয়া দরজায় ঘা দেয়। কুমুদ বলে, কে?

আমি।

কুমুদ বলে, দরজা খুলে দাও মতি।

দরজা খুলিয়া মতি ঘরের কোণে সরিয়া যায়। সরাসরি ঘরে ঢুকিয়া কুমুদের বন্ধু বিছানায় বসে। প্রথমবার আসিয়া থাকিলে মতির দিকে চোখ পড়ায় খানিকক্ষণ তাকাইয়া থাকে।

কোথায় পেলি?

বন্ধু শুইয়া থাকিয়াই জবাব দেয়, বউ!

কুমুদু হাসে। ফস করিয়া দিয়াশলাই জ্বলিয়া সিগারেট ধরায়।

আর এক দফা মতিকে দেখিয়া বলে, চা করো দিকি বউদি। চিনি কম, কড়া লিকার।

এবং পরক্ষণেই কুমুদের সঙ্গে গল্পে মশগুল হইয়া যায়। মতি গাঁয়ের মেয়ে, বন্ধু যে লোক ভালো নয় সে তা বুঝিতে পারে। তবু আর যে সে একবারও তার দিকে ভালো করিয়া চাহিয়া দ্যাখে না, মতি তাতে আশ্চর্য হইয়া যায়। ভাবে, কুমুদের বন্ধু লোক যেমন হোক ভদ্রতা জানে। এমন ভাব দেখাইতে পারে যেন এঘরে শুধু বন্ধু আছে, বন্ধুর বউ নাই!

সকলে এরকম নয়। মতির সঙ্গে আলাপ করিবার চেষ্টাও কেউ কেউ করে। কেউ ঘরে ঢুকিয়াই একেবারে বহুদিনের পরিচিত হইয়া উঠিতে চায়, কেউ ধীরে ধীরে পরিচয় গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করে,-কারো কথাবার্তা হয় কৃত্রিম, কারো সহজ ও সরল। বইটই দু-একটা উপহারও মতি পায়। এইসব বন্ধুদের মধ্যে একজনেক মতির বড় ভালো লাগিল, মোটা জোরালো চেহারা আর শক্ত কালো একঝাড় গোপ থাকা সত্ত্বেও। তার নাম বনবিহারী।

জাকিয়া বসিয়া প্রথমেই সে ঠাট্টা করিয়া বলিল, খুকি বলব, না বউদি বলব?

মতি বলিল, খুকি কেন বলবেন?

বনবিহারী যেন অবাক হইয়া গেল। কুমুদকে বলিল, কই রে, তেমন গেঁয়ো তো নয়। কথা বলার জন্যে সাধাসাধি করতে হল কই?

কুমুদ বলিল, লজ্জা একটু ভেঙেছে।

আরও কত কী ভাঙবে।—বলিয়া বনবিহারী হাসিল। মতিকে বলিল, অনেক দিনের বন্ধু আমি কুমুদের। বয়সের হিসাব ধরলে আমি তোমার ভাসুর হব, কিন্তু বয়সের কথাটা মনে রাখতে বউ আমাকে বারণ করেছে।

মতির লজ্জাও করে, হাসিও আসে।

বনবিহারী বলিল, তোমাকে হোটেলে এনে তুলেছে শুনে মাথাটা কাটিয়ে দিতে এসেছিলাম। আমার স্ত্রীও এই ইচ্ছা অনুমোদন করেছেন। এখন তোমার অনুমতি পেলেই কাজটা করে ফেলতে পারি। দেব নাকি মাথাটা ফাটিয়ে?

কৌতুকে মতির চোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বনবিহারী বলিল, বিজ্ঞাপনের ছবি এঁকে পেট চালাই, বাড়ি বলতে একটা ঘর আর একফোঁটা একটু বারান্দা। তবু সেটা বাড়ি, হোটেল তো নয়। এ রাস্কেলের তাও খেয়াল থাকে না।

অসময়ে আসিয়া বনবিহারী অনেকক্ষণ বসিয়া গেল। আগাগোড়া কত হাসির কথাই যে সে বলিল! শেষের দিকে চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া মতি মাঝে মাঝে শব্দ করিয়াই হাসিয়া উঠিতে লাগিল। কুমুদকে একদিন সস্ত্রীক তার বাড়িতে যাওয়ার হুকুম দিয়া বনবিহার সেদিন বিদায় হইল।

কুমুদ বলিল, হালকা লোক, ফাঁপা। পয়সার জন্য আর্টকে জবাই করছে। ছবি আঁকার অদ্ভুত প্রতিভা ছিল, নাম হওয়া পর্যন্ত লড়াই করিতে পারল না। মাসিকের পট বিজ্ঞাপনের ছবি এঁকে দিন কাটায়। সেজন্য আপসোসও নেই, এমন অপদার্থ।

বনবিহারীর অপরাধটা মতি বুঝিতে পারে না। বুঝিতে ইচ্ছা হয় না। কথার অন্তরালে স্নেহ ছিল বনবিহারীর, সমবেদনা ছিল। গ্রাম ছাড়িয়া আত্মীয়পরিজনের সঙ্গ ছাড়িয়া ছেলেমানুষ সে যে একটা অপরিচিত অদ্ভুত জগতে আসিয়া পড়িয়াছে, বনবিহারী ছাড়া কুমুদের আর কোনো বন্ধু বোধহয় তাহার খেয়ালও করে নাই। দুদিন পরে সকালবেলা বনবিহারী আবার আসিল। না-যাওয়ার অন্য অনেক অনুযোগ দিয়া বলিল, চলো কুমুদ, এখুনি যাই আজ, ওখানেই খাওয়াদাওয়া করবি।

কুমুদ হাই তুলিয়া বলিল, যাব যাব, এত ব্যস্ত কেন?

বনবিহারীর মুখখানা এবার একটু গম্ভীর দেখাইল। সুর ভারী করিয়া সে বলিল, তোর ব্যাপারটা কী বল তো কুমুদ? আমাদের ওদিকে যাস না আজ ছ মাস, যেতে বলায় আজ

হাই উঠছে? সাতদিন তোর দেখা না পেলে আগে আমাদের ভাবনা হত। হঠাৎ যে ত্যাগ করলি আমাদের?

ত্যাগ? ত্যাগের স্বভাব আমার নেই। এমনি হাই উঠছে-শ্রান্তিতে।

সারাদিন শুয়ে থেকে শ্রান্তি! আর যেতে বলব না কুমুদ।

কী দরকার? কাল-পরশুর মধ্যে একদিন হশ করে হাজির হব দেখিস।

বনবিহার এবার হাসিল, হয়তো তার আগেই জয়া হশ কওে এসে হাজির হবে এখানে। কী শাস্তিটা তখন যে তোকে দেবে ভেবে পাচ্ছি না। খুকিকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে একমাস হয়তো লুকিয়ে রেখে দেবে।

বনবিহারীর মুখে খুকি শব্দটা মতির ভালোই লাগে। তবু সে আবদার করিয়া বলিল, আবার খুকি কেন?

বনবিহারী চলিয়া গেলে কুমুদকে বলিল, চলো না যাই একদিন? অমন করে বলছেন!

কুমুদ মৃদু হাসিয়া বলিল, উনি কি আর বলছেন মতি, ওর মুখ দিয়া আর একজন বলাচ্ছেন তার নাম জয়া, উনার তিনি পত্নী।-যাব, ইতিমধ্যে একদিন যাব।

এদিকে ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যাবেলা কুমুদের সমাগত বন্ধুর সংখ্যা বাড়িতে থাকে, রীতিমতো আড্ডা বসে। চৌকিতে কুলায় না। চৌকি কাত করিয়া রাখিয়া মেঝেতে বিছানা ও চাদর বিছাইয়া সকলে বসে। কেহ অনর্গল কথা বলে, কেহ থাকিয়া থাকিয়া প্রবল শব্দ করিয়া হাসে, কেহ গুনগুন করিয়া ভাঁজে গানের সুর। দেয়ালে ঠেস দিযা শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত কেহ শুধু ঝিমায়। বিড়ি, সিগারেট আর চুরুটের ধোঁয়ায় ঘরের বাতাস ভারী হইয়া ওঠে।

তাস খেলা হয়। টাকা পয়সার আদান-প্রদান দেখিয়া মতি বুঝিতে পারে জুয়া খেলা হইতেছে।

মতির কান্না আসে। সহজভাবে সে নিশ্বাস ফেলিতে পারে না। লজ্জা করিতে কুমুদ তাহাকে বারণ করিয়াছে, কুমুদের বন্ধুরা একজন দুজন করিয়া আসিলে মতির বেশি লজ্জা করেও না। এ তো তা নয়। যে ঘর ছাড়িয়া এক মিনিটের জন্য তাহার বাহিরে যাওয়ার উপায় নাই, একপাল বন্ধু জুটাইয়া সে ঘরে কুমুদ সন্ধ্যা হইতে রাত এগারোটা পর্যন্ত আড্ডা দেয়, হাজার লজ্জা না করিলেও যে চলে না।

মতি চা যোগায়। বিকালে স্টোভ ধরায়, রাত বারোটার আগে সে স্টোভ ঠাণ্ডা হইবার সময় পায় না। বোধহয় কুমুদের বলা আছে, সন্ধ্যার বন্ধুরা মতিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে, চা পান প্রভৃতির প্রয়োজন পর্যন্ত কুমুদকে জানায়। চা করিয়া, পান সাজিয়াই মতির কর্তব্য শেষ, বিতরণ করিতে হয় না। এদিকের জানালায় গিয়া সে বসিয়া থাকে সমস্তক্ষণ। জানালার পাটগুলি ঘরের ভিতরে খোলে, তারই আড়ালে মতি একটু অন্তরাল পায়। ওইখানে মাঝে মাঝে মতির রোমাঞ্চ হয়। ভয়ে সে কাঁদিতেও পারে না, ঘরে এতগুলি মানুষ। রাগে দুঃখে অভিমানে পাখি হইয়া মতির গাওদিয়া উড়িয়া যাইতে সাধ হয়। ক্রমে রাত্রি বাড়ে। রাস্তার লোক চলাচল কমিয়া আসে, সরু গলিটার ওমাথায় ক্ষণিকের জন্য আলোকিত ট্রামগুলিকে আর যাইতে দেখা যায় না, তীব্র আলো নিভাইয়া পথের ও পাশের মনোহারি দোকানটি বন্ধ করা হয় ন আর দোকানটির ঠিক উপরের ঘরে মতিরই সমবয়সি একটি মেয়ে টেবিল চেয়ারে পড়া সাঙ্গ করিয়া শয়নের আয়োজন করে। দেখিয়া মতিরও ঘুম আসে।

বন্ধুরা চলিয়া গেলে কুমুদ বলে, আগে বিছানা পাতবে? নামিয়ে দেব চৌকিটা? না, খেয়ে নেবে আগে?

মতি সাড়া দেয় না! উঠিয়া কাছে যাইবে তাতেও কুমুদের আলস্য। বলে, শোনো, শুনে যাও। রাগ হল নাকি? আহা, শোনোই না।

বেশিক্ষণ অবাধ্য হওয়ার সাহস মতির হয় না। কাছে গিয়া কাঁদিতে থাকে, বলে, এত লোক ঘরে এলে আমি কেমন করে থাকি?

কুমুদ তাকে আদর করিয়া বলে, বন্ধুরা এলে কি তাড়িয়ে দিতে পারি মতি? ওরা তো জ্বালাতন করে না তোমাকে?

তখন মতি বলে যে কুমুদ তবে আর একটা ঘর ভাড়া নিক। কুমুদ বলে, ঘরের ভাড়া কি সহজ, অত টাকা কোথায়? মতি তখন জবাব দেয় টাকার যখন এমন অভাব, খুব সস্তায় ছোটখাটো একটা বাড়ি ভাড়া নিলেই হয়। এখানে আর ভালো লাগিতেছে না মতির। আর তাও যদি না হয় বন্ধুদের কারো বাড়ি গিয়া কুমুদ আড্ডা বসাক।

এত রাত পর্যন্ত তোমায় একা রেখে যাব? ভয় করবে না তোমার?

না ভয় করবে না। ঘরে খিল দিয়ে থাকব।

এবার আর কুমুদ এমন যুক্তি দেখায় না মতি যা খণ্ডন করিতে পারে। প্রথমেই মতিকে এমন সোহাগ করে যে সে অবশ, মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া আসে। তারপর সে মতিকে বোঝায় বলে, ভেঙেচুরে গড়ে নেব বলিনি তোমাকে? বলিনি ঘর সংসার পেতে বসবার আশা কোরো না? সে তো সবাই করে, রাস্তায় মুটে থেকে মহারাজ পর্যন্ত। আমি তো সেইরকম নই মতি। নিয়ম মেনে চলতে হলে দুদিনে আমি মুষড়ে মরে যাব। ভেসে ভেসে বেড়াই, কাল কী হবে ভাবি না, যা ভালো লাগে তাই করি। আমার সঙ্গে থাকতে হলে কনেবউটি সেজে থাকলে চলবে কেন তোমার? বউ-মানুষ আমি, আমি এমন করে থাকব অমন করে থাকব,-এ ভাব যদি তোমার মনের মধ্যে থাকে, আমার সঙ্গে তোমার তবে বনবে না। আমি রোজগার করে আনব আর ঘরের কোণে বসে তুমি রাধবে, বাড়বে, ছেলেমেয়ে মানুষ করবে,-কবে তো বলেছি তোমাকে, তা হবার নয়। বউ তুমি নও, তুমি সাথি। অন্তত তাই তোমাকে হতে হবে। তোমার সম্বন্ধে সব বিষয়ে আমার যদি দায়িত্ব নিতে হয়, তুমি যদি ভার হয়ে থাকো আমার, তোমাকে না হলে আমার একটুও ভালো লাগবে না মতি। তোমার জন্য যদি আমাকে বদলে যেতে হয়, যেভাবে দিন কাটাতে চাই তা না পারি, কী করে তোমাকে তাহলে রাখব আমার সঙ্গে?

মতি সভয়ে বলে, ত্যাগ করবে আমাকে?

কুমুদ হাসিয়া তাহার গায়ে মাথায় হাত বুলায়, বলে, ভয় পেয়ো না, সব ঠিক হয়ে যাবে মতি। ভাবনার কী আছে? এক বচ্ছর আমার সঙ্গে থাকলে এমন বদলে যাবে যে, আমাকে আর বলে দিতে হবে না, যেখানে যে অবস্থাতে থাকো তাতেই মজা পাবে। অভ্যাস নেই কি না, তাই প্রথমটা অসুবিধা হচ্ছে। দুদিন পরে আর গ্রাহ্যও করবে না। তখন কী করব জানো? ওদের আসতে বারণ করে দেব।

কেন?

বেশিদিন আমার কিছু ভালো লাগে না মতি। অনেকদিন পরে কলকাতা এলাম, তাই একটু আড্ডা দিচ্ছি বিতৃষ্ণা জন্মাল বলে।

দিনদুই পরে বনবিহার একেবারে সস্ত্রীক আসিয়া হাজির হইল। জয়া একটু মোটা, তবে সুন্দরী। টকটকে রঙ, মুখখানা গোল, জমকালো চেহারা। চোখদুটি ঝকঝকে, ধারালো দৃষ্টি।

তুমি তো গেলে না, আমি ভাই তোমাকে তাই দেখতে এলাম। তোমার ব্যাপারটা কী কুমুদ? বিয়ে করে বউকে লুকিয়ে রাখলে? ওকে তো অন্তত পাঠালাম সাতবার, তবু কি একবার মনে পড়ল না জয়া বলে একটা জীব কৌতুহলে ফেটে পড়ছে? গা থেকে বউ এনেছ শুনে অবধি অবাক মেনেছি।

ধারালো চোখে জয়া মতিকে দেখিতে থাকে। বলে, কচি বলে কচি, এ যে ধাঁধা লাগানো কুমুদ আমার মেয়ে হলে ওকে যে ফ্রক পরিয়ে রাখতাম!–তাকায় দ্যাখো কেমন করে। এসো তো ভাই খুকি এদিকে, নেড়েচেড়ে দেখি।

বাজিয়ে দেখবে না? বনবিহারী বলিল।

কুমুদ বলিল, স্পিড একটু কমাও জয়া, ভড়কে যাবে। পুতুল তো নয়।

জয়া হাসিল, মায়া নাকি? শেষে মায়া করতেও শিখলে মতির দিকে চাহিয়া বলিল, এসো এদিকে, এখানে বোসো। প্রেজেন্ট কিন্তু আনিনি ভাই তোমার জন্যে, টাকায় কুলোল না। পরে কিনে দেব। খালি হাতেই ভাব করে যাই আজ।

সাধারণ একখানা শাড়ি পরনে, যেন দাসীর বেশ জয়ার বেশভূষা, কথাবার্তা ভাবভঙ্গি মতির কাছে অদ্ভুত ঠেকিতে লাগিল। কুমুদের নাম ধরিয়া ডাকে গুরুজনের মতো, অথচ কথা ফাজলামি করিয়া, এ কোনো-দেশী মেয়েমানুষ? প্রথম দেখাতেই জয়ার সম্বন্ধে মতির মনে একটা বিরুদ্ধভাবের সৃষ্টি হইয়া রহিল। কেমন একটা অদ্ভুত অনুকম্পার ভাব জয়ার, মতিকে দেখিয়া তার যেন হাস্যকর মনে হইতেছিল! ঘণ্টাখানেক বসিয়া জয়া চলিয়া গেল।

মতির মনে হইল, ঘরে যেন একঘণ্টা ধরিয়া ম্যাজিক হইতেছিল,–ভোজবাজি কী বলিল জয়া, কেন হাসিল, অর্ধেক সময় মতি তা বুঝিতেই পারে নাই, শুধু কুমুদ ও জয়ার মধ্যে যে নিবিড় অন্তরঙ্গতা আছে এটা টের পাইয়া বোধ করিয়াছে ঈর্ষা।

নাম ধরে ডাকলে যে তোমায়?

মতির প্রশ্নে কুমুদ কৌতুক বোধ করিলা আমার বন্ধু যে মতি, অনেক দিনের বন্ধু।

মতি অবাক। মেয়েমানুষ বন্ধু। খানিকক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া বলিল, আচ্ছা, ও যে তোমার সঙ্গে ওরকম করছিল, ওর স্বামী রাগ করবে না?

কীরকম করছিল? কুমুদ জিজ্ঞাসা করিল।

মতি কথা বলিল না।

কুমুদ বলিল, তোমার মন তো বড় ছোট মতি।

একটু পরে মতির চোখ দিয়া জল পড়িতেছে দেখিয়া হঠাৎ পাঞ্জাবি গায়ে দিয়া কুমুদ বাহির হইয়া গেল। বলিয়া গেল, ছিঁচকাদুনেও নও কম।

কুমুদের কছে এমন কঠিন কথা মতি আর শোনে নাই। স্বামীর প্রথম ভর্ৎসনায় মতির চোখের জল শুকাইয়া গেল।

ম্যানেজার একদিন টাকা চাহিয়া গেল।

মতি কুমুদের বাগ ও বাক্স প্যাটরা হাতড়াইয়া দেখিয়া বলিল, মোটে সাত টাকা আছে। টাকা বুঝি লুকিয়ে রেখেছ?

কুমুদ বলিল, আর টাকা কোথায় যে লুকিয়ে রাখব?

আর নেই? মতির মুখ শুকাইয়া গেল।

কুমুদ হাসিয়া বলিল, সাত টাকা বুঝি কম হল মতি?

কী হবে তবে? কোথায় পাবে টাকা? হোটেলে টাকা দেবে কী করে? ভীত চোখে চাহিয়া থাকে মতি, বলে, রোজ তুমি জুয়া খেলে টাকা হেরে যাও, কেন খ্যালো?

তাহার দুর্ভাবনার পরিণাম দেখিয়া কুমুদের যেন মজা লাগিল। পাশে বসাইয়া বলিল, আমার বউ হয়ে তুমি তুচ্ছ টাকার জন্য ভাবছ মতি? আজ সাত টাকা আছে, আজ তো চলে যাক, কালের ভাবনা কাল ভাবব। ব্যবস্থা একটা কিছু হয়ে যাবেই মতি, টাকার জন্য কখনও মানুষের বেঁচে থাকা আটকায় না।

উতলা মতি বলল, সাত টাকায় কী করে চলবে?

দিব্যি চলবে। দ্যাখোই না কী করে চলে? চিরকাল এমনি করে চালিয়ে এলাম, আমি জানি না? তুমি কেন ভাবছ? টাকার চিন্তা করার কথা তো তোমার নয়!

মতি তবু বলিল, হোটেলের টাকা দেবে কী করে? কাল যে দেবে বললে?

আবার ভাবে ওকথা। ঘ্যানঘ্যান করার স্বভাব গড়ে তুলো না মতি, গিনির মতো মুখ কোরো না। কাল যা দেব বলেছি কাল তার ভাবনা ভাবব, আজ কেন তুমি উতলা হয়ে উঠলে?

রাত্রে বন্ধুরা ফিরিয়া গেলে একমুঠা টাকাপয়সা কুমুদ বিছানায় ছড়াইয়া দিল। বলিল, দেখলে কোথা থেকে টাকা আসে? ভেবে তো তুমি মরে যাচ্ছিলে।

মতি বিষণ্ণভাবে বলিল, কালকে হেরে যাবে আবার। কী-ই-বা হবে এ একটা টাকায়!

সিগারেট ধরাইয়া কুমুদ কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে মতির দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর ধীরে ধীরে বলিল, এত অল্পবয়সে তোমার এত হিসাব হয়েছে আমি তা ভাবতে পারিনি মতি। টাকার দরকার তোমার তো এমন করে বুঝবার কথা নয়! ছেলেমানুষ তুমি, নিজের ফুর্তিতে থাকবে, কিসে কী হবে না হবে সে ভাবনা ভাবতে তোমার হবে বিরক্তি। তা নয়, টাকা কম পড়েছে বলে সারাদিন মুখ কালি হয়ে রইল। এত কচি ছিলে গাওদিয়ায়, এত পাকলে কখন? কিছুই যে সেখানে তুমি বুঝতে না মতি, যা বলতাম শিশুর মতো মেনে নিতে আর হা করে তাকিয়ে থাকতে মুখের দিকে? ঠকিয়েছিলে নাকি আমায়, ছেলেমানুষির ভান করে?

মতি জবাব দিতে পারে না, কুমুদের অভিযোগ ভালো করিয়া বুঝিতেও পারে না, তার শুধু কান্না আসে। ছেলেমানুষির ভান করিত? সে কি এখনো ছেলেমানুষ নয়? টাকা নাই তাই টাকার কথা ভাবিয়াছে, তাতেই কি মানুষের ছেলেমানুষি ঘুচিয়া যায়? পরদিন টাকা চাহিতে আসিয়া ম্যানেজার খালি হাতে ঘুরিয়া গেল। টাকা থাকিতেও কুমুদ তাকে টাকা দিল না কেন মতি বুঝিতে পারিল না, ভয়ে কিছু বলিল না।

দিন সাতেক পরে সকালবেলায় কুমুদ একটা অল্পদামি টিনের তোরঙ্গ কিনিয়া আনিল। মতিকে বলিল, জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও মতি, বাড়ি ঠিক করে এলাম, খেয়েদেয়ে বাড়িতে গিয়ে উঠব। এ শালার হোটেলে আর মন টিকছে না।

সদ্য-ক্রীত টিনের তোরঙ্গটিতে কিছুই ভরা হইল না। কুমুদ বলিল, ওটা খালি থাক মতি। বাকি জিনিস সমস্ত বাঁধিয়া-ছাদিয়া গুছাইয়া নেওয়া হইল। কেবল একটি ফরসা চাদর পাতা রহিল চৌকির উপরে, একটা বালিশও রহিল। আলনায় ঝুলানো রহিল ছেড়া একটা পাঞ্জাবি, একখানা পুরোনো কাপড় ও একটা গেঞ্জি। তারপর কুমুদ চাকরকে পাঠাইয়া দিল গাড়ি ডাকিতে।

খবর পাইয়া ম্যানেজার ছুটিয়া আসিল। বলিল, চললেন নাকি কুমুদবাবু?

কুমুদ বলিল, স্ত্রীকে রেখে আসতে যাচ্ছি বাপের বাড়ি, কাল ফিরব বিকেলের দিকে। জিনিসপত্র রইল, একটু নজর রাখবেন ঘরটার দিকে।

ম্যানেজার বলিল, টাকা দেবেন বলেছিলেন আজ?

কাল দেব। কাল নিশ্চয় পাবেন।

আশেপাশেই রহিল ম্যানেজার। গাড়ি আসিলে এবং জিনিসপত্র তোলা হইলে কুমুদ ঘরে তালা বন্ধ করিল। ঘরের মধ্যে নতুন তোরঙ্গ, চৌকির বিছানা ও আলনার জামাকাপড় দেখিয়া ম্যানেজার একটু আশ্বস্ত হইল।

গাড়িতে উঠিয়া মতির মুখে কথা সরে না। কুমুদ মৃদু হাসে। বলে, ভাবছ ম্যানেজারকে ঠকালাম? টাকা দিয়ে যাব মতি।

কাল আসবে?

কাল কি আর আসব, হাতে টাকা হলেই আসব। মিছামিছি গোলমাল করত টাকার জন্যে, তাই একটু কৌশল করলাম, নইলে কাউকে আমি ঠকাই না মতি, দু-চার মাসের মধ্যে টাকাটা একদিন ঠিক দিয়ে যাব।

ঘরঘর শব্দে গাড়ি চলে। কোথায় যাইতেছে তারা? আকাশ-পাতাল ভাবে মতি, কুমুদের কাছে থাকিয়া তার যেন বিপদের ভয় হয়, কুমুদ যেন ভয়ানক মানুষ। অনেকক্ষণ চলিয়া সরু একটা গলির মধ্যে ছোট একতলা একটা বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড়াইল। একটু পরেই দরজা খুলিল বনবিহারী, জয়াও আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, মঙ্গলঘট স্থাপনের সময় পাইনি, বাড়িতে শাঁখ নেই, উলু দিতেও জানি না,-মাপ কোরো কুমুদ।

ছোট বাড়ি, পাশাপাশি দুখানা শয়নঘর, সামনে একরত্তি একটু রোয়াক ও ছোট উঠান, একপাশে রান্নাঘর এবং তার লাগাও পায়রার খোপের মতো একটি বাড়তি ঘর। উঠানে দাঁড়াইয়া মতিকে এদিক-ওদিক চাহিতে দেখিয়া জয়া বলিল, বাড়ি বুবি তোমার পছন্দ হচ্ছে না?

মতি দ্বিধাভাবে বলিল, মন্দ কী?

জয়া বলিল, যে তাড়াহুড়ো করে এলাম কাল বিকেলে ঘরদের এখনো সাফ পর্যন্ত করা হয়নি। যাক, দুজনে হাত চালালে সব ঠিক করে নিতেই আর কতক্ষণ। আমি এ ঘরখানা নিয়েছি, এ ঘরে জানালা বেশি আছে একটা, মোটা মানুষ একটু আলো-বাতাস নইলে হাপিয়ে উঠি। তোমার ঘরখানা একটু ছোট হল। তা হোক! তুমি মানুষটাও ছোট, নতুন সংসারে জিনিসপত্রও তোমার কম, এতেই তোমার কুলিয়ে যাবে।

বাড়িঘর সাফ হয় নাই বটে, নিজের ঘরখানা জয়া কিন্তু ইতিমধ্যে গুছাইয়া ফেলিয়াছে। জিনিসপত্র নেহাত কম নয় জয়ার, তবে সবই প্রায় কমদামি। জিনিসের চেয়ে ঘরের ছবিগুলিই মতির দৃষ্টি আকর্ষণ করিল বেশি। সব ছবি হাতে আঁকা, ছোট-বড়, বাধাআবাধা, ওয়াটার কালার, অয়েল পেন্টিংপ্রভৃতি রঙবেরঙের অসংখ্য ছবিতে চারিটা দেয়াল একরকম ঢাকিয়া গিয়াছে। খুব বড় একটা ছবি দেখিয়া মতি হঠাৎ লজ্জা পায়।

জয়া খিলখিল করিয়া হাসে, বলে আমার উর্বশী-সতিন ভাই। আকাশ থেকে নামছেন কি-না, বাতাসে তাই শাড়িখানা উড়ে দিয়া পেছনের মেঘ হয়েছে। একজন সাতশো টাকা দর দিয়েছে, ও হাকে হাজার। আমি বলি দিয়ে দাও না সাতশয়েই, সাতশো টাকা কি কম, আপদ বিদেয় হোক! আসলে ওর বেচবার ইচ্ছেই নেই!

মতি বলিল, মুখখানা আপনার মতো।

তাই তো হাজার টাকা দর হাঁকে!-জয়া হাসিল।

জয়ার সাহায্যে মতি ঘর গুছাইয়া ফেলিল। সামান্য জিনিস, জয়ার ঘরের সঙ্গে তুলনা করিয়া নিজের ঘরখানা মতির খালি খালি মনে হইতে লাগিল, খেলাঘরের মতো ঠেকিতে লাগিল। কিন্তু সেই দিন বিকালেই জিনিস আসিল। কোথা হইতে টাকা পাইল কুমুদ সেই জানে, হোটেলের পাওনা ফাকি দিক, কৃপণ সে নয়। টেবিল, চেয়ার, আলনা, বড় একটা তক্তপোশ আনিয়া সে ঘর বোঝাই করিয়া ফেলিল, নীল-শেড়-দেওয়া সুন্দর একটি টেবিলল্যাম্প ও মতির জন্য ভালো একখানা শাড়িও কিনিয়া আনিল।

১১. নতুন আশার সঞ্চারে

নতুন আশার সঞ্চারে মতির মন আবার মোহে ভরিয়া যায়। চৌকিতে সে সযত্নে বিছানা পাতে; টেবিলে সাজাইয়া রাখে তাহার সামান্য প্রসাধনের উপকরণ; কাপড়-জামা কুচাইয়া গুছাইয়া রাখে আলনায়। টেবিলল্যাম্পে তেল ভরিয়া সন্ধ্যা হইতে-না-হইতেই জ্বালিয়া দেয়। বার বার সলিতাটা বাড়ায় কমায়। কতখানি বাড়াইবে ঠিক করিতে পারে না।

আর বাড়াব? না কমিয়ে দেব? একটু কমিয়েই দি, কী বলো?

কুমুদ হাসিয়া বলে, থাক না, ওই থাক।

জয়াই এবেলা রাধিয়াছে। রাত্রির খাওয়াদাওয়ার পর জয়ার জন্য ঘরে যাইতে মতির আজ প্রথম লজ্জা করিল। জয়া দাঁত মাজিতে মাজিতে বলিল, দাড়িয়ে কেন? ঘরে যাও।

তুমি আগে যাও দিদি।

কার ঘরে যাব, তোর? হাসির চোটে দাঁত মাজা হল না জয়ার। মতি অবাক মানে। কী এমন রসিকতা যে এত হাসি! তারপর মুখ ধুইয়া মতির হাত ধরিয়া জয়া তাহাকে ঘরে লইয়া গেল। বলিল, ঘরে আসতে বউ তোমার লজ্জা পাচ্ছে কুমুদ।

কুমুদ চিত হইয়া বই পড়িতেছিল। বলিল, তাই নিয়ম যে। বসো।

না যাই, ঘুম পেয়েছে, বলিয়া জয়া সেই যে চেয়ারে বসিল আর ওঠে না। বসিয়া বসিয়া গল্প করে কুমুদের সঙ্গে। কী যে সে গল্প আগামাথা কিছুই মতি বুঝিতে পারে না, থাকিয়া থাকিয়া জয়ার মুখ হইতে ইংরেজি শব্দ ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে আঘাত করে। বন্ধু, জয়া কুমুদের বন্ধু। কুমুদ যখন রাজপুত্র প্রবীরের রূপ ধরিয়া গাওদিয়ায় উদয় হয় নাই তখন

হইতে বন্ধু। ঈর্ষায় মতির ছোট বুকখানি উদ্বেলিত হইয়া ওঠে। সন্ধ্যার আনন্দের আর চিহ্ন থাকে না।

হোটেলে বন্দিজীবন ও কুমুদের বন্ধুদের আড্ডা হইতে মুক্তি পাইয়া মতি এখানে হাপ ছাড়িয়াছে, এখন শুধু গাওদিয়ার জন্য মন কেমন করে। আশায় কচি মেয়েটা বুক বাঁধিয়াছে, স্বপ্ন তো সে কম দেখিত না, সেগুলি যদি সফল হয় এবার। কিন্তু নিজেকে এখানেও সে মিশ খাওয়াইতে পারে না। আজন্মের অভ্যাস ও প্রকৃতি ওখানেও ঘা খাইয়া আহত হয়। গায়ের চেনা রূপ, চেনা মানুষগুলির কথা মনে পড়িয়া মতির চোখ ছলছল করে। কতদিন ওদের সে দেখিতে পায় নাই। সন্ধ্যার সময় পরাণ হয়তো মোক্ষদা ও কুসুমের সঙ্গে তার কথা বলাবলি করে। শশীও হয়তো কোনোদিন আসিয়া বসে। কবে কুমুদ তাহাকে গাওদিয়ায় লাইয়া যাইবে কে জানে!

মতি বলে, এখেনে তো আমরা থির হয়ে বসলাম, এবার দাদাকে একটি পত্র দাও! কত ভাবছে ওরা।

কুমুদ বলে, এর মধ্যে ভুলে গিয়েছ মতি?

কী? কী ভুলে গিয়েছি?

আমায় বলোনি গাওদিয়ার কথা ভুলে যাবে-কোনো সম্পর্ক থাকবে না গাওদিয়ার সঙ্গে? ভালো করে তোমায় আমি বুঝিয়ে দিইনি বিয়ের আগে, আমার সঙ্গে আসতে হলে জন্মের মতো আসতে হবে? চিঠি লেখালেখি চলবে না, তাও বলেছিলাম মতি।

সেই কথা। তালবনের সেই অবুঝ বিহবল ক্ষণের প্রতিজ্ঞা কুমুদ সেকথা মনে রাখিয়াছে মতির বড় ভয়। কুমুদ যা বলিয়াছিল তা-ই সে স্বীকার করিয়াছিল বটে, কিন্তু সে তো তখন বুঝিতে পারে নাই রাজপুত্র প্রবীরের সঙ্গে থাকিলেও গাওদিয়ার জন্য কোনোদিন তাহার মন কেমন করিবে। নতুন জীবন, নতুন জগৎ, পুতুলের মতো কুমুদের হাতে

নড়াচড়া–এ কল্পনাতেই তার যে ভাবিবার বুঝিবার শক্তি থাকিত না। কুমুদ কি সেকথা আজ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিবে নাকি?

মতি ক্ষীণস্বরে বলে, সে তো সত্যি নয়।

তাই বুঝি ভেবেছিলে তুমি, তামাশা করছি?

দিন কাটিয়া যায়। জীবনে আর কোনোদিন গাওদিয়ায় যাইতে পাইবে না ভাবিয়া মতির যখন কষ্ট হয় না, কাঁচা মনে তখন কম-বেশি আশা আনন্দের সঞ্চার হয়। শৃঙ্খলার যথেষ্ট অভাব থাকিলেও জীবন এখানে মোটামুটি নিয়মানুবর্তী। আর মাঝে মাঝে কুমুদকে যতই ভয়ানক, নির্মম ও পর মনে হোক, কী একটা আশ্চর্য মন্ত্রে কুমুদ তাহাকে মুগ্ধ করিয়া রাখে। একটু নির্ভর শিখিয়াছে মতি। সে জানে আবোল-তাবোল খরচ করিয়া যত নিঃস্বই কুমুদ হোক, টাকার জন্য কখনও তার আটকায় না। তা ছাড়া চারিদিকে ধার করিয়া রাখিয়া কপদকশূন্য অবস্থাতেই কুমুদ যেন সুস্থ থাকে। টাকা দিতে কামড়ায়; ঘরে টাকা থাকিলে রাত্রে যেন তার ঘুম আসে না। তা ছাড়া, আর একটা ব্যাপার মতি ক্রমে ক্রমে টের পাইয়াছে। তাহাকে ভাঙিয়া গড়িবার কল্পনাটা কুমুদ শুধু মুখেই বলিতে ভালোবাসে, কাজে কিছু করিবার তার উৎসাহ নাই জীবনে আর কিছুই কুমুদ চায় না, যখন যা খেয়াল জাগে সেটা পরিতৃপ্ত করিতে পারলেই সে খুশি। নিয়ম, দায়িত্ব, ভালোমন্দ, উচিত-অনুচিত এগুলি তার কাছে বিষের মতো। কথাসর্বস্বও বটে কুমুদ। সে যখন বড় বড় কথা বলে, সায় দিয়া যাওয়াই যে যথেষ্ট, এটুকু জানিয়াও একদিকে মতি খুব নিশ্চিন্ত হইয়াছে। তবে কুমুদের সেবা করিয়া মতি বড় শ্রান্তিবোধ করে, জ্বালাতন হয়। এক এক সময় তাহার মনে হয় যে, কুমুদের বুঝি সে বউ নয়, দাসী। সিগারেট ধরানো হইতে পা টিপিয়া দেওয়া পর্যন্ত অসংখ্য সেবা করিবে বলিয়া অত ভালোবাসিয়া কুমুদ তাহাকে বিবাহ করিয়াছে। একটু খেলা চায় মতি, নিজের একটু আরাম বিলাস। কুমুদের জ্বালায় তা জুটিবার নয়।

আগ্রহের সঙ্গে মতি জয়া ও বনবিহারীর জীবনযাত্রা লক্ষ করে। জীবনকে ওরা এই ক্ষুদ্র গৃহাংশে আবদ্ধ করিয়াছে, বাহির হইতে কোনোরকম বৈচিত্র্য আহরণের চেষ্টা নাই। সারাদিন ছবি আঁকে বনবিহারী, শুধু ছবি বেচিবার জন্যে বাহিরে যায়, বাকি সময়ে ধরে বন্দি করিয়া রাখে নিজেকে। কখনও সচ্ছলতা আসে, কখনও অভাব দেখা দেয়।

টাকাপয়সা সম্বন্ধে বনবিহারী কুমুদের ঠিক বিপরীত। একটি পয়সা সে কখনও ধার করে না। এ বিষয়ে জয়া আরও কঠোর। দুটি পরিবার এক বাড়িতে বাস করিতেছে, কিন্তু তাদের মধ্যে আলু-পটলের বিনিময়ও জয়া বরদাস্ত করিতে পারে না। একদিন জয়াকে বাড়িতে তরকারি দিতে গিয়া মতি যা ঘা খাইয়াছিল, কোনোদিন সে ভুলিবে না।

নষ্ট হবে, ফেলে দেব, তবু নেবে না দিদি?

না রে না। দেওয়া-নেওয়া আমি ভালোবাসি না।

আচ্ছা আচ্ছা, বেশ! আমি যদি কোনোদিন তোমার কাছে একটুকরো লেবু পর্যন্ত নেই–

কে দিচ্ছে তোকে?

রাগ হইলে মতির গ্রাম্যতা প্রকাশ পায়। সে বলিয়াছিল, তোমার বড় ছোট মন দিদি। অহংকারে ফেটে পড়ছ।

জয়া কিছু বলে নাই। একটু হাসিয়াছিল।

মতির রাগকে শুধু নয়, তাহার গ্রাম্যতা ও সংকীর্ণতাকেও জয়া হাসিয়া উপেক্ষা করে। সংকীর্ণতাও মতির এক বিষয়ে নয়। তারা আসিয়া পৌঁছিবার আগেই জয়া যে সুযোগ পাইয়া ভালো ঘরখানা যে দখল করিয়াছিল, মতির মনে সেকথা গাঁথা হয়েই আছে। সোজাসুজি কিছু না বলিলেও নিজের অজ্ঞাতে কতবার সে মনের ভাব প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে। একই রান্নাঘর তাদের, পাশাপাশি উনান। মতি যেদিন ভালো মাছ-তরকারি রাধে, সেদিন রান্নাঘরের আবহাওয়া হইয়া থাকে সহজ। কিন্তু জয়া সেদিন রান্নার ঘটায়

তাহাকে ছাড়াইয়া যায় সেদিন মতির অস্বস্তিও সীমা থাকে না। সে যেন ছোট হইয়া যায়। আড়চেখে আড়চোখে সে জয়ার রান্না তরকারির দিকে তাকায়, মুখখানা কালো হইয়া আসে মতির। বনবিহারী জয়াকে বড় ভালোবাসে, যত নির্বাক ও নেপথ্যে হোক সে ভালোবাসা, মতিরও বুঝিতে বাকি থাকে না। জয়ার কাছে তাই সে অন্ধকারে ইঙ্গিতে কুমুদের অসীম ভালোবাসা প্রমাণ করিতে চাহিয়া হাস্যকর অবস্থার সৃষ্টি করিয়া বসে।

জয়া নীরবে হাসে।

হাসছ যে দিদি?

হাসব না? তুই যে হাসাস।

মতি গম্ভীর হইয়া বলে, অত হাসি ভালো নয়।

জয়ার সঙ্গে খাপ খায় না মতির। মেলামেশা আছে, গল্পগুজব আরছে, প্রতি যেন তবু জমে না। আত্মীয়ার মতো ব্যবহার করিয়াও জয়া যেন অনাত্মীয়া হইয়া থাকে, ছোটবোনটির মতো তাহার প্রতি নির্ভর রাখিয়া মতি সুখ পায় না। মিলিয়া মিশিয়া যে দিনটা ভালোই কাটে, সেদিন সন্ধ্যায় মৃদু ক্ষোভের সঙ্গে মনে হয়, সবই তো আছে, ভালোবাসা কই? আসিবার সময় পথে ট্রেনে একটি বউএর সঙ্গে মতির গলায় গলায় ভাব হইয়াছিল, এও যেন তেমনি পথের পিরিতি। এত ঘনিষ্ঠতায় সমবেদনার আনন্দ কই? টাকাপয়সা এবং আরও কয়েকটি সুবিধার জন্যই কি তারা একত্র বাসা বাঁধিয়াছে, আর কোনো সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিবে না তাদের মধ্যে? জয়ার দোষ নাই। কাঁচা মনের উচ্ছসিত আবেগে সে যা চায়, খানিক উচ্ছ্বাসভরা আদর-মমতা, জয়া কেন তা দিতে পারবে? তার শিক্ষাদীক্ষা অন্যরকম। গেঁয়ো বলিয়া অবহেলা সে মতিকে করে না, রাঁধিতে শেখায়, চুল বাঁধিয়া দেয়, সদুপদেশ শোনায়, সাস্তনা দেয়। ভাবপ্রবণতা জয়ার নাই। মতি তাকে নিষ্ঠুর মনে করে।

তাছাড়া জয়ার মনে একটা গভীর দুঃখ আছে। স্বামীর প্রতিভা তাহার অর্থাভাবে ব্যর্থ হইতে বসিয়াছে। বিবাহ সে করিয়াছিল আর্টিস্টকে, যার ভবিষ্যৎ ছিল ভাস্বর, ঘর সে করিতেছে পটুয়ার। সমবেদনার প্রয়োজন জয়ার নিজেরও কম নয়। অথচ মতি তার এ দুঃখের স্বরূপ বোঝে না। একদিন মতিকে বলিতে গিয়া তাহার বুঝিবার শক্তির অভাবে জয়া আহত হইয়াছে। বিপুল সম্ভাবনাপূর্ব কতবড় একটা জীবন যে ঘরের পাশে পঙ্গু হইয়া আছে, মতির তাহা ধারণা করিবার ক্ষমতা পর্যন্ত নাই জানিয়া মেয়েটার প্রতি একটু বিরূপ হইয়াছে বইকী জয়ার মন!

হাসিয়া উড়াইয়া দিলেও কুমুদ ও তার সম্বন্ধে মতির ঈর্ষা ও সন্দেহটা কিছু কিছু জয়া টের পাই নায় এমন নয়।

বেপরোয়া কুমুদ যে জয়াকে কিছু কিছু ভয় করে, মতি আজকাল তাহা বুঝিতে পারিয়াছে। এখানে সে যে অনেকটা সংযত হইয়া আছে তা জয়ার জন্যই।

এমন বাঁকাভাবে মতি জয়াকে এই কথাটা শোনায় যে জয়া মনে মনে রাগ করে।

কী যে তুই বলিসা কেন, আমাকে ভয় করে চলবে কেন?

তোমাকে যেন সমীহ করে চলে দিদি।

কী করে তুই তা জানলি?

মতি সগর্বে বলে, আমি ওসব জানতে পারি দিদি, যত বোকা ভাবে অত বোকা আমি নই!

জয়া বিরক্তিভাবে বলে, তাই দেখছি।

হোটেলে বনবিহারী অল্পসময়ের জন্য যাইত, তখন তাকে মতির যেরকম মনে হইয়াছিল এখানে দেখিল সে একেবারে অন্যরকম। ভয়ানক ব্যস্ত মানুষ, সময়ের সবসময়েই অভাব। ছবি আকিতে আকিতে শ্রান্তিও কি আসে না লোকটার! তুলিটি হাতে ধরাই আছে।

প্রথমে মতির মনে হইয়াছিল সে বুঝি হাসি-তামাশা খুব ভালোবাসে, হোটেলের ঘরে কীভাবেই সে হাসাইত মতিকে এখানে বনবিহারীকে তার মনে হয় একটু ভোঁতা, একটু নিস্তেজ। তার কাছে স্বামীকে জয়া একদিন যেরকম প্রতিভাবান তেজস্ব মানুষ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছিল, বনবিহারী সেরকম একেবারেই নয়। বরং তাকে ভীরু বলা যায়। জয়াকে সে যে অন্তত খুব ভয় করে, কুমুদের চেয়ে বেশি, তাতে সন্দেহ নাই। এমন নিরীহ সাধারণ লোকটির সম্বন্ধে জয়ার ওরকম ধারণা কেন মতি বুঝিতে পারে না! খুব বড়ো কিছু করিতে পারিত বনবিহারী, দেশ-বিদেশে নাম ছড়াইত, কেবল দারিদ্র্যের জন্য পারিয়া উঠিল না,-মতির মনে হয় এই আপসোস জয়া তৈরি করিয়াছে নিজে। ছবি আঁকিয়া মানুষ নাকি আবার বড় হয়।

প্রতিভা, আর্ট, শিল্পীর প্রতিষ্ঠালাভ—এসব যে কী পদার্থ, মতির তা জানা নাই, তবু জয়া ও বনবিহারীর সম্পর্কের খাপছাড়া দিকটা সে বেশ উপলব্ধি করিতে পারে। তেজ যা আছে জয়ারই আছে, স্বামীকে সে মনে করে, হইতেপারিত লাটসাহেব! নিজের ক্ষমতার পরিচয় রাখিয়াও জয়ার ভয়ে বনবিহার এতে সায় দিয়া চলে, নিপীড়িত বঞ্চিত সাজিয়া থাকে জয়ার কাছে। গরিব গৃহস্থকে স্ত্রীর কাছে রাজ্যচ্যুত রাজার অভিনয় করিতে হইলে যেমন হয় বনবিহারীরও তেমনি বিপদ হইয়াছে।

জয়া বলিয়াছিল, আমার যদি টাকা থাকত মতি! টাকার জন্যে ওকে যদি ছবি আঁকতে না হত।

টাকার জন্যই তো সবাই সব কাজ করে দিদি, করে না?

বাজে লোকে করে। যারা কবি, আর্টিস্ট, তাদের কি ও তুচ্ছদিকে নজর দিলে চলে?

মতি একটু ভাবিয়া বলিয়াছিল, টাকা জমাও না কেন? হাতে টাকা এলেই যা করে সব খরচ করো, তোমার স্বভাবও ওর মতো দিদি।

জয়া বলিয়াছিল, তুই ওসব বুঝবি না মতি। শিল্পীর মন কত কী চায়, কিছুই যোগাতে পারি না। টাকা থাকলে তবু দুদিন সচ্ছলভাবে চালাই, কোনো খোরাক তো পায় না প্রতিভার।

মতি গিয়া কখনও পিছনে দাঁড়াইয়া বিস্মিত দৃষ্টিতে বনবিহারীর ছবিআঁকা দ্যাখে। বনবিহারীর ছবিতে গাছপালা, বাড়িঘর, মানুষের পোশাক-পরিচ্ছদ সবই তার কেমন অদ্ভুত মনে হয়। টের পাইয়া বনবিহারী ফিরিয়া তাকায়। তাকায় স্নেহপূর্ণ চোখে। বলে, সময় পেলেই তোমার একখানা ছবি এঁকে দেব খুকি!

ছবি চাই না।–মতি বলে।

কেন রাগ হলে কেন?

খুকি বলতে বারণ করিনি?

বনবিহার হাসে। বলে, যদিন তোমার খুকি না হয়, খুকি ছাড়া তোমাকে কিছুই বলব না বোন, কিচ্ছুটি নয়।

এদিকে মতির চোখে পড়ে জয়া ইশারায় ডাকিতেছে। কাছে গেলে জয়া গম্ভীর মুখে বলে, ছবি আঁকবার সময় ওঁকে বিরক্ত করিস না মতি।

মতি রাগিয়া ভাবে, ওঃ একবার হুকুম শোনো মুটকির!

একদিন মতি তাহার হারটি খুঁজিয়া পায় না। শশীর উপহার দেওয়া হার, কী হইল সেটা? আগের দিন কুমুদ দোকানে কিছু টাকা দিয়াছে, বাড়িভাড়ার টাকা দিয়াছে জয়ার হাতে। মতির তা মনে পড়ে, তবু বাক্স-প্যাটরা আনাচ-কানাচ সে পাতি-পাতি করিয়া খোজে। তালপুকুরের ধারে একদিন তার কানের মাকড়ি হারাইয়াছিল, না বলিতে কুমুদ তাহাকে

কিনিয়া দিয়াছিল নূতন মাকড়ি। আজ কি সে শশীর উপহার, তার বিবাহের অলংকার, তাকে না বলিয়া আত্মসাৎ করিবে?

হার হারাইয়াছে শুনিয়া জয়া অস্বস্তিবোধ করিতে লাগিল। দুটি গরিব পরিবারের একসঙ্গে বাস করার এই একটা শ্রীহীন দিক আছে। একজনের দামি কিছু হারাইলে অন্যজনের মনে এই চিন্তাটা খচখচ করিয়া বিধিতে থাকে যে, কে জানে কার মনে কী ভাব জাগিয়াছে! এ আর কে না জানে যে দারিদ্র্য সবই সম্ভব করিতে পারে?

খোঁজ মতি, ভালো করে খোঁজ। কলতলায় পড়েনি তো? রান্নাঘরে?

মতি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, গলায় পরিনি,তো, বাক্সয় ছিল! ও আর পাওয়া যাবে না দিদি।

কুমুদ ফিরিলে জয়াই তাহাকে খবরটা দিল। কুমুদ বলিল, হারাবে কেন? আমি বিক্রি করেছি।

সে কী কুমুদ? জয়ার চমক লাগিল।

কুমুদ বলিল, হার থেকে কী হত? টাকাটা কাজে লাগল।

মতি কাঁদিতেছিল। জয়া বলিল, টাকা কাজে লাগে, হার কি কাজে লাগে না কুমুদ?

কুমুদ বলিল, গয়না যে সব মেয়েমানুষের সর্বস্ব আমি তাদের দুচোখে দেখতে পারি না।

জয়া এবার রাগ করিয়া বলিল, মেয়েমানুষ বোলো না কুমুদ, ছেলেমানুষ বলো।

ছেলেমানুষ তো গয়না সম্বন্ধে আরও উদাসীন হবে।

জয়ার রাগ বড় আশ্চর্য। মুখে চোখে দেখা যায় না, কণ্ঠস্বরে ফুটিয়া ওঠে না, তবু টের পাওয়া যায়। সে বলিল, জগৎটা যদি তোমার মনের মতো হত, কী করে তাতে বাস করতাম ভাবি। বাড়িভাড়ার টাকা না হয় পরেই দিতে?

কুমুদ বলিল, তুমি বুঝি ভেবেছ বাড়িভাড়ার টাকা দেবার জন্যই আমি হার বিক্রি করেছি?

অনেকদিন থেকে তোমায় জানি কুমুদ, আমার কাছে হেঁইয়ালি কোরো না। জয়া আর দাঁড়াইল না। সজল চোখে মতি আজ চাহিয়া দেখিল যে জীবনে আজ প্রথম কুমুদের মুখ কালো হইয়া গিয়াছে!

তখন সকাল। সারাদিন মতি মুখভার করিয়া রহিল। কুমুদ তাহাকে একবারও ডাকিল না। বেলা পড়িয়া আসিতে মতির বুক ফুলিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। এ কী অবহেলা কুমুদের? গয়নার জন্য কত কষ্ট হইয়াছে তার মনে, ডাকিয়া দুটি মিষ্টি কথা পর্যন্ত সে তাকে বলিল না হয়তো হারটির জন্য এতটুকু দুঃখও আর তার থাকিত না।

সন্ধ্যার খানিক আগে কুমুদ হঠাৎ ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া আসিল, কলের নিচে মাথাটা পাতিয়া দিয়া মতিকে বলিল, বেড়াতে যাবে তো, কাপড় পরে নাও।

মতি রোয়াকে তার সাধের টেবিলল্যাম্পটি সাফ করিতেছিল, কথা বলিল না। শুধু শেডটা নিচে পড়িয়া ভাঙিয়া গেল।

মাথা মুছিতে মুছিতে কুমুদ আবার বলিল, কাপড় পরে নিতে বললাম যে মতি!

মতি সজলসুরে বলিল, আমি যাব না।

চলো, থিয়েটার দেখাব।

না, বলিয়া মতি ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িল। কিন্তু কুমুদের কাছে তাহার অভিমান টিকিবার নয়। সাজিয়া গুজিয়া কুমুদের সঙ্গে মতিতে থিয়েটারে যাইতেই হইল। সেইখানে, স্টেজে

যখন মাতাল যোগেশ 'সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল' বলিয়া মতির বুকে কান্না ঠেলিয়া তুলিতেছে, কুমুদ তাকে খরবটা জানাইল!

এখানে চাকরি পেয়েছি মতি।

মতি মুখ ফিরাইয়া বলিল, কী বললে?

এই থিয়েটারে চাকরি পেয়েছি। একশো টাকা মাইনে দেবে।

যোগেশের সাজানো বাগানের শোক পলকে মতির কাছে মিথ্যা হইয়া গেল। সে রুদ্ধশ্বাসে বলিল, এখানে তুমি পাট করবে? কবে করবে?

এ নাটকের পরে যে নাটকটা হবে, তাতে।

তারপর আর মতির মনে একটুকু ব্যথা বা আপসোস থাকে না। সব কুমুদের ছল, হোটেলের ঘরে বন্ধুদের আনা, ম্যানেজারকে ঠকানো, জয়ার সঙ্গে মাখামাখি, হার বিক্রি করা, সবু কুমুদ তাকে পরীক্ষা করার জন্য করিয়াছে ওসব খেলা কুমুদের। এতদিন মজা করিতেছিল তাকে লইয়া, এবার কুমুদ তাকে ঘিরিয়া তার কল্পনার স্বর্গটি রচনা করিয়া দিবে। আলোকোজ্জ্বল স্টেজের দিকে চাহিয়া যোগেশকে মতি আর দেখিতে পায় না, দ্যাখে রাজপুত্র প্রবীরের বেশে কুমুদকে। সুখে গর্বে মন ভরিয়া ওঠে মতির। বাড়ি ফিরিয়া জয়াকে খবরটা শোনাইতে মতির তর সয় না। জয়া শুনিয়া বলে, এরকম চাকরি তো নিচ্ছে, আর ছাড়ছে, কমাস টিকে থাকে দ্যাখ। এক কাজ করিস মতি, কুমুদকে লুকিয়ে কিছু কিছু টাকা জমাস।

মনে মনে মতি তা করিতে অস্বীকার করে। লুকাইয়া টাকা জমাইবে না কচু! কী দরকার? টাকার জন্য কুমুদের যে কোনোদিনই আটকাইবে না, এখন হইতে মতির তাহাতে অক্ষুন্ন বিশ্বাস। সাজ খুলিতে খুলিতে উত্তেজনায় মতির চোখ জ্বলজ্বল করে। সে বোধ করে একটা অভূতপূর্ব বেপরোয়া ভাব,-কিসের হিসাব, ভাবনা কিসের? কে তোয়াক্কা রাখে কবে কিসে

কী সুবিধা অসুবিধা হইতে পারে? কী প্রভেদ গয়না থাকায় আর না-থাকায়? কুমুদের যেমন তুলনা নাই, কুমুদের মতামতগুলিও তেমনি অতুলনীয়। মজা তারপর যা হয় হইবে। কুমুদের বুকে মতি বাপাইয়া পড়ে। আহ্লাদে গলিয়া গিয়া বলে, ওগো শোনো, নাচগান শেখাবে আমায়, আজ যেমন নাচছিল? ঘরে খিল দিয়ে তোমার সামনে নাচব?

বলে, রোজ থেঠার দেখিও, রোজ। বিকেলে বিকেলে রেধে রেখে চলে যাব, অ্যাঁ?

বলে, বেচে দেবে তো দাও না, সব গয়না, বেচে দাও। ফুর্তি করি টাকাগুলো নিয়ে।

ইশ, কী নেশা দায়িত্বহীনতার, গা-ভাসানোর কী মাদকতা এই তো সেদিন বিবাহ হইয়াছে মতির, গাওদিয়ার গেঁয়ো মেয়ে মতি, এর মধ্যে কুমুদের রোগটা তার মধ্যে সংক্রমিত হইয়া গেল? তবে, একথা সত্য যে বিবাহ বেশিদিনের না হোক সম্পর্ক কুমুদের সঙ্গে তার অনেকদিনের। তালপুকুরের ধাপে সাপের কামড় খাওয়ার দিন হইতে ভিনদেশী এই কাচপোকা গায়ের তেলাপোকাটিকে সম্মোহন করিয়া আসিতেছে।

কুমুদ খুশি হইয়া বলে, আজ তুমি যে এমন মতি?

মতি বলে,–

বিন্দে শুধায় আজকে তুমি এমন কেন রাই,
অধর কোণে দেখছি হাসি, শ্যাম তো কাছে নাই?

কুমুদ বলে, মানে কী হল?

মতি বলে, বলি গো বলি–

রাই কহিলেন, ওলো বিন্দে, চোখের মাথা খেলি!
ওই চেয়ে দ্যাখ কদমতলে আমরা গলাগলি।

কুমুদ আবার বলিল, মানে কী হল?

মানে? আনন্দের নেশায় এতটুকু গেঁয়ো মেয়ে ছড়া বলিয়াছে, তারও মানে চাই? মানে তো মতি জানে না। অপ্রতিভ হইয়া সে মুখ লুকায়।

দিন পনেরো পরে নূতন নাটক আরম্ভ হইল। পর পর তিন রাত্রি মতি অভিনয় দেখিতে গেল। জয়াকে অনেক সাধ্যসাধনা করিয়াও একদিনের জন্য কুমুদের অভিনয় দেখাইতে সে লইয়া যাইতে পারিল না। কেবল বনবিহারী জয়াকে লুকাইয়া একদিন দেখিয়া আসিল। চুপি চুপি মতির কাছে প্রশংসা করিয়া বলিল যে অ্যাক্ট করার প্রতিভা আছে কুমুদের।

অভিনয় না থাকিলে দুপুরে অথবা সন্ধ্যায় কুমুদ রিহার্সেল দিতে যায়। কুমুদ না থাকিলে রাত্রে জয়া মতির কাছে শোয়। ভোরে মতির ঘুম ভাঙে না। কুমুদ বাড়ি আসিয়া মুখের পেন্ট তুলিতে তুলিতে একবার তাকে ডাকে, তারও অনেক পরে মতি ওঠে। কুমুদকে চা করিয়া দেয় জয়াই। অনেক কিছুই করে জয়া মতির জন্য, তবু অনেক বিষয়ে পর হইয়া থাকে।

এমনই ভাবে দিন কাটিতে লাগিল মতির, ঘরের কাজ করিয়া থিয়েটার বায়স্কোপ দেখিয়া বেপরোয়া ফুর্তি ও গাওদিয়ার জন্য মনোবেদনায়, আর জয়াকে কখনও ঈর্ষা করিয়া কখনও ভালোবাসিয়া। জয়ার কাছে একটু লেখাপড়া শিখিতেও আরম্ভ করিয়াছে। যে নাটকে কুমুদ পার্ট বলে সাতদিনের চেষ্টায় সেখানা মতি পড়িয়াও ফেলিল। মনে আবার আকাশস্পর্শী আশার সঞ্চার হইয়াছে। কত কী কল্পনা করে মতি, গাওদিয়ার সেই পুরানো কল্পনার স্থানে নব নব কল্পনার আবির্ভাব ঘটিয়াছে। তাছাড়া, এতদিনে আবার যেন নূতন করিয়া কুমুদকে সে ভালোবাসিতে শুরু করিয়াছে। মনে হয়, এই যেন আসল ভালোবাসা; গাওদিয়ার তালবনের ছায়ায় শুধু ছিল খেলা, এতদিনে রোমাঞ্চকর গাঢ় প্রেমের সম্ভাবনা আসিয়াছে। মাঝখানে কী হইয়াছিল মতির? মনটা কি তার অবসন্ন হইয়া গিয়াছিল? কই কুমুদের চুম্বনে এমন অনির্বচনীয় অসহ্য পুলক তো জাগিত না,– যেন কষ্ট হইত, ভালো লাগিত না। বসন্তকালে এবার কি জীবনে প্রথম বসন্ত আসিল মতির? কুমুদ যখন বই

পড়ে কাজের ফাঁকে বারবার তাহার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে পাইয়াই কত সুখ হয় মতির; কুমুদ যখন বাহিরে থাকে তখন দেহে মনে অকারণে কী এক অভিনব পুলক প্রবাহ অবিরাম বহিয়া যায় শিথিল অবসন্ন ভঙ্গিতে বসিয়া থাকিতে যেমন ভালো লাগে, তেমনি ভালো লাগে চলা-ফেরা হাত-পা নাড়ার কাজ। বাসন-মাজার মধ্যেও যেন রসের সন্ধান মেলে। এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর সমস্ত দৃশ্যে যেন সুধা ছড়ানো আছে।

জয়া বলে, কী রে, কী হয়েছে তোর? চাউনি যেন কেমন কেমন, থেকে থেকে এলিয়ে পড়িস, গদগদ কথা বলিস,-ব্যাপারখানা কী?

কী হইয়াছে মতি নিজেই কি তা জানে? মুড়ের মতো একটু মাথা নাড়ে। জয়া হাসিয়া বলে, তোকে চৈতে পেয়েছে। কাব্য লেগেছে তোর মতি।

তখন গেঁয়ো মেয়ে মতি জয়াকে কী একটা বুঝাইতে চাহিয়া বলে, মনটা উড়ু উড়ু করছে দিদি।

তাকেই চৈতে পাওয়া বলে।

জয়া একটু গম্ভীর হইয়া যায়। একপ্রকার নূতন দৃষ্টিতে সে যেন বিশেষ মনোযোগ সহকারে তাকায় মতির দিকে। মতি একটু অশ্বস্তি বোধ করিয়া বলে, তোমার ক-বছর বিয়ে হয়েছে দিদি?

দু- বছর।

মোটে? অনেক বয়সে বিয়ে হয়েছে বলো?

তোর তুলনায় অনেক বইকী। চল তো মতি তোর ঘরে যাই, কটা কথা জিজ্ঞেস করব।

কুমুদ কোথায় কী ভাবে মতিকে আবিষ্কার করিয়াছিল সে কথা জানিতে জয়া কখনও কৌতুহল দেখায় নাই। আজ মতিকে খুঁটিয়া খুঁটিয়া অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিল। প্রায় সব

কথাই। গভীর ও গোপন যেসব কথা কারো কাছে কোনোদিন প্রকাশ করা চলিতে পারে বলিয়া মতি ভাবিতেও পারে নাই। এতকাল পরে হঠাৎ জয়ার সমস্ত জানিবার আগ্রহ দেখিয়া মতি আশ্চর্য হইয়া গেল। সংক্ষেপে, রাখিয়া-ঢাকিয়া যে বলিবে জয়া তাও করিতে দিল না। সত্যের উপরে আরও কিছু বাড়াইয়া বলিলেই সে যেন খুশি হয়।

তারপর জয়া বলিল, তবে তো কুমুদ তোকে সত্যিই ভালোবাসে মতি?

এমন করিয়া একথা বলিবার মানে? কুমুদ তাকে ভালোবাসে না-তাই ভাবিয়াছিল নাকি জয়া? মতি সগর্বে জয়ার দিকে তাকায়। ভুল তো ভাঙিল তোমার, কুমুদের অনেকদিনের বন্ধু? আর মতির সঙ্গে চালাকি করিতে আসিও না।

কুমুদ শেষে তোকে ভালোবাসল মতি? জয়া বলে।

মতি আহত হইয়া জবাব দেয়, বাসবে না তো কী? আমি ওর কত জন্মের বউ তা জানো?

তাও জানিস মতি, জন্মে জন্মে তুই ওর বউ ছিলি? তুই অবাক করেছিস মতি। রূপ গুণ বিদ্যাবুদ্ধি নাচ গান নিয়ে কেউ যাকে বাঁধতে পারেনি তাকে তুই কাবু করলি, একফোঁটা মেয়ে? কম তো নোস তুই!

কে ওকে বাঁধতে পারেনি দিদি? সে কে? চেনো?

চিনি, তোকে বলব না।

বলো না দিদি বলো। পায়ে পড়ি বলো।

জয়া মৃদু বিপন্ন সুরে বলিল, বলে তোকে একটু কষ্ট দিতে সত্যি ইচ্ছা হচ্ছে মতি। তবু বলব না। কী করবি শুনে? তারা সব কে কোথায় ছিটকে পড়েছে, কে কী অবস্থায় আছে, কিছুই ঠিক নেই। তাছাড়া তোর ভয় কী মতি? কেউ আর পারবে না ছিনিয়ে নিতে। ফিরে গিয়েছিল, একবার চলে এসে তোর জন্যে আবার ফিরে গিয়েছিল গাওদিয়ায়!

জয়ার ভাব দেখিয়া মনে মনে বড় ভয় পায় মতি, হঠাৎ কী হইল জয়ার? কুমুদকে যারা বাধিতে পারে নাই জয়াও কী তাদের একজন নাকি? তা যদি হবে তবে তো বড় কষ্ট জয়ার মনে তাকে লইয়া কোন বুদ্ধিতে কুমুদ এখানে জয়ার সঙ্গে একত্রে বাস করিতে আসিয়াছিল? জয়ার জন্য ক্রমে ক্রমে মতির মন মমতায় ভরিয়া যায়। হিংসার চেয়ে সমবেদনাই সে বোধ করে বেশি।

কদিনের মধ্যেই মতি বুঝিতে পারে জয়ার যা হইয়াছে তা সাময়িক নয়। সে যেন স্থায়ীভাবেই মুষড়াইয়া গিয়াছে। কাজে যেন উৎসাহ পায় না, প্রতিভাবান স্বামীর সুখসুবিধা ও আরামের ব্যবস্থা করিতে সবসময় ব্যাকুল হইয়া থাকে না, ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কী যেন একটা দুর্বোধ্য ব্যাপার বুঝিবার চেষ্টায় ব্যাকুল হয়। মাঝে মাঝে মতি টের পায় কুমুদ ও তার মধ্যে প্রকাশ্য কথাও ভাবের আদানপ্রদানগুলি জয়া নিবিড় মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ করিতেছে। কী আছে জয়ার মনে? এমন তার নজর দেওয়া কেন? ভয়ে মতির বুক টিপটিপ করে।

অবসর সময়ে, কখনও কাজ ফেলিয়াও একটা বড় ক্যানভাসে বনবিহারী তুলি বুলায়। এই ক্যানভাসটিকে জয়া এতদিন গৃহদেবতার মতো যত্ন করিত, সাবধানতার সীমা ছিল না। এটি নাকি বিক্রির জন্য নয়, লোকের ফরমাশি নয়, প্রতিভার ফরমাশে প্রেরণার মুহূর্তগুলিকে বনবিহার এত রঙ দেয়; একদিন দেশবিদেশের একজিবিশনে ঘুরিয়া ঘুরিয়া এই ছবিটি চিত্রকরকে যশস্ত্রী করবে। অতসব মতি বোঝেনা। সে শুধু জানে সমস্ত ছবির মদ্ধে এই ছবিখানা বিশেষ একটা কিছু শেষ হইয়া গেলেই ছবিখানাকে উপলক্ষ করিয়া বড় বড় ব্যাপার ঘটিতে থাকিবে। দিনের-পর-দিন জয়া ও বনবিহারীকে ছবিখানার বিষয়ে সে আলোচনা শুনিয়াছে। কদিন এ আলোচনাতেও জয়ার যেন প্রবৃত্তি ছিল না। অথচ মাঝে মাঝে ঢাকা তুলিয়া তীব্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সমাপ্ত-প্রায় ছবিখানার দিকে মতি তাহাকে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়াছে। জয়ার মত ঈষৎ স্থূলকায়া এক রমণী কঙ্কালসার এক শিশুকে ফেলিয়া ব্যাকুল আগ্রহে এক পলাতক সুন্দর দেবশিশুর দিকে হাত বাড়াইয়া আছে- ছবিখানা এই। কোথায় কী অদ্ভুত আছে ছবিটিতে মতির চোখে তো কখনও পড়ে নাই,

তবে সেটা নিজের চোখের অপরাধ বলিয়া জানিয়া লইয়াছে। জয়ার কথা কে অবিশ্বাস করিবে যে এরকম ছবি পৃথিবীতে দু-চারখানার বেশি নাই?

কয়েকদিন পরে সকালবেলা এই ছবিখানাই জয়া ফ্যাসফ্যাস করিয়া ছিড়িয়া ফেলিল।

তেমন কান্ড, জয়ার তেমন মূর্তি, মতি কখনও দ্যাখে নাই। কুমুদ বাড়ি ছিল না, বেলা তখন প্রায় দশটা। মতি রান্না প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছিল। জয়া সকাল হইতে ভয়ানক গম্ভীর হইয়া ছিল, রাত্রে বোধ হয় স্বামীর সঙ্গে তার কলহ হইয়াছে। দু-একটা কথা বলিয়া জবাব না-পাওয়ায় কথা বলিতে মতির আর সাহস হয় নাই। কিছুক্ষণ আগে ভাত চাপাইয়া জয়া রান্নাঘরের বাহিরে গিয়াছিল। হঠাৎ জয়া ও বনবিহারীর মধ্যে তীক্ষ্ণ কথার আদানপ্রদান মতির কানে আসিল! তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া মতি দেখিল, বিশিষ্ট ছবিখানার সামনে তুলি হাতে আরক্ত মুখে বনবিহারী দাঁড়াইয়া আছে। অদূরে জয়া। তার মুখও লাল, সে থরথর করিয়া কাঁপিতেছে।

ফেলে দাও, ফেলে দাও ও-ছবি ছুড়ে। প্রেরণা ছবি আঁকতে জানো না, তোমার আবার প্রেরণা! লজ্জা করে না প্রেরণার কথা বলতে?

জয়ার গলা রুদ্ধ হইয়া আসিল। বনবিহার রাগ চাপিতে চাপিতে বলিল, এতকাল পরে এসব বলছ যে জয়া?

এতদিন অন্ধ হয়ে ছিলাম যে, মুখেই যে তুমি বিশ্বজয় করতে পারো। বড় বড় কথা বলে ভুলিয়েছিলে আমায়–তুমি ঠক জোচ্চোর!

বনবিহারী ভীরু, একথা সহ্য করিবার মতো ভীরু নয়। সে বলিল, তা হতে পারি। এতদিন যদি অন্ধ হয়ে ছিলে, আজ দিব্যদৃষ্টি পেলে কোথায়? কে চোখ খুলে দিল শুনি? কুমুদ নাকি?

তারপরেই জয়ার বঁটিতে ক্যানভাসখানা ফালা হইয়া গেল। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া গেল। জয়া ঘরে ঢুকিয়া বন্ধ করিল দরজা। বঁটিখানা তুলিবার সময় জয়ার বোধ হয় হাত কাটিয়াছিল, কয়েক ফোঁটা তাজা রক্ত রোয়াকে পড়িয়া রহিল।

এসব কী ভীষণ দুর্বোধ্য ব্যাপার মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি জয়ার? বাকি রান্না মতি সেদিন রাঁধিতে পারল না। অনেকক্ষণ পরে জয়ার ঘরের দরজায় আস্তে আস্তে ধাক্কা দিয়া সে মৃদুস্বরে জয়াকে ডাকিল। বারকয়েক ডাকাডাকি করিতে ভিতর হইতে জয়া বলিল, যা মতি যা, বিরক্ত করিস না আমাকে।

কুমুদ ফেরা পর্যন্ত মতি চুপ করিয়া ঘরে বসিয়া রহিল। সে বড় বিপন্নবোধ করিতেছিল। এসব জটিল খাপছাড়া ব্যাপার সে বুঝিতে পারে না; স্বামী-স্ত্রীর কলহ খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু এ কোনদেশী কলহ? জয়া যা বলিল, বনবিহারী যা বলিল, কী তার মানে? মতির মনে হইতেছিল এর মধ্যে কোথায় যেন তারও স্থান আছে, একেবারে জয়া ও বনবিহারীর মধ্যেই কলহটা সীমাবদ্ধ নয়। কী করিয়াছে সে, কী দোষ তার? কেহ যদি বলিয়া দিত মতিকে। অনেক বেলায় কুমুদ ফিরিয়া আসিল। ঘরে বসাইয়া চাপাগলায় মতি তাহাকে যতখানি পারে গুছাইয়া সব বলিল।

কুমুদ বলিল, তা হলেই সর্বনাশ মতি।

মতি ব্যাকুলভাবে বলিল, কিসের সর্বনাশ? কী হয়েছে? বলো না বুঝিয়ে আমায়? মাথাটাথা ঘুরতে লেগেছে বাবু আমার।

কুমুদ বলিল, পরে বুঝিয়ে বলল মতি, ভালো করে আমি নিজেই বুঝতে পারছি না কিছু। কী বিশ্রী গরম পড়েছে দেখছ? বাতাস করো দিকি একটু।

মতি আজ অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিল, নতুবা বাতাস করিবার জন্য বলিতে হইত না। ঠাণ্ডা হইয়া কুমুদ স্নান করিতে গেল। খাওয়াদাওয়ার পর সটান বিছানায় চিত হইয়া আয়োজন করিল ঘুমের। মতি বলিল, দিদিকে ডাকবে না একবার?

এখন? রেগে দরজা দিয়া আছে, কে এখন ওকে ঘাটাতে যাবে বাবা। মারতে আসবে আমাকে। যাও, খেয়ে এসো।

স্নান করিয়া মতি সবে খাইতে বসিয়াছে, জয়া দরজা খুলিয়া বাহিরে আসিল। রান্নাঘরে ঢুকিয়া কলসি হইতে এক গেলাশ জল গড়াইয়া খাইল।

মতি ভয়ে ভলে বলিল, তোমাদের ঝগড়া হল কেন দিদি?

জয়া বলিল, তুই ছেলেমানুষের মতোই থাক না মতি!

তারপর জয়া মতির ঘরে প্রবেশ করিল। মতির আর খাওয়া হইল না। উঠিতে ভয় করে, থালার সামনে থাকাও অসম্ভব। কৌতুহল মতি দমন করিতে পারিল না। উঠিয়া গিয়া দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল।

জয়া বলিতেছিল, কুমুদ, এখানে তোমাদের আর থাকা হবে না। একশো টাকা মাইনে পাও, অন্য কোথাও থাকো গিয়ে, সুবিধামতো বাড়িটাড়ি আজকালের মধ্যেই দেখে নাও একটা।

কুমুদ বিছানায় উঠিয়া বসিয়াছিল, বলিল, বোসো না জয়া। বসে কী হল খুলে বলো সব।

জয়া চেয়ারটাতে বসিল, বলিল, বলাবলিতে লাভ নেই কুমুদ। তোমরা না গেলে, আমরা চলে যাব। কালের মধ্যেই যাব।

কুমুদ শান্তভাবে বলিল, বেশ তো, আমরাই উঠে যাব কাল। সেটা কিছুই কঠিন নয়।কিন্তু কী হয়েছে আমাকে না বললে সে কোনদেশী কথা হবে?

তোমাকে বলতে বাধা নেই কুমুদ না বলে পারবও না। এখনি শুনবে শোনো। বুঝবে কি-না জানি না কুমুদ। তুমি তো জানো আমি ওকে ভালোবেসে বিয়ে করেছিলাম? হঠাৎ জানতে পেরেছি তা সত্য নয়।

কিসে তা জানলে?

তোমাদের দেখে কুমুদ। তুমি তো ভালোবাস মতিকে?

কুমুদ মৃদু একটু হাসিয়াই গম্ভীর হইয়া গেল, ঠিক জানি না জয়া। খুব সম্ভব বাসি। আরও কিছুদিন পরে হয়তো সঠিক জানা যাবে।

জয়া বলিল, না, তুমিও ওকে ভালোবাস, ও-ও তোমাকে ভালোবাসে। কদিন আগে। হঠাৎ আমার সন্দেহটা হয়। আগে তো খেয়াল করিনি। তারপর কদিন তোমাদের লক্ষ করে আমি বুঝতে পেরেছি প্রেম সম্বন্ধে এতকাল আমার ধারণাই ভুল ছিল। আমি ওকে ভালোবাসিনি, ওর প্রতিভাকে ভালোবেসেছিলাম। কুমুদ, যেদিন এটা বুঝতে পারলাম সেইদিন কী দেখলাম জানো? ওর প্রতিভাও ভুয়ো-সব আমার কল্পনা।

তোমার ভুলও তো হতে পারে?

জয়ার চোখে জল আসিতেছিল; তার কষ্টের পরিমাণটা সহজেই বোঝা যায়। অল্প একটু সমানে ঝুঁকিয়া সে বলিল, আর সব বিষয়ে মানুষের ভুল হতে পারে কুমুদ, ভুলভাঙার বিষয়ে কখনও ভুল হয় না। লজ্জায় দুঃখে আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে। কী করে এমন ভুল করলাম? এতকাল মিথ্যার মানস-স্বর্গ কী করে বজায় রাখলাম? কী আমার আত্মবিশ্বাস ছিল! মনে হত আমি ভিন্ন জগতে, কেউ আমার মতো ভালোবাসতে পারেনি, আমার ভালোবাসাই সত্যি, আর সকলের ছেলেখেলা। খাঁটি একজন আর্টিস্টের ব্যর্থ জীবনের সঙ্গে নিজের জীবন গেথে তার প্রতিভাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করে দুঃখের তপস্যা করছি ভেবে কত আত্মপ্রসাদ ছিল, সকলের ভোঁতা সাধারণ জীবনের কথা ভেবে মনে মনে কত হেসেছি। আমার তৈরি মিথ্যা আমাকে তাই গুড়ো করে দিল। কী বলো তুমি কুমুদ, মতির কাছে মুখ দেখাতে আমার লজ্জা করছে জানি না তুমি বুঝতে পারছে কি না

বুঝতে পারছি বইকী। তবে কী জানো, তোমার অনুভব করা আর আমার বোঝার। মধ্যে অনেক তফাত। কুমুদ একটু থামিল, এই, একটা কথা বলতে সাহস পাচ্ছি। হেসে উড়িয়ে দিতে পারো না?

জয়া সোজা হইয়া বসিল, তাই কি হয়? যা নিয়ে এতকাল বেঁচে ছিলাম, সব ভেঙে গেল।- চোখের পলকে জয়ার যেন ঝিম ধরিয়া যায়, মৃতের মতো দেখায় তাহাকে। তারপর সে বলিল-এটা খালি বুঝতে পারছি না, এতদিন এমন তেজের সঙ্গে কী করে নিজেকে ভোলালাম। এমন সর্বাঙ্গসুন্দর ভুল মানুষের হয় আমি তো বোকাহাবাও নই কুমুদ!

কুমুদ বলিল, কী জানো জয়া, সবাই নিজেকে ভোলায়। খিদে-তেষ্টা পেলে তা মেটানো, ঘুম পেলে ঘুমানো, এসব ছাড়া জীবনটা আমাদের বানানো, নিজেকে ভোলানোর জন্য ছাড়া বানানের কষ্ট কে স্বীকার করে? বেশিরভাগ মানুষের এটা বুঝবারও ক্ষমতা থাকে না, সারাজীবনে ভুলও কখনও ভাঙে না। বুঝতেই যদি না পারা যায়, ভুল আর তবে কিসের ভুল? কেউ কেউ টের পেয়ে যায়, তাদের হয় কষ্ট। জীবনকে যারা বুঝে, বিশ্লেষণ করে বাঁচতে চায় এইজন্য তারা বড় দুঃখী। বড় যা-কিছু আঁকড়ে ধরতে চায় দেখতে পায় তা-ই ভুয়ো। এইজন্য এই ধরনের লোকের মনে জীবন থেকে বড় কিছু প্রত্যাশা থাকা বড় খারাপ-যতবড় প্রত্যাশা থাকে ততবড় দুঃখ পায়। তুমি জানো আমি চিরদিন কীরকম খেয়ালি, দায়িত্বজ্ঞানহীন, আজ এটা ধরি কাল ওটা ধরি, জীবনটা গুছিয়ে নেবার কোনো চেষ্টা নেই, সংসারের একটুকু কাজে লাগাবার জন্যে মাথাব্যথা নেই। এরকম কেন হলাম কোনোদিন কারুকে বলিনি। অনেকদিন থেকে জানতাম। জীবনে বড়কিছু চাইতে গেলেই আমারও তোমার মতো অবস্থা হত জয়া, অনেককিছু সংগ্রহ করে দেখলাম সব ভুয়ো। তার চেয়ে যখন যা ইচ্ছে হয় তাই চাই। জোর করে কিছু চাই না- যা জোটে তাই গ্রহণ করি, কোনো প্রত্যাশা রাখি না। বড় লাভ হলে তাও অবহেলার সঙ্গে নিই। মতিকে ভালোবাসি বলছিলে, কাল যদি ওর সঙ্গে আমার চিরবিচ্ছেদ হয় দুদিনে সামলে উঠব। মতিকে দিয়ে আমি পা টেপাই জয়া।

পা টেপাও? বেশ করো। অদ্ভুত, খাপছাড়া কিছু না করলে তুমি বাঁচবে কেন? আমি যদি মতি হতাম–

অন্যকিছু করতে,-অদ্ভুত, খাপছাড়া। বাঁচার আনন্দটাই যে খাপছাড়া জয়া, খাপছাড়া কিছু না করলে–

জয়া বলিল, হ্যা। এসব জানি। আর কিন্তু বক্তৃতা দিও না কুমুদ ওবেলা বাড়ি দেখে এসে কাল তোমরা চলে যাও। চোখের সামনে তোমরা ভালবাসবে আমি সইতে পারব না।

চোখের আড়ালেও পারবে না।

সে আলাদা কথা।

বলিয়া জয়া যেন হঠাৎ আশ্চর্য হইয়া গেল।-কী ভাবলে তুমি, কী ভেবে ওকথা বললে? তুমি নিশ্চয় জানো কুমুদ, ওভাবে আমাকে তুমি কোনোদিন টানতে পারেনি? ওরকম আকর্ষণ আমার কাছে তোমার কোনোদিন ছিল না?

কুমুদ একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, তা জানি। সেইরকম ইঙ্গিত করিনি জয়া। আমরা এসে তোমার ঘর ভেঙে দিয়ে গেলাম, তাই বলছিলাম চলে গেলেও আমাদের স্মৃতি তোমার অসহ্য ঠেকবে।

জয়া ক্ষীণভাবে একটু হাসিয়া বলিল, কী চমৎকার তুমি বলতে পারো কুমুদ।-ও মতি আয় ঘরে আয়। শোন যত পারিস, এসব কথা তুই বুঝবি না। আমরা একেলেধরা মানুষ কত হেঁয়ালিই করি।

আবার বাড়ি বদলের হাঙ্গামা? জয়া তাদের এখানে থাকিতে দিবে না? না দিক। ভালোই। নতুন বাড়িতে তারা সুখেই থাকিবে। রাগে মতি মুখ ভার করিয়া থাকে। কিসে কী হইল বেচারি এখনো তা বুঝিতে পারে নাই, কুমুদের ব্যাখ্যা করার পরেও নয়। জয়াকে সে

শোনায়, কী অপরাধ করেছিলাম বাবা তোমার কাছে তুমিই জানো, ভালো করলে না দিদি, তাড়িয়ে দিয়ে ভালো করলে না। মনে রাখব। বলব সবাইকে।

কী বলবি?

তুমি কীরকম ভীষণ মানুষ তাই বলব। তোমার মনে এক, মুখে আর। কত ভালোবাসাই দেখাতে! গেল কোথায় সেসব? আমিও শক্ত মেয়ে আছি, নামটি যদি মুখে আনি তো মুখে যেন পোকা পড়ে।

নাম মুখে না আনলে সবাইকে বলবি কী করে?

মতি কাঁদো-কাদো হইয়া যায়। আর কথা বলে না।

বনবিহারী বিকালেই ফিরিয়া আসিয়াছিল, গম্ভীর বিষণ্ণ বনবিহারী। মতি দেখিল সকালবেলার কাণ্ডে ওদের কথাবার্তা বন্ধ হয় নাই। বনবিহারী খাওয়াদাওয়া করিল, জয়াকে কয়েকটা টাকাও দিল। তবে দুজনের মধ্যে যেন অপরিচয়ের ব্যবধান আসিয়াছে, বড় মনমরা দুজনে। মতি বলিল, থিয়েটারে যাবে না আজ? কুমুদ বলিল, না।

পরদিন সকালে গাড়ি ডাকিয়া জিনিসপত্র তোলা হইল। জয়া কেবল একবার বলিল যে দুপুরে খাওয়াদাওয়া করিয়া গেলে ভালো হইত না? বনবিহারী কিছুই বলিল না। জয়ার কাছে বিদায় না লইয়া মতি গটগট করিয়া গাড়িতে উঠিয়া বসিল। কুমুদের সঙ্গে কথা বলিতে বলিতে জয়া আসিয়া দাঁড়াইল দরজায়।

কুমুদ বলিল, আবার একদিন দেখা হবে জয়া।

জয়া বলিল, কে জানে হবে কি-না।

খবর নেব নাকি মাঝে মাঝে?

নিও। একা এসো।

মতির মনের গুমরানো আগুন দপ করিয়া জুলিয়া উঠিল। একা এসো কেন, জয়া কি ভাবিয়াছে তার সঙ্গে দেখা করিতে না আসিলে মতির মুখে ভাত ঢুকিবে না? গাড়ি ছাড়িলে সে কুমুদকে বলিল, কখনও আসতে পাররে না তুমি খবর নিতে। ও আমাদের তাড়িয়ে দিলে!

কুমুদ কিছুই বলিল না। মতি আবার বলিল, ও কেমন স্বার্থপর তা প্রথমদিনেই জেনেছি। আমরা আসবার আগে দিব্যি কেমন ভালো ঘরখানা দখল করে বসেছিল।

ওসব তুচ্ছ কথা মনে রেখো না মতি।-কুমুদ বলিল।

এক বাড়ির তিনতলায় দুখানা ঘর কুমুদ ভাড়া করিয়াছিল, আলাদা একটি রান্নাঘরও আছে। একখানার বদলে দুখানা ঘর পাওয়া উন্নতির লক্ষণ, মতি খুশি হইল।

জয়ার জন্য ক-দিন এখানে মতির মন কেমন করিল। কতকগুলি বিষয়ে জয়ার উপরে সে নির্ভর করিতে শিখিয়াছিল। তবে জয়ার কথা বেশি ভাবিবার অবসর মতির ছিল না। পার্থিব বিচার-বিবেচনা, মানুষের সঙ্গে ঘাত-প্রতিঘাত, এসব হইয়া গিয়াছে অপ্রধান, কুমুদের কাছে ছাড়া আর সব বিষয়ে সকল দাবিদাওয়া হইয়া গিয়াছে তুচ্ছ।

এদিকে নূতন বাড়িতে আসিয়া কুমুদ আর থিয়েটারে যায় না। শুইয়া বসিয়া বই পড়িয়া সিগারেট টানিয়া দিন কাটায়। মতি একদিন কৈফিয়ত দাবি করিল, থিয়েটারে যাও না যে!

কাজ ছেড়ে দিয়েছি মতি।

কেন?

নাটক চলল না। বললে মাইনে কমিয়ে দেবে, তাই ইস্তফা দিলাম। ব্যাটারা নাটক নেবে যা-তা, না চললে দোষ দেবে অ্যাক্টরের। থিয়েটারের চেয়ে যাত্রা ঢের ভালো মতি।

মতি চোখ বড় বড় করিয়া বলিল, তোমার পাট ভালো হয় না বললে ওরা?

কথাটা তাই দাঁড়ায় বইকী। নাটক যখন চলল না, নিশ্চয় পাট বলার দোষ। নাম-করা অ্যাক্টর তো নই যে দুটো-একটা নাটক না চললেও খাতির করবে। ভালোই হয়েছে মতি, থিয়েটারে থাকতে আমার ইচ্ছে করে না।

মতি মুখখানা পাকা গিন্নির মতো করিয়া বলিল, এবার কী করবে?

কুমুদ হাসিয়া বলিল, করব, যাহোক কিছু করব! সেজন্য ভাবনা কী? দরকার হলে গয়না দেবে না দু-একটা তোমার?

মতি বলিল, নিয়ো।

অম্লান বদনে বিনাদ্বিধায় মতি একথা বলিল। আমাদের সেই গেঁয়ো মেয়ে মতি, কুমুদ চাকরি ছাড়িয়াছে শুনিয়া সে বিচলিত হইল না, গয়না দিবার কথায় মুখখানা হইল না মান। কিসে এমন পরিবর্তন আসিল মতির? কুমুদ জাদুকর বটে। খেয়ালি যাযাবর কুমুদ, মানুষকে বশ করার অদ্ভুত ক্ষমতা আছে তার। জগতের নীতি রীতি নিয়মকানুন না মানুক, নিজের নিয়মগুলি সে নিষ্ঠার সঙ্গে মানিয়া চলে। তেজস্বিতা কম নয় কুমুদের, দুরন্ত তাহার চিত্তবৃত্তি। নিজের বাঁচিবার জগৎটা নিজের শক্তিতে গড়িয়া তোলাও সহজ পৌরুষের কথা নয়। কুমুদের কাছে মনোবেদনা ভোলা যায়, সে ভাবে না, কাদে না, দুঃখ-দুর্দশাকে গ্রাহ্য করে না, হিসাবি সাবধানী মনেরও তার কাছে আরাম জোটে।

দিন যায়। আবির্ভাব ঘটে বর্ষার। ঘরের জানালা দিয়া, রেলিং-দেওয়া সরু বারান্দায় দাঁড়াইয়া শুধু ইটের অরণ্য চোখে পড়ে মতির, তবু তারও মধ্যে সে গাওদিয়ার ছাপ আবিষ্কার করে। দক্ষিণের দোতলা বাড়িটা ডিঙাইয়া কোনো এক বড়লোকের বাগান চোখে পড়ে, সেখানকার পামগাছগুলি যেন ইঙ্গিতে মতিকে গাওদিয়ার তালবনের কথা জানায়। নিচে গলিতে উড়িয়ার মুড়ি-মুড়কির দোকান দেখিয়া মতির মনে পড়ে গাওদিয়ার বিপিন ময়রার দোকালের কথা—গ্রাম্যবেশে অচেনা লোককে পথ দিয়া যাইতে দেখিলে

গাওদিয়ার চেনা লোকের কথা মনে পড়ে। এখানকার আকাশে যে চিল বাসিয়া বেড়ায়, তাদেরও গাওদিয়ার আকাশের চিলের মতো দেখায় আকাশে মেঘ ঘনাইয়া বৃষ্টি নামা ও গাওদিয়ার চিরপরিচিত বর্ষার নিখুঁত নকল।

একদিন সত্য সত্যই মতির গহনা লইয়া কুমুদ বেচিয়া আসে। কিছুক্ষণের জন্য মতির যে একটু খারাপ লাগে না তা নয়, প্রথমবারে হারের জন্য যেরকম কান্না আসিয়াছিল সেরকম দুঃখ মতির একেবারেই হয় না। কুমুদ ফিরিয়া আসিতে আসিতে মৃদু অশান্তিটুকুও তাহার মন হইতে মুছিয়া যায়। আবদার করিয়া বলে, গয়না বেচলে আমার, কী আননে শুনি আমার জন্যে?

কুমুদ বলে, কিছু আনিনি।

তা আনবে কেন, আনবে তো না-ই!

অভিমানে কুমুদের গলা জড়াইয়া ধরে মতি, বুকে মুখ লুকাইয়া ছলনাভরে মৃদু মৃদু হাসে। বিরাট শহরের কয়েক ফিট উর্ধ্বে এই ছোট শহরের ঘরখানায় অভিনেতা স্বামীর কণ্ঠলগ্ন মতিকে দেখিয়া কেহ চিনিবে না সে গাওদিয়ার সেই মতি। বিপজ্জনক মানুষ কুমুদ, বাঁধন কাটিয়া কাটিয়া তার এতকাল জীবন কাটিল, দায়িত্বজ্ঞানহীন নির্মম মানুষ সে, তারি পরে আজ মতির নিশ্চিন্তনির্ভর দেখিলে চমক লাগে।

তখন কুমুদ বলে, তোমার জন্যে একটা জিনিস এনেছি মতি।

কই, দাও।

কুমুদ তাহাকে পকেট হইতে সেই হার বাহির করিয়া দেয়, আজ যে গয়না বেচিতে গিয়াছিল তাও ফেরত দেয়। নাটক করিয়া করিয়া কী নাটকই কুমুদ করিতে শিখিয়াছে। সহজভবে সরলভাবে কোনো কাজ করা কুমুদের কুষ্ঠিতে লেখে না। আহ্লাদে মতির কথা

জড়াইয়া যায়। এ তো শুধু গয়না পাওয়া নয়। আরও কত কী কুমুদ এইসঙ্গে তাহাকে দিয়াছে, তাহার অবোধ বালিকা বধূকে।

টাকা পেলে কোথায়?

বড়লোক বন্ধুর কাছে ধার করলাম।

মতি হি-হি করিয়া হাসে, ধার না ছাই, ফেরত যা দেবে তা জানি!

কুমুদও হাসিয়া বলে, তার ঢের টাকা আছে। না দিই না দেব ফেরত, তার কিছু এসে যাবে না তাতে।

অন্য লোক দিয়া বিনোদিনী অপেরার অধিকারীর কাছে কুমুদ একটা খবর পাঠাইয়াছিল। দুদিনের মধ্যে কুমুদের ঘরে তাহার আবির্ভাব ঘটিল। ঘরে ঢুকিয়াই বলিল, আচ্ছা লোক বটে তুমি যা হোক কুমুদ কী বলে অমন করে পালিয়ে গেলে শুনি?-একেবারেই পাত্তা নেই তোমার!

কুমুদ হাসিয়া বলিল, বসুন ঘোষমশায় বসুন। ভালো আছেন? দলটা চলছে কেমন?

খাসা চলছে। তুমি যাবার পর দলের আরও উন্নতি হয়েছে।

কুমুদ বলিল, বেশ বেশ, শুনে বড় সুখী হলাম। বড় রেগেছেন আমার পরে না?

একথার জবাবে কুমুদকেই মধ্যস্থ মানিয়া অধিকারী বলিল, রাগ হয় কিনা তুমিই ভেবে দ্যাখো। আগাম অতগুলো টাকা নিয়ে কোথায় যে পালিয়ে গেলে–

পালাব কেন ঘোষমশাই, পালাইনি। কমাসের ছুটি নিয়েছিলাম, বিয়েটিয়ে করলাম। কি-না। আজকালের মধ্যে একবার যাব ভাবছিলাম আপনার কাছে।

অধিকারী বিস্মিত হইয়া বলিল, বিয়ে করেছ নাকি? বিয়ে তাহলে তুমি করলে? – কথাটা সহজে সে যেন বিশ্বাস করে না। তারপর গম্ভীর হইয়া বলিল, তাই যদি করলে বাপু, আমার মেয়েটাকে করলে না কেন? আমার মেয়ে কী দোষ করেছিল শুনি?

কুমুদ চুপ করিয়া রহিল। অধিকারী খানিকক্ষণ একটু অন্যমনা হইয়া রহিল।

অমন মেয়ে পেতে না কুমুদ। দেখেছ তো বাপু তাকে। বলো তো, তুমিই বলো, ও রকম মেয়ে সহজে মেলে? তাকে তোমার তখন মনে ধরল না! পাগল কী বলে সাধে!

অনেকক্ষণ বসিয়া অধিকারী অনেক কথা বলিল। একটা বোঝাপড়াও হইয়া গেল কুমুদের সঙ্গে। কুমুদ আবার বিনোদিনী অপেরায় যোগ দিবে। আগাম যে টাকাটা লইয়াছিল সেটা বাতিল হইয়া গেল, বিবাহের যৌতুক বলিয়া ধরিয়া নেওয়া গেল সেটা। কুমুদের সঙ্গে তো আর পারা যাইবে না, অধিকারীর সর্বনাশ না করিয়া সে ছাড়িবে কি!

দলটা আবার ভালো করে গড়ে নিতে হবে কিন্তু বাপু তোমায়, শুধু পার্ট বললে চলবে না!

কুমুদ হাসিয়া বলিল, তাই কি চলে? দল ভালো না হলে আমার পার্টও জমবে কেন?

মুখভরা হাসি লাইয়া অধিকারী সেদিন বিদায় হইল।

কুমুদ তো আবার যাত্রা করিবে, এদেশে ওদেশে ঘুরিয়া রাজপুত্র প্রবীর সাজিবে। মতির কী হইবে? সে থাকিবে কোথায়? কার কাছে? এ বড় সহজ সমস্যার কথা নয়। কিন্তু মতির কোনো ভাবনাচিন্তা আছে বলিয়া মনে হয় না। আনন্দের যে মাদকতায় সে মশগুল হইয়া আছে, ভাবনাচিন্তার ক্ষমতাও যেন তাহাতে ক্রমেই লোপ পাইয়া আসিয়াছে।

কুমুদ শেষে কথা তুলিল। বলিল, আমি এখন যাত্রা করতে যাব, তুমি কোথায় থাকবে মতি?

মতি ঘাড় কাত করিয়া বলিল, তুমিই বলো না?

গাওদিয়া যাবে?

গাওদিয়া? মতির যেন চমক লাগে। গাওদিয়ার কথা মন হইতে মুছিয়া ফেলিবার আদেশ যে দিয়াছিল, সে আবার যাচিয়া সেখানে যাওয়ার কথা বলিতেছে। কুমুদের চোখে মতি চোখ মেলায়। কী খোজে মতি কুমুদের চোখে? পলকে কুমুদ খোলস বদলায়, আজ যা বলে কাল তা বাতিল করিয়া দেয়, তবু কি তার মধ্যে এমন একটা অপরিবর্তনীয়তা থাকা সম্ভব যার মৌলিকতা মতির মতো মেয়েকেও বিহবল করিয়া দেয়।

গাওদিয়া যেতে বলছ?

তাই থাকো গিয়ে ক মাস। আমি এদিকটা একটু গুছিয়ে নি।

কী গুছাবে?

কুমুদ গম্ভীরভাবে বলে, দলটা গড়ে তুলব, টাকাপয়সা জমাব, সবই তো গুছোতে বাকি।

খুবই সুবিবেচনার কথা। তবু শুনিয়া মতির যেন কষ্ট হয়। এ ধরনের কথা কি মানায় কুমুদের মুখে? তিন মাস আগেও হয়তো কুমুদকে হিসাবি বিবেচক দেখিলে মতি খুশি হইত। এখন আর সে চায় না। তেমনি কুমুদই তার ভালো, যে বড় বড় কথা বলে, কাজের বদলে শুইয়া থাকে, ভালোবাসে তবু পা টেপায়।

কুমুদ বলে, এসে নিয়ে যাবার জন্য তোমার দাদাকে একখানা চিঠি লিখে দাও মতি।

তুমি লেখো না?

না, তুমিই লেখো।

মতি গম্ভীর মুখে বলে, তুমি তবে ঠিকানা লিখে দিও, অ্যাঁ?

মতির এই চিঠির জবাবে পরাণ ও শশী দুজনেই কলিকাতা আসিল। শশীর আগমনটা শুধু মতিকে দেখিবার জন্য, কাজ ছিল। কুমুদকে শশী অনেক কথা বলিবে ভাবিয়াছিল। কিছুই বলা হইল না। মতিকে দেখিয়া সে বাক্যহারা হইয়া গেল। এই মতি কি তার চোখের সামনে বড় হইয়াছিল গাওদিয়ার গ্রাম্য আবহাওয়ায়? এ যেন শশীর অচেনা মেয়ে, অচেনা জগতে এতকাল বাস করিয়া আজ প্রথম তার সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। ফ্যালফ্যাল করিয়া হাবার মতো যে চাহিয়া থাকিত, জলে-ধোয়া আলোর মতো কী স্নিগ্ধোজ্জল তার চাহনি এখন। কী ভারী চলন মতির, কী রমণীয় তার ভঙ্গিমা। মতির অঙ্গুলি-হেলনও আজ যেন মধু, অর্থময়। মনে হয়, তার দেহ-মন অহরহ করে আকর্ষণ ও আহানের জন্য প্রতিটি মুহূর্ত উদ্যত, উৎকীর্ণ হইয়া আছে।

কুমুদ একান্তে বলিল, কীরকম দেখছিস শশী মতিকে?

ওকে তুই কী করেছিস কুমুদ?

কিছুই করিনি। শুধু কথা বলেছি আর চুপ করে থেকেছি।

বিন্দুরও পরিবর্তন হইয়াছিল, এও পরিবর্তন। শশী ভাবিত হইয়া বলিল, গাওদিয়া পাঠাচ্ছিস, সেখানে থাকতে পারবে কি-না ভাবছি কুমুদ।

এ তোর কীরকম ভাবনা শুনি? গাওদিয়ায় বড় হল, সেখানে গিয়ে থাকতে পারবে না?

বিন্দুও গাওদিয়ায় বড় হইয়াছিল, সেখানে গিয়া থাকিতে পারো নাই। কিন্তু শশী আর কিছু বলিল না। সারাদিন সে বিমনা হইয়া রহিল। মতির চোখে যখন বিদ্যুৎ চমকিয়া যায় কুমুদের চোখের সঙ্গে তখন সে তুলনা করে। এ আলো তাহার চোখে নাই। কুমুদের কাছে আজ আবার নিজেকে শশীর ছোট মনে হইতে থাকে।

মতির সুখে আনন্দে উজ্জ্বল মুখচ্ছবি, মতির পুলকমন্থর গতিশ্রী দেখিয়া মাঝখানে কুমুদের সম্বন্ধে যতটুকু অবজ্ঞা মনে আসিয়াছিল সব যেন আজ মুছিয়া যায়। কুমুদের জীবনের যা

মূলমন্ত্র তার সন্ধান শশী কখনও পায় নাই, আজ ওই বিষয়েই শশী চিন্তা করে। কী আছে কুমুদের মধ্যে দুর্বোধ্য গোপন সম্পদ, জীবনকে আগাগোড়া ফাকি দেওয়া সত্ত্বেও যাহা জীবনকে তাহার ঐশ্বর্যে ভরিয়া রাখিয়াছে?

এতকাল খবর না-দেওয়ার জন্য পরাণ ও শশীর কাছে মতি প্রথমটা একটু সংকোচ বোধ করিতেছিল, ও বিষয়ে কেহ অনুরোগ না দেওয়ায় অল্পক্ষণের মধ্যেই সে কথাটা ভুলিয়া গেল। পরাণ খুব রোগ হইয়া গিয়াছে, তাহার বিষণ্ণ শুষ্ক মুখ দেখিয়া বড় মমতা হইতে লাগিল। বারবার সে জিজ্ঞাসা করিল কী অসুখ হইয়াছে পরনের। তারপর খুঁটিয়া খুঁটিয়া গ্রামের কথা, মোক্ষদা ও কুসুমের কথাও জানিয়া লইল। একটু সলজ্জ মতি, একটু সাহসী। একজনের বউ হিসাবে দাদা ও শশীর কাছে ধরিতে গেলে এই তার প্রথম দাঁড়ানো, নিজের বাড়িতে নিজের সংসারে বাপের বাড়ির সংবাদ জানিতে একটু গৃহিণীর মতো ভাব দেখানোর অধিকারও তার ন্যায্য। ভাদ্রমাসের গরম, পাখা লইয়া মতি ওদের বাতাস করিল, তৃষ্ণায় যোগাইল শীতল জল। মতির কাজ আজ কত নিখুঁত, কত কোমল তাহার সামান্য সেবা। অনেক যত্ন করিয়া মতি আজ রান্না করিল। খাইতে বসিয়া শশী প্রশংসা করিল রান্নার, পরাণ কিন্তু একরকম কিছু খাইল না। মতি অনুযোগ দিলে বলিল, গলায় একটা ঘা হয়েছে মতি, ঝোল-তরকারি খেতে কষ্ট হয়।

গলায় ঘা হয়েছে? কেন?

মতির ব্যাকুল প্রশ্নে অবাক হইয়া শশী হাসিতে ভুলিয়া গেল। মনে যার ভাবসমুদ্র উথলিতে থাকে, কারো গলায় ঘা হইয়াছে শুনিলে সে-ই শুধু এমন ব্যাকুল হয়। পরাণ অত বোঝে না, সে একটু হাসিয়া বলিল, গলায় ঘা হয় কেন আমি তা জানি? ছোটোবাবু ডাক্তার মানুষ ওঁকে শুধো।

মতি আরো ব্যাকুল হইয়া বলিল, কী দিয়ে তুমি ভাত খাবে? আগে কেন বললে না, তরকারিতে ঝাল কম দিতাম?

ঝাল কম দিলেও তরকারি খেতে পারি না মতি।

তবে দুধ খাও, দই খাও। মিষ্টি আনাই।

এবার পরানের চোখে জল আসিল। সে চাষাভূষা মানুষ, জীবনে কারো কাছে সে এমন মোলায়েম আদর পায় নাই।

পরাণই মতির মনকে গাওদিয়ার দিকে টানিতেছিল বেশি করিয়া। গলায় ঘা হওয়ায় কিছু সে খাইতে পারে না, না-খাইয়াই দাদার এতবড় প্রকান্ড শরীরটা শুকাইয়া গিয়াছে। গাওদিয়া গিয়া এবার দাদার খাওয়ার বিশেষ ব্যবস্থা করিবে, নিজের সুখসুবিধার সম্বন্ধে এমন উদাসীন পরাণ! কত কাজ কত সেবা সে যে শিখিয়াছে, কীরকম চালাক চতুর হইয়া উঠিয়াছে, সকলকে তাহা দেখাইবার লোভটাও মতির মনে জাগিয়া উঠিতেছিল। সকলে অবাক হইয়া যাইবে। না জানি কী বলিবে কুসুম গায়ের মেয়েরা আসিয়া সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করবে, এতকাল সে কোথায় ছিল, কী বৃত্তান্ত।

দুদিন পরে কুমুদকে যাইতে হইবে,-অনেকদূর বিনোদিনী অপেরার আহবান আসিয়াছে। কী পার্ট করিবে কুমুদ? সেই রাজপুত্র প্রবীরের—আহা, মতি আর প্রবীরবেশী কুমুদকে দেখিতে পাইবে না, শুনিতে পাইবে না তার রোমাঞ্চকর বক্তৃতা। ভাবিয়া মুখ স্নান করা ছাড়া আর কী করা যায়? মতি যে মেয়েমানুষ, বে যে মতি আহা, মানুষ যদি পুরুষ, পুরুষেরা হইতে পারিত মেয়ে।

কুমুদ বলে, হচ্ছে মতি, আজকাল তা হচ্ছে।

কুমুদকে সবলে আঁকড়াইয়া ধরিয়া মতি বলে, যাঃ!

কুমুদ হাসে, বলে, কেন, তুমি নিজের চোখেই তো দেখে এসেছ। জয়া ছিল পুরুষ, বনবিহারী ছিল মেয়ে। নয়?

মতি হাসে না।

জয়াদিদিকে দেখতে যাবে না একবার?

যাব যাব, ব্যস্ত কী?

বলিয়া হাই তোলে কুমুদ।

আগামী বিরহের ছায়া ও গাওদিয়া ফিরিবার আগাম আনন্দের আলো দুদিন ধরিয়া মতির মুখখানাকে খেলিয়া বেড়াইল। তারপর আসিল কুমুদের যাওয়ার দিন।

বিকালে গাড়ি। কুমুদের যাওয়ার সময় আগাইয়া আসিলে মতি ভয়ানক উতলা হইয়া উঠিল; এত কষ্ট হইতে লাগিল যে মতি নিজেই সেজন্য আশ্চর্য হইয়া গেল। গাঁ ছাড়িয়া আসিবার সময়ও তাহার মন কাঁদিতেছিল, সে কষ্ট তো এরকম নয়? কষ্টই বা কেন? কী সে হারাইতে বসিয়াছে চিরদিনের জন্য? হয়তো পনেরো দিন, হয়তো একমাস কুমুদকে সে দেখিতে পাইবে না। তাতে কাতর হওয়ার কী আছে? মন তবু বোঝে না মতির। শশী ও কুমুদ গল্প করে, করুণচোখে কুমুদের দিকে চহিয়া মতির বুকের মধ্যে তোলপাড় করিতে থাকে।

শশী একসময় বলিল, চলো। মতি, আমরা স্টেশনে গিয়ে কুমুদকে গাড়িতে তুলে দিই। যাবি?

হ্যাঁ-না মতি কিছু বলিল না। যাওয়ার আগে কাপড় পরিয়া জুতা পায়ে দিয়া প্রস্তুত হইয়া রহিল। শশী বারবার বিস্মিত চোখে তাহার বিষণ্ণ মুখ, ছলছল চোখের দিকে চাহিতেছিল। এক অপূর্ব ভাবাবেগে সেও উতলা হইয়া উঠিতেছিল। সংসারে হয়তো এমন অনেক আছে, মতির মতো এমন করিয়া ভালো হয়তো অনেকেই বাসে, কিন্তু, মতি ইহা শিখিল কোথায়? অনুভূতির এমন গভীরতা তাহার আসিল কোথা হইতে?

এ যে ভাবপ্রবণতা নয়, কাঁচা মনের অস্থায়ী আবেগ নয়, বালিকা মতির বিরহকাতরতায় এক অপূর্ব ধৈর্যের সমাবেশ দেখিয়া শশী তা বুঝিতে পারিয়াছিল।

স্টেশনে যখন তাহারা পৌঁছিল তখনও আকাশ-ভরা রোদ। গাড়ি ছাড়িতে বিলম্ব ছিল। গাড়িতে ভিড় ছিল না, খানিকক্ষণ কামরার মধ্যে বসিয়া কুমুদের সঙ্গে কথা বলিয়া পরাণকে ডাকিয়া শশী নামিয়া আসিল। বলিল, তোরা বোস, আমরা একটু ঘুরে আসছি।

ওরা চলিয়া গেলে মতি পাংশুমুখে কুমুদকে বলিল, তুমি যেও না। থাকতে পারব না, মরে যাব।

কুমুদ বলিল, স্টেশনে বিদায় দিতে এলে ওরকম মনে হয় মতি।

কাল থেকে এমনি হচ্ছে।

কাল থেকে হচ্ছে। কাল তো কিছু বলেনি? আর হচ্ছে যদি হোক না,-এও তো কম মজা নয়!

মজা? সমস্ত পৃথিবী যে তার চোখে অন্ধকার হইয়া আসিতেছে। কুমুদ কি তা বুঝিতে পারিতেছে না, যে সব বোঝে? কুমুদের নিষ্ঠুরতাকেও ভালোবাসিতে শিখিয়াছিল, তবু আজ সে আহত হইল। পাশের লাইনে একটা যাত্রী-বোঝাই গাড়ি ছাড়িয়া গেল,-মতির মন তাহার চাকার তলে পিষিয়া যাইতেছে। আর সময় নাই, আর উপায় নাই। আর ফেরানো যায় না কুমুদকে। এ গাড়ি ছাড়িয়া যাওয়ার পর বুকটি ফাটিয়া যাইবে, তবু সে তো রদ করিতে পারিতেছে না। কেমন করিয়া কুমুদকে সে তার ব্যাকুলতা বুঝাইবে এখন? যাওয়ার জন্য গাড়িতে উঠিয়া কেউ কী ফেরে?

কুমুদের দুটি পা ধরিয়া সে যে কাঁদিয়া উঠিবে সে উপায়ও নাই। গাড়ির লোকগুলি বোধ হয় হা করিয়া তার দিকেই চাহিয়া আছে।

কুমুদ একথা ওকথা বলে, চিরদিনের মতো ধীর স্থির অবিচল কুমুদ। মতির কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসিতে চায়, তবু প্রাণপণে সে কথার জবাব দেয়। মিনিটগুলি একে একে পার

হইয়া যাইতে থাকে। গাড়ি ছাড়িবার অল্প আগে ফিরিয়া আসে শশী ও পরাণ। কী কুক্ষণেই ওদের মতি কলিকাতা আসিতে লিখিয়াছিল!

তারপর শশী বলে, চলো মতি, আমরা নামি এবার।

মতি বলে, আপনার নামুন, আমি একটা কথা কয়ে নিয়ে নামছি।

মতির এই স্বাভাবিক নির্লজ্জতায় শশী ও পরাণ স্তম্ভিত হইয়া যায়,-শশী যেন একু রাগ করিয়াই গাড়ি হইতে নামে। প্রেম আসিয়াছে বলিয়া এত কী বাড়াবাড়ি অতটুকু মেয়ের!

কুমুদ মৃদুস্বরে হাসিয়া বলে, পাকা গিন্নির মতো করলে যে মতি? কী কথা বলবে?

বলছি দাঁড়াও,—আসছি।

বলিয়া কুমুদকে পর্যন্ত স্তম্ভিত করিয়া দিয়া মতি ল্যাভাটরিতে ঢুকিয়া গেল। গাড়ি ছাড়ার ঘণ্টা পড়িল, গার্ড নিশান দেখাইল, প্ল্যাটফর্মে শশী ও পরাণ অস্থির হইয়া উঠিল, তবু মতি বাহির হইল না। গাড়ি ছাড়িলে গাড়ির সঙ্গে চলিতে চলিতে শশী বলিল, আমরা কেউ উঠব নাকি কুমুদ, পরের স্টপেজে ওকে নামিয়ে নেব?

কুমুদ বারণ করিয়া বলিল, না না, দরকার নেই। আমিই ব্যবস্থা করব শশী।

গাড়ি প্লাটফর্ম পার হইয়া গেলে মতি বাহির হইয়া আসিল। বলিল, এ কী হল? আমি যে নামতে পারলাম না?

কই আর পারলে?

কী হবে তবে?

কুমুদ হাসিয়া বলিল, কিছু হবে না মতি, বোসো। এরকম ছলনা করলে কেন? বললেই হত সঙ্গে যাবে?

মতি বসিয়া বলিল, ওরা ছিল যে, গোলমাল করত।

গাড়ির সমস্ত লোক সকৌতুকে তাহাদের দিকে চাহিয়া ছিল, কারো তা খেয়াল ছিল না। গাড়ির গতি বাড়িতে বাড়িতে মতির মুখের বিবর্ণতা ঘুচিয়া যাইতেছিল। বারকয়েক সে জোরে জোরে নিশ্বাস গ্রহণ করিল।

কুমুদ বলিল, সঙেগ তো চললে, কোথায় থাকবে কী করবে সে সব ভেবে দেখেছ?

কুমুদের মতো বেপরোয়াভাবে মতি বলল, ওর আর ভাবব কী?

গৃহবিমুখ যাযাবর স্বামীর সঙ্গে মতিও আজ এলোমেলো পথের জীবনকে বরণ করিল- আমাদের গেঁয়ো মেয়ে মতি। হয়তো একদিন ওদের প্রেম নীড়ের আশ্রয় খুঁজিবে, হয়তো একদিন ওদের শিশুর প্রয়োজনে নীড় না বাঁধিয়া ওদের চলিবে নাজীবনযাপনের প্রচলিত নিয়মকানুন ওদের পক্ষেও অপরিহার্য হইয়া উঠিবে। আজ সে কথা কিছুই বলা যায় না। পুতুলনাচের ইতিকথায় সে কাহিনী প্রক্ষিপ্ত—ওদের কথা এখানেই শেষ হইল। যদি বলিতে হয় ভিন্ন বই লিখিয়া বলিব।

১২. হাসপাতালের নবনির্মিত গৃহটি

হাসপাতালের নবনির্মিত গৃহটি দেখিতে ভারি সুন্দর হইয়াছে। ইটের উপরে লাল-রঙ-করা ছোটখাটো ঝকঝকে সুশ্রী বাড়িখানা দেখিয়া আপসোস হয় যে একটা না দেখিয়া যাদবের মরা উচিত হয় নাই। সামনে কানিশের নিচে ইংরেজিতে বড় বড় অক্ষরে লেখা হইয়াছে—যাদব মেমোরিয়াল হস্পিটাল। তবু লোকে মুখে বলিতে বলে, শশী ডাক্তারের হাসপাতাল। যাদবকে যে লোকে ভুলিয়া গিয়াছে তা নয়। যাদবের সঙ্গে হাসপাতালের সম্পর্কটা প্রত্যক্ষগোচর হইয়া থাকে নাই,-অথচ এদিকে শশীকেই সকলে হাসপাতালটি গড়িয়া তুলিতে দেখিয়াছে এবং এখন সে-ই সমাগত রোগীদেও সযত্নে বিতরণ করিতেছে ওষুধ।

হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার হাঙ্গামা শেষ হইয়াছে, শশীর যশ ও সম্মানের বৃদ্ধি স্থগিত হয় নাই। জনসাধারণের সমবেত মনটা চিরদিন একাভিমুখী, যখন যেদিক ফেরে সেই দিকেই সবেগে ও সতেজে চলিতে আরম্ভ করে। জনরবের তিলটি যে দেখিতে দেখিতে তাল হইয়া উঠে তার কারণও তাই। লোকমুখে ছোট ঘটনা বড় হয়-মানুষও হয়। শশী অসাধারণ কাজ কিছুই করে নাই। যাদব যে কর্তব্যভার তার উপরে চাপাইয়া দিয়া গিয়াছিলেন সেটুকু কেবল ভালোভাবে সম্পন্ন করিয়াছে। ফলটা হইয়াছে অচিন্তিতপূর্ব। নেতার আসনে বসাইয়া সকলে তাহাকে অনেক উঁচুতে তুলিয়া দিয়াছে। কয়েকটি স্থানে বক্তৃতা করিয়া শশীর বলিবার ক্ষমতাটাও খুলিয়া গিয়াছে আশ্চর্যরকম। সভা-সমিতিতে এখন তাহাকে প্রায়ই বলিতে হয়, সকলে নিবিড় মনোযোগের সঙ্গে তার কথা শোনে। শশী আবেগের সঙ্গে কথা বলিলে সভায় আবেগের সঞ্চার হয়, হাসির কথা বলিলে আকস্মিক সমবেত হাসির শব্দে সভার আশেপাশের পশুপাখি চমকাইয়া ওঠে।

সময় সময় শশীর মনে হয় সে যে গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে ঠিক করিয়াছিল সেইজন্য গ্রামের জীবন এমন অসংখ্য বাঁধনে তাহাকে বধিয়া ফেলিয়াছে। এই আকস্মিক জনপ্রিয়তা তাকে এখানে ভুলাইয়া রাখিবার জন্য। ভাগ্যে এটা পুরস্কার নয়, ঘুম। এ তো সে চায়

নাই, এ ধরনের সম্মান ও প্রতিপত্তিঃ জীবনের এই গম্ভীর রূপ তাকে কিছু কিছু অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে সত্য, কিন্তু এ ধরনের সার্থকতা দিয়া সে কী করিবে?

একদিন সকালবেলা পরান ডাক্তারখানায় আসিয়া হাজির। শুষ্ক শীর্ণ মূর্তি, গলায় কম্ফটার জড়ানো, দেখিয়া দুঃখ হয়। দেখিয়া দুঃখ হইবার অবসর শশীর ছিল না। কত দায়িত্ব তাহার, কত কাজ। শশীর মতো ডাক্তারবন্ধু থাকিতেও এমন রোগা হইয়া গিয়াছে পরান? কী হইয়াছে পরানের? গলায় ঘা, খাইতে পারে না? সে তো অনেক দিন আগে হইয়াছিল, মতির চিঠি পাইয়া তাহাকে আনিতে কলিকাতা যাওয়ার সময়। সে ঘা এখনো শুকায় নাই? শশী আশ্চর্য হইয়া যায়, বলে যে, গলার ঘা এতদিন থাকিবার কথা নয়—সে যে ওষুধ দিয়াছিল পরান বুঝি তা ব্যবহার করে নাই? এতকাল সে ঘুমাইতেছিল নাকি?

হাসপাতালের ব্যস্ত-সমস্ত ডাক্তারের মতো ভাব শশীর,-যেন তার কাছে এসময় পরানের পর্যন্ত খাতির নাই! কথা বলিতে বলিতে সে একটা প্রেসক্রিপশন লিখিতে থাকে। রোগী যে খুব বেশি আসিয়াছে তা নয়, হাসপাতালের ভয় ভাঙিতে গ্রামের লোকের কিছু সময় লাগিবে। জন-সাতেক পুরুষ রোগী শশীর টেবিলের সামনে দাঁড়াইয়া আছে, আর দরজার বাহিরে ঘোমটা দিয়া বসিয়া আছে একটি বউ, একটি পৌঢ়া স্ত্রীলোক, বোধ হয় সে বউটির শাশুড়ি, পিঠে এক হাত আর সামনে এক হাত দিয়া আধজড়ানো ভাবে বউটিকে ধরিয়া রাখিয়াছে। সম্ভবত দুজনেই পরস্পরের কাছে খুঁজিতেছে সাহস। এই তো ক- জন রোগী, পরানকে শশী বসিতে বলারও সময় পাইল না? পরানের পায়ে জুতা নাই, শার্টে ইস্ত্রি নাই, চুলে টেরি নাই বলিয়া নয় তো? ঘরের কোনে বসিয়া মনে মনে বিশ্বজয় করিবার সময় যে ছিল বন্ধু, যার প্রতি স্মরণ করিয়া বাদলঘন উতল দুপুরে কুসুমকে সে ঘর হইতে বিদায় দিয়াছিল, একটা এতটুকু হাসপাতাল সৃষ্টি করার গৌরবে তাকেই শশী আজ এমন অবহেলা করিবে নাকি! টেবিলের এপাশে একটা চেয়ার আছে, তাতে না হোক অনেকটা তফাতে যে টুলখানা আছে তাতে পরানকে শশী বসিতে দিক।

গলায় বড় যন্ত্রণা হয় ছোটোবাবু।

শশী মুখ তুলিয়া বলিল, এসো দেখি কাছে সরে। হাঁ করো।

চেয়ারে বসিয়া স্পষ্ট দেখা গেল না, দরজার কাছে আলোতে যাইতে হইল। ভালো করিয়া দেখিয়া শশী বলিল, ঘা-টা ভালো মনে হচ্ছে না পরান। এক কাজ করো তুমি; একটু বোসো, এদের বিদায় করে দিয়ে আবার দেখব।

টুলটার উপর পরান বসিয়া রহিল। একে একে সমাগত রোগীদের দেখা শেষ করিয়া শশী হাসপাতালের দক্ষিণকোণের ছোট ঘরখানায় পরানকে ডাকিয়া লইয়া গেল। এটা তার খাসকামরা। এই খাসকামরাটি উপলক্ষ করিয়া কমিটির সভ্যদের সঙ্গে শশীর একটু মনোমালিন্য হইয়াছিল। গাঁয়ের ছোট একটা হাসপাতালের নগণ্য ও অবৈতনিক ডাক্তার, হাকিম-হুকিমের মতো তার আবার খাসকামরা কিসের? শশী কারো কথা শোনে নাই। স্বার্থপরের মতো এই ঘরখানা সুন্দরভাবে সাজাইয়া লইয়াছে। শশীর মনের গতি কে অনুধাবন করিবে? কমিটির প্রাচীন সভ্যদের তো জানিবার কথা নয় যে হাসপাতালের বেগার-খাটা শশী ডাক্তার দরকারের সময় ছাড়াও হাসপাতালে পড়িয়া থাকিতে ভালোবাসিবে! বাড়িতে শশীর যে মন টেকে না এ কথা এ জগতে বোধহয় শুধু টের পাইয়াছে গোপাল !

পরানের গলায় ঘা শশী যত পরীক্ষা করে ততই তার মুখ গম্ভীর হইয়া আসে। বলে– ঢোক গেলো পরান, ঢোক গেলো। কেন পারছ না? পারা তো উচিত। আচ্ছা, একটু জল খাও তবে। ঢোক গিলিতে না-পারার মতো অবস্থা তোমার হয়নি পরান, ভয়ে পারছ না।

জল খাইয়া পরান একটু সুস্থ হয়। ঢোকও গেলে, একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলে, হঠাৎ কেমন ভয় হল ছোটোবাবু, প্রাণটা কেমন আঁকুপাঁকু করে উঠল।

শশী বলে, না-খেয়ে না-খেয়ে যা শুকিয়েছ প্রাণটাকে, আকুপাকু করবে না? রোজ একবার এসে দেখিয়ে যেও গলাটা, আজ ঠিক বুঝতে পারলাম না। একটা ওষুধ লাগিয়ে দিচ্ছি, বিকালে আর একবারে নিজে লাগিও।

তুলিতে করিয়া পরানের গলায় ওষুধ লাগাইয়া বলে, পারবে দিতে নিজে? না পারো তো কাজ নেই, ও বেলা একবার যাবখন তোমাদের বাড়ি, লাগিয়ে দিয়ে আসব।

পরান বিদায় নেয়। খোলা জানালায় দাঁড়াইয়া শশী তার লম্বা পা দুটির ছোট ছোট পদক্ষেপ চাহিয়া দেখে। তারপর টেবিলের সামনে চেয়ার টানিয়া বসিয়া মোটা একটা ডাক্তারি বই খুলিয়া নিবিষ্টচিত্তে পড়িতে আরম্ভ করে। মাঝে মাঝে মুখ তুলিয়া ভাবে, অন্য বই টানিয়া পাতা উল্টায়, কী একখানা বই খুঁজিয়া লইতে সমস্ত বইয়ের নামের উপর চোখ বুলায়। তারপর অসময়ে ব্যস্তভাবে শশী আজ বাড়ি ফেরে। আলমারি খুলিয়া একখানা বই লইয়া পড়িতে বসে।

বেলা পড়িয়া আসিলে হাসপাতালে যাওয়ার আগে সে পরানের বাড়ি গেল। অনেক দিন যায় নাই। অনেক দিন আর কত, দিন কুড়ি। অবস্থা বিশেষে তাও দীর্ঘকাল হইয়া উঠে। পরান বাড়ি ছিল না। মাঠে গিয়াছে। এখন রবিশস্য বুনিবার সময় দুর্বল শরীরেও মাঠে না গেলে তার চলে না।

কুসুম বলিল, বললাম যেও না, তবু গেল।

বলে গেছে শিগগির আসবে।

শশী বলিল, শিগগির আসবে। শিগগির আসবে বলে হাঁ করে বসে থাকবে নাকি আমি? আমার কাজ নেই?

কাজের মানুষ বুঝি একটুও বসে না? দুদণ্ড আয়েশ করতে বসলে মনে খুতখুতানি ধরে, এ রোগ ভালো নয় ছোটোবাবু। চাকর তো নন কারো, অ্যাঁ?

শশী বলিল, বাড়ি খালি দেখছি? পরানের মা কই?

কুসুম উদাসভাবে বলিল, কে জানে কোথায় গেছে বুড়ি যা পাড়া-বেড়ানি।

শশী সন্দিগ্ধভাবে বলিল, তুমি পাঠাওনি কোথাও, ছল করে?

আমি? আমি পাঠাব?—লজ্জায় মুখ লাল করিয়াও কুসুম একটু হাসিল, বলিল, কী মানুষ বাবা? যদি পাঠিয়েই থাকি ছল করে, এমন স্পষ্ট করে সে কথা বলতে হয়? কীরকম বিচ্ছিরি লাগে শুনলে?

শশী বলিল, আজ তোমার কথা ভারি মিষ্টি লাগছে বউ।

মিষ্টি খেয়ে মুখটা আজ মিষ্টি হয়ে আছে।

শশী খুশি হইয়া বলিল, তোমার হাসি দেখলে প্রাণ জুড়িয়ে যায় বে। লোকজনের ভিড়ে জ্বালাতন হই, তুমি ছাড়া এমন করে আমার কাছে আর কেউ হাসে না। আমার একটিও বন্ধু নেই বউ!

বউও নেই!–কুসুম নিখুঁত পরিপূর্ণ হাসি হাসিল। তারপর সে জিজ্ঞাসা করিল, ওর গলায় কী হয়েছে?

শশী বলিল, আজ বলব না, পরশু শুনো।

কেন, আজ বলতে দোষ কী?

নিজে আগে জেনে নিই ভালো করে তবে তো বলব? দুধ ছাড়া ওকে আর কিছু খেতে দিও না বউ।

আর কিছু খেতে পারলে তা দেব? দুধ খেতেও কষ্ট হয়।

পরানের প্রতীক্ষায় শশী আরও খানিকক্ষণ বসিয়া রহিল। কুসুম আর কথা বলিল না, হাসিলও না। প্রতিপূর্ণ বাক্যের আদানপ্রদান আর কতক্ষণ রেশ রাখিয়া যায়? কুসুম উশখুশ করে। একবার উঠিয়া গিয়া উত্তরের ঘরে চোকে, বাহিরে আসিয়া আকাশে বেলার দিকে

তাকায়, তারপর শশীর পাশ দিয়া বড়ো ঘরে ঢুকিবার সময় চাবির গোছাটা শশীর পিঠে ফেলিয়া দিয়া বলে, আহা লাগল?

এবার শশী উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলে, আর বসবার সময় নেই বউ। পরান এলে হাসপাতালে পাঠিয়ে দিও।

কুসুম কোনোদিন রাগ করে না, আজ ভয়ানক রাগিয়া উঠিয়া চাবির গোছাটা কাঁধে ফেলিয়া মুখ কালো করিয়া বলিল, বসবার সময় নেই, না?

শশী একটু আশ্চর্য হইয়া বলিল, হাসপাতালে রোগী এসে বসে আছে তা তো জানো?

কথাগুলি দুর্বোধ্য নয়, তবু মনে হইল কুসুম যেন চেষ্টা করিয়া মানে বুঝিতেছে। শশী যেন তার অচেনা, এমনি তাকানো কুসুমের।

সে তো রোজ থাকে।–কুসুম বলিল।

শশী বিব্রতভাবে একটু হাসিয়া বলিল, বসতে বলো, বসছি। অমন খামকা রাগ কোরো না বউ। সময়ে কাজ না করলে কাজ নষ্ট নয়, বসে গল্প করা পালায় না। তুমি রইলে আমিও রইলাম–

সে তো ন বছর ধরেই আছি। এক-আধ দিন নয়।

কথা বলিয়া চোখের পলকে কোথায় যে গেল কুসুম না গেলে কী হইত বলা যায় না। এমন তো সে কখনও যায় না। প্রতিমুহূর্তে কিছু ঘটিবার প্রত্যাশা তাহার কখনও লয় পাইত না। আজ কী হইল কুসুমের, কেন সে হঠাৎ শশীকে এমনভাবে ফেলিয়া চলিয়া গেল, তার রাগ দেখিয়া আজ যখন শশী আত্মহারা হইয়া উঠিতেছিল? শশীর বিবর্ণমুখে ক্লেশের ছবি ফুটিয়াছে দেখিলে অন্তত উল্লাস তো জাগিত কুসুমের। এমন কখনও হয় নাই। তালবনের উঁচু টিলাটার উপর দাঁড়াইয়া একদিন সূর্যাস্ত দেখিবার সময় শশীর অন্তর বড়ো ব্যাকুল হইয়াছিল, অভূতপূর্ব ভাবাবেগে সে থরথর করিয়া কাঁপিয়াছিল, আর

অপরাহ্ন বেলায় গৃহচ্ছায়ায় একা দাঁড়াইয়া সে যেন তেমনি বিহ্বল হইয়া গেল অন্য এক ভাবাবেশে। এ তো গ্রাম শশী, খড়ের চালা দেওয়া গ্রাম্য গৃহস্থের এই গোবরলেপা ঘর, যে রমণী কথা বলিয়া চলিয়া গেল, গায়ে তার ব্লাউজ নাই, কেশে নাই সুগন্ধি তেল, তার জন্য বিবর্ণ মুখে এত কষ্ট পাইতে নাই। ওর আবেগ তো গেঁয়ো পুকুরের ঢেউ। জগতে সাগরতরঙ্গ আছে।

হাসপাতালে ভিনগাঁয়ের লোক বসিয়া ছিল। শশীকে এখনি যাইতে হইবে। এখনি? কুসুমের কাছ হইতে আসিয়া এখনি ভিনগায়ে যাইতে হইবে। কতকগুলি কথা যে ভাবিয়া দেখিতে হইবে শশীর, একটু যে শান্ত করিতে হইবে মনটা।

কুড়ি টাকা দিতে হবে বাবু।

কুড়ি টাকা ভিনগাঁয়ের লোকের চমক লাগে।

ঘ্যানঘ্যান কোরো না। টাকা না দিতে পারো হাতুড়ে দেখাওগে।

ভিনগাঁয়ের লোক অবসন্ন মন্থর পদে ভিনগাঁয়ে ফিরিয়া যায়। রোগীদের আজ ওষুধের সঙ্গে গাল দেয় শশী! এত রাগ কেন শশীর, এত নীচতা কেন? কথায় ব্যবহারে কেন এত অমার্জিত রুক্ষতা? সামনে দাঁড়াইয়া কে আজ ভাবিতে পরিবে শশীর মনে বড় চিন্তার আবির্ভাব হয়, জীবনকে বৃহত্তর ব্যাপ্তি দিবার পিপাসা সর্বদা জাগিয়া থাকে।

পরান আসিলে শশী বলে, যাব বলে দিয়েছিলাম, বাড়িতে ছিলে না যে?

পরান কৈফিয়ত দিয়া বলে, অত বেলা থাকতে যাবেন বুঝতে পারিনি।

শশী আজও রাগিয়া বলে, বেলা থাকতে যাব না তো কি অন্ধকার হলে যাব? অন্ধকারে কেউ গলায় ঘা দেখতে পায়, না, তাতে ওষুধ লাগাতে পারে? আজ কিছু হবে না, কাল সকালে এসো।

সকালে পরান আসিল না, বিকালেও নয়। আগের দিন বিকালে নিজের বিচলিত অবস্থা মনে করিয়া শশী একটু ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। মাঝে মাঝে কেন যে তার এরকম পাগলামি আসে। সামনে যে মানুষ উপস্থিত থাকে তাকেই আঘাত করিতে ইচ্ছা হয়, জিনিসপত্র ভাঙিয়া তছনছ করিয়া ফেলিবার সাধ যায়। নিজেকে তখন বড় অসুখী মনে হয় শশীর। মনে হয়, অনেক কিছু চাহিয়া সে কিছুই পাইল না। ঘর গোছানোর নামে যেমন ঘরখানা জঞ্জালে ভরিয়াছে, জীবনটা তেমনি বাজে কাজে নষ্ট হইল। কী লাভ হইবে তার গ্রাম ছাড়িয়া গিয়া; চিরকাল যদি সে এমন কিছু চাহিয়া যায় যাহা অবিলম্বে পাওয়া যায় না, যার জন্য অপেক্ষা করিতে করিতে মনের উপভোগ করিবার ক্ষমতা পর্যন্ত ক্ষীণ হইয়া আসে? শশীর সন্দেহ হয়, তার মাথায় বুঝি একধরনের গোলমাল আছে। ভবিষ্যতে যারা অন্যরকমভাবে বাঁচিতে চায় বর্তমানকে তারা এরকম নীরস, নিরর্থক মনে করে না। তার অভাব কিসের, দুঃখ কিসের? সুন্দর সুস্থ শরীর তার, অর্থ ও সম্মানের তার অভাব নাই এবং আর কারো না থাক তার জন্য অন্তত একজনের বুকভরা স্নেহ আছে। যতদিন এখানে আছে এসব তো সে অনায়াসে উপভোগ করিতে পারে, জীবনে বজায় রাখিতে পারে মৃদু একটু রোমাঞ্চ। পরের বাড়ি থাকার মতো এখানে দিনযাপন করিয়া তার লাভ কী?

পরদিন সকালে সে পরানের বাড়ি গেল। না, পরান আজও বাড়ি নাই। মোক্ষদা দাওয়ায় বসিয়া ছিল, সে বলিল, গলায় ঘা দেখাইতে পরান বাজিতপুর গিয়াছে।

হাসপাতাল, গলা দেখাইতে পরান গিয়াছে বাজিতপুর রাগে শশীর গা জ্বালা করিতে লাগিল। একদিন একটু কড়া কথা বলিয়াছে বলিয়া তাকে ডিঙাইয়া বাজিতপুর যাইবে চিকিৎসার জন্য, স্পর্ধা তো কম নয় পরানের!

কুসুম রাধিতেছিল, আসিয়া জলচৌকি দিল। শশী বলিল, না, বসব না। মোক্ষদা বলিল, বোসো বাবা, বোসো-বাড়ি এসে না-বসে কি যেতে আছে। কত বললাম পরানকে-কাজে যাচ্ছিস বাজিতপুর যা, আমাদের শশী থাকতে আর কারোকে গলাটা দেখাসনি বাপু,

শশীর কাছে নাকি সরকারি ডাক্তার তা ছেলে জবাব যা দিলে! মুখপোড়ার যত ছিষ্টেছাড়া কথা। বললে, ছোটোবাবু ব্যস্ত মানুষ, বিরক্ত হন, তাকে জ্বালাতন করে কী হবে মা?

আগে সব কথায় কুসুম মুচকি-মুচকি হাসিত। আজ তার মুখে হাসি দেখা গেল না। বলিল, ছোটোবাবুর ওষুধে ঘা বেড়ে গেল কি-না, তাই তো গেল বাজিতপুর।

মোক্ষদা চটিয়া বলিল, তাই তো গেল বাজিতপুর তোকে বলে গেছে, তাই গেল বাজিতপুর যা মুখে আসবে বানিয়ে বানিয়ে বলবি তুই? যা না মা রান্নাঘরে?

শশী সত্যসত্যই উদ্‌বিগ্নভাবে কুসুমের হাসি দেখিবার প্রতীক্ষা করিতেছিল, এতক্ষণে সে হাসিল। বলিয়া গেল, বানিয়ে কেন বলব মা, তোমার ছেলেই তো আমাকে বলছিল। যা শুনেছি বললাম।

মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি লইয়া শশী বাড়ি ফিরিল। কী ভাবিয়াছে পরান? সেদিন যে ওষুধ দিয়াছিল তাতে পরানের গলার ঘা প্রথমে একটু বাড়িয়া যাওয়া আশ্চর্য নয়, তাতেই কি ভয় পাইয়া গেল পরান, আর তার চিকিৎসায় বিশ্বাস রহিল না?

দিনরাত্রি কাটে, মনে মনে শশী ছটফট করে। পরানের গলায় ক্যানসার হইয়াছে মনে হইয়াছিল শশীর, সেটা ঠিক কি-না জানিতে না-পারিয়া তার স্বস্তি ছিল না। হয়তো না। হয়তো অবহেলা করিয়া সাধারণ ক্ষতকেই পরান অতখানি বাড়াইয়া ফেলিয়াছে। পরান আসে না, নিজে গিয়া তাকে যে শশী জিজ্ঞাসা করিবে বাজিতপুরের সরকারি ডাক্তার কী বলিল, তাও শশীর অভিমানে বাঁধে। কুসুমও যদি একদিন কোনো ছলে আচমকা আসিয়া হাজির হইত। কেন সে আসে না? সে যায় না বলিয়া? যাওয়া-আসার সপ্তাহ মাসের ফাঁক তো এমন সে কত ফেলিয়াছে, তবু প্রায় কুসুমের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হইবার বাঁধা তো হয় নাই কখনও! একদিন খুব ভোরে বাড়ির সামনে রাস্তায় নামিয়া দাঁড়াইতেই শশীর চোখে পড়িল কুসুমও নিজের বাড়ির সামনে পথে দাঁড়াইয়া আছে। কুসুমও যে শশীকে দেখিতে পাইয়াছে তা বোঝা গেল। কই, হাতছানি তো দিল না কুসুম, আগাইয়া তো সে আসিল না? শশী একটু দাঁড়াইয়া রহিল। খোলা মাঠে বিলীন কায়েতপাড়ার নির্জন রাস্তাটি আজও

শশীর জীবনে রাজপথ হইয়া আছে, যে তাকে যতটুকু নাড়া দিয়াছে এই পথে তাদের সকলের পড়িয়াছে পদচিহ্ন। তাহদের মধ্যে অবশিষ্ট আছে শুধু কুসুম, এ পথে আজ শুধু কুসুম হাঁটে।

আস্তে আস্তে শশী কুসুমের কাছে আগাইয়া গেল।

তোমায় দেখে দাঁড়িয়েছিলাম বউ, ভাবছিলাম কাছে যাবে।

আপনি দাঁড়িয়ে থাকবেন, আমি কাছে যাব?

তাতে কিছু দোষ আছে নাকি! শশী হাসিল, কই, কথা শুধোবার জন্যে তালবনে আর তো আমায় ডাকো না বউ?

কী আর শুধোব? নতুন কিছু কি ঘটেছে গাঁয়ে!

ঘটেছে বইকী! অতবড় হাসপাতাল হল, কেমন চলছে হাসপাতাল, রোগীপত্র কেমন হচ্ছে, এসব তো শুধোতে পারো? আমার সম্বন্ধে তোমার কৌতুহল যেন কমে যাচ্ছে বউ।

এবার কুসুম মিষ্টি করি হাসিল, ওমা, তাই নাকি? তা হবে হয়তো একটা কমে একটা বাড়ে, এই তো নিয়ম জগতের। আকাশের মেঘ কমে, নদীর জল বাড়ে,–নইলে কি জগৎ চলে ছোটোবাবু?

বিবাদ হয় নাই, বিবাদ তাদের হইবার নয়, তবু কুসুমের সম্বন্ধে শশীর মনে ভয় ঢুকিয়াছিল যে ব্যবহার যেন তার কড়া হইয়া উঠিতেছে। তাতে ভয়ের কী আছে শশী জানে না, শুধু কষ্ট হইয়াছিল। এখন খুশি হইয়া শশী বলিল, কৌতুহল কমে কি বাড়ল?

কী জানি কী বাড়ল, একটা কিছু অবশ্যি বেড়েছে।

পরানের কথা জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়া শশী এইসব কথা বলিল কুসুমের সঙ্গে। এই দরকারটাই তার যেন বেশি ছিল। তারপর চলিয়া আসিবার আগে সে পরানের খবর জানিতে চাহিল। গলায় ঘা কমিয়াছে পরানের।

কমিয়াছে? ভালোই হইয়াছে। বাজিতপুরের ডাক্তারের ওষুধেই তবে গলার ঘা কমিল পরানের? শশীর ওষুধে বাড়িয়া গিয়াছিল। পরানের এতবড় অন্যায় ব্যবহারের কথা শশী ভাবিতে পারে না। বাড়াইবার সুযোগ দিয়া আর কমানোর সুযোগ দিল না, শশীর ওষুধে যে গলার ঘা বাড়িয়ছিল তাই হইয়া রহিল স্থায়ী সত্য একদিনের জন্য ওষুধ লাগাইতে নাই বা আসিতে নাই তার কাছে?

গলার ঘা ভালো হইয়া গিয়াছে পরানের। শরীর সারে নাই। অতবড় কাঠামো বলিয়া আরও তাকে রোগা দেখায়। একটা টনিক খাইলে পারে। একটু স্ট্রিকনিন দিয়া শশী তাকে এমন টনিক তৈরি করিয়া দিতে পারে যে একমাসে চেহারা ফিরিয়া যাইবে,- রোগা শরীরে অত খাটে, মাসকুলার ফেটিগে স্ট্রিকনিন বড় উপকারী! বলিতে বাঁধে শশীর। কে জানে তার দেওয়া টনিক এক ডোজ খাইয়া শরীর আরও খারাপ হইয়াছে বলিয়া সে যদি আবার বাজিতপুরে সরকারি ডাক্তারের কাছে ছোটে?

শরীরের দিকে একটু তাকাও পরান।—এটুকু বলে শশী।

চাষা তো ছিলাম না ছোটোবাবু, চাষার কাজটা সইছে না।—বলে পরান, বলিয়া সে একটু হাসে, তাও বেশির ভাগ জমি শ্বশুরের কাছে বাঁধা।

শশী বলে, ছেলে তো নেই শ্বশুরের, তিনটি শুধু মেয়ে—যা আছে জামাইদের দিয়ে যাবে। জমি তোমার নামেমাত্র বাঁধা।

পরান প্রকাণ্ড হাই তোলে, বলে, শ্বশুরের ইচ্ছা এখানকার জমিজমা বেচে আমরা তার কাছে গিয়ে থাকি।

যাও না কেন?

তাই কি হয় ছোটোবাবু? গা ছেড়ে বাড়িঘর ছেড়ে শ্বশুরবাড়ি পড়ে থাকব!

প্রতিধ্বনির মতো শোনায় কথাটা, যেন কার কথা কে বলিতেছে! কোনো বিষয়ে এক জোরালো নিটোল সিদ্ধান্ত পরান তো করিয়া রাখে না। শশী যেন শুনিতে পায় কুসুমের বাবা অন্তত বলিতেছে, চলো মা কুসি, এখানকার সব বেচে দিয়ে আমার ওখানে থাকবি চল তোরা, আর কুসুম জবা দিতেছে, তাই কি হয় বাবা? গাঁ ছেড়ে বাড়িঘর ছেড়ে তোমার ওখানে পড়ে থাকব?

শীত জমিবার আগে এবার যামিনী কবিরাজের কাশিটা চিরতরে থামিয়া গেল, দুদিনের জ্বরে বেচারি গেল মারা। পাঁচন সিদ্ধ করিবার কড়াই পড়িয়া রহিল, আলমারিতে শিশি বোতল টিনের কৌটাভরা নানারকম ওষুধ রহিল, বেড়ায় ঠেকানো রহিল ইকো– বুড়ো যামিনীর হৃদকম্পন আর হামানদিস্তার ঠকঠক শব্দটা গেল থামিয়া। খবর পাইয়া আসিল সেনদিদির দাদা কৃপানাথ-সেও কবিরাজ আসিল সে সপরিবারে, তামাক টানিতে লাগিল যামিনীর হুকায় আর আলমারি খুলিয়া দেখতে লাগিল যামিনীর সঞ্চিত ওষুধ। মনে হইল, যামিনীর পাঁচন-সিদ্ধ হইতে থাকিবে, যামিনীর হামানদিস্তায় আবার শব্দ উঠিবে ঠুকঠুক।

কেবল সেনদিদি আর এ জীবনে সধবা হইতে পরিবে না।

তবে শোনা গেল, সেনদিদির নাকি ছেলে হইবে।

শুনিলে অবশ্য বিশ্বাস করিতে ইচ্ছে হয় না, কিন্তু অবিশ্বাস করিবার উপায় নাই। এ তো কানে-শোনা রটনা নয়, চোখে-দেখা ঘটনা। সেনদিদির অমন রূপ কাড়িয়া চোখ কানা করিয়া দেবতার কী মমতা হইল যে সেনদিদিকে তিনি শেষে একটি ছেলে দিলেন? আহা, দিন জীবনে মানুষের এটুকু ক্ষতি পূরণ না থাকিলে কি চলে সন্ধ্যাবেলা শ্রীনাথ মুদির

মেয়ে বকুলতলে পুতুল ফেলিয়া গেল, ভোরবেলা সে পুতুল কুড়াইয়া কতকাল আর কাটিবে সেনদিদির।

ম্লান হইল শশী, একেবারে বিষন্ন বিবর্ণ হইয়া গেল। মাথা নিচু-করা বাক্যহীন স্তব্ধতায় সে মূক হইয়া রহিল। কেন, কী হইল শশীর, গাওদিয়ার নামকরা ডাক্তারের, উদীয়মান তরুণ নেতার? সেনদিদি তাকে ছেলের মতো ভালোবাসিত, আর সে বাসে না তারও অকাট্য প্রমাণ কিছুই নাই, আজ যদি ছেলের মতো ভালোবাসিবার জন্য নিজস্ব একটি ছেলে পায় সেনদিদি, তাতে শশী কেন বিচলিত হয়।

গোপাল সভয়ে জিজ্ঞাসা করে, হ্যা রে শশী, তোর তো অসখ-বিসুখ হয়নি বাবা?

শশী বলে, না।

না হলেই ভালো। একটু সাবধানে থাকিস এ সময়।

শশী ডাক্তারকে গোপাল বলে সাবধানে থাকিতে। বলে সবিনয়ে কৃপাপ্রার্থীর মতো। হয়তো গোপালের বলিবার কথা ওটা নয়। শশীর মান, বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া হয়তো গোপালের হৃদপিণ্ডটা ধড়াস ধরাস করে, সেই শব্দটা পৌঁছাইয়া দিতে চায় শশীর কানে। আর তো ছেলে নাই গোপালের, শুধু শশী।

বাজিতপুরে কী কাজ ছিল শশীর কে জানে, গ্রামের অসংখ্য কাজ ফেলিয়া হঠাৎ সে বাজিতপুরে চলিয়া যায়। সিনিয়র উকিল রামতারণের বাড়িতে একটি দিন চুপচাপ কাটাইয়া দেয়, তারপর যায় সরকারি ডাক্তারের বাড়ি। সরকারি ডাক্তারের সঙ্গে শশীর সম্প্রতি খুব ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল, বাড়িতে অতিথি হওয়ায় এবার ভদ্রলোকের ক্ষীণাঙ্গিনী, এক স্বামী ও দুই ছেলের সংসার লইয়া বিশেষরূপে বিব্রত স্ত্রীর সঙ্গেও আলাপ-পরিচয় হইল। মানসিক বিপর্যয়ের সময় সংসারে একএকটি তুচ্ছ মানুষের কাছে আশ্চর্য সান্তনা মেলে। কাজে অপটু, ভীরু ও নিরীহ এই মহিলাটি অতি অল্প সময়ের মধ্যে শশীকে যেন কিনিয়া ফেলিল। চা দিতে চা উছলাইয়া পড়িতেছে, ছেলে ধরিতে আঁচল খসিতেছে,

আচল তুলিতে ছড়াইয়া পড়িতেছে চুল, তাড়াতাড়ি ঘরের বাহিরে যাইতে চৌকাটে হোঁচটও লাগিল।

থাকিয়া থাকিয়া বলে, আর পারি না বাবা!

সত্যিই পারে না। তবু জোড়াতালি দিয়া কোনোরকমে সবই সে করে। সেজন্য আড়ালও খোঁজে না, সব ক্রুটি-বিচ্যুতি তার প্রকাশ্য এক ঘন্টার মধ্যে মানুষের কাছে নিজের স্বরূপ মেলিয়া ধরে বলিয়াই বোধ হয় তাকে তার স্বামীরও ভালো লাগে, শশীরও লাগিল!

তেইশগাছা, আমাদের গা থেকে ছ মাইল,-মামাকে চেনেন? হরিশচন্দ্র নিয়োগী। আমি মামাবাড়ি গেছি সেই কোন ছেলেবেলায়—আর এই এবার এখানে এসে একবার। আমার বাবা মুন্সেফ ছিলেন কি-না, সঙ্গে এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়াতাম।

এখন কর্তার সঙ্গে বেড়ান।

তা নয়? এই তো ছ মাস হল এসেছি এখানে, এর মধ্যে বলে কি-না বদলি হব।

পরদিন সকালে গ্রামে ফিরিবার জন্য শশী নদীর ঘাটে আসিয়া দাঁরাইল। একটা নৌকা ভাড়া করিতে হইবে। ঘাটে কুসুমের বাবা অনন্তের সঙ্গে শশীর দেখা হইয়া গেল।

অনন্ত বলিল, ডাক্তারবাবু এখানে?

শশী বলিল, একটু কাজে এসেছিলাম। একটা নৌকা নিয়ে গাঁয়ে ফিরব।

অনন্ত বলিল, নিজের নৌকা আনেননি? আমিও গাওদিয়া যাচ্ছি ডাক্তারবাবু, আমার নৌকাতেই চলুন না। একটু তবে বসুন নৌকায় উঠে, বাজার থেকে একজোড়া শাড়ি কিনে আনি ঝাঁ করে মেয়েটার জন্যে।-আরে হেই হানিফ, আন বাবা এদিকে সরিয়ে আন নৌকা, ডাক্তারবাবু উঠবেন।

অল্পক্ষণের মধ্যে কুসুমের জন্য একজোড়া শাড়ি কিনিয়া অনন্ত ফিরিয়া আসিল। নৌকায় উঠিয়া শশীর একটু তফাতে হাত-পা মেলিয়া বসিয়া বলিল, মেয়ে যেতে লিখেছে ডাক্তারবাবু। লিখেছে, একেবারে বড় নৌকা নিয়ে এসে দুদিন এখানে থেকে সবাইকে নিয়ে ফিরে যাব। আপনি আমার যা উপকার করলেন ডাক্তারবাবু, কী আর বলব।

শশী অবাক হইয়া বলিল, আমি আবার কি উপকার করলাম আপনার?

অনন্ত বলিল, মেয়ে কি যেমায় লেখেনি ডাক্তারবাবু, আপনার পরামর্শে আমার কাছে গিয়ে থাকা ঠিক করেছে? যা মাথাপাগলা মেয়ে আমার, আপনার পরামর্শ যে শুনল তাই আশ্চর্য। বলছি কি আজ থেকে? সেই যেবার বেয়াই অপঘাতে মরল তখন থেকে মেয়েজামাইকে তোষামোদ করছি, কাজ কি বাবু তোদের এত কষ্ট করে এখানে থাকায়, আমার কাছে এসে থাক। জামাইয়ের মতামতের জন্যে ভাবিনি ডাক্তারবাবু, সে জলের মানুষ, মেয়ে রাজি হলে সেও রাজি হত। মেয়েই ছিল বেঁকে। বলত, শাশুড়ি আছে, ননদ আছে, ওরা আমার বাপের বাড়ি দিয়ে থাকতে চাইবে কেন? বেশ ভালো কথা, ননদের বিয়ে হওয়া পর্যন্ত চুপচাপ রইলাম। তখন রইল শুধু এক শাশুড়ি, সেও অরাজি নয়–এবার তবে আয়? তাও না, দশটা গুজর দিয়ে মেয়ে আমার এখানকার মাটি কামড়ে রইল। নিত্য অভাব, কী সুখে যে ছিল কে জানে।

তা ঠিক, কী সুখে কুসুম গাওদিয়ায় ছিল এতকাল? অনন্ত সম্পন্ন গৃহস্থ তার গায়ের সাঠিনের কোট আর কোমরে বাঁধা উড়ানিই তা ঘোষণা করে! বাপের কাছে কুসুম পরম সুখে থাকিতে পারিত। এতদিনে কুসুমের তবে সুমতি হইয়াছে? শশীকে জানাইয়া সুমতিটা হইলে খুব বেশি ক্ষতি হইত না। তার পরামর্শে মতিগতি ফিরিয়াছে, বাপকে একথা লিখিবার কী উদ্দেশ্য ছিল কুসুমের?

কোমরে-বাঁধা উড়ানি ও কোটটা খুলিয়া রাখিয়া আরাম করিয়া বসিয়া অনন্ত বলিল, শ্রাবণ মাসে আগের বার যখন নিতে আসি, আপনার সঙ্গেই যেবার এলাম বাজিতপুর পর্যন্ত- সেবারে রাজি হয়েছিল। যেতে যেতে আবার মত পালটাল।

বড় ছেলেমানুষ পরানের বউ। শশী বলিল।

অনন্ত বলিল, ছোট মেয়ে, বড় দু-বোনের বিয়ের পর ঐ ছিল কাছে, বড় আদরে মানুষ হয়েছিল—একটু তাই খেয়ালি হয়েছে প্রকৃতি। সবচেয়ে ভালো ঘর বর দেখে ওর বিয়ে দিলাম, ওর আদেষ্টেই হল কষ্ট। সংসারে মানুষ চায় এক, হয় আর, চিরকাল এমনি দেখে আসছি ডাক্তারবাবু। পুতুল বই তো নই আমরা, একজন আড়ালে বসে খেলাচ্ছেন।

শশী একটু হাসিয়া বলিল, তাকে একবার হাতে পেলে দেখে নিতাম।

অনন্ত বলিল, তেমন করে চাইলে পাবেন বইকী, ভক্তের তো দাস তিনি।

নদী ছাড়িয়া নৌকা খালে ঢোকে, অনন্তের সঙ্গে একথা ওকথা বলিতে বলিতে খাপছাড়া ভাবে জিজ্ঞাসা করিল, পরান বুঝি সব বেচে দেবে? বাড়ি-ঘর জমি-জায়গা?

অনন্ত বলিল, আমার কাছে গিয়া থাকলে এখানে বাড়ি-ঘর রেখে কী করবে? তাড়াহুড়ো কিছু নেই, আস্তে আস্তে সব বেচবে। কেউ কিনবে যদি আপনার জানা থাকে—

বলব, জানা থাকলে আপনাকে বলব।

কুসুম তবে সত্য সত্যই যাইবে চিরকালের জন্য গাওদিয়া ছাড়িয়া? এত তাড়াতাড়ি করিবার কী দরকার ছিল? শশীও তো যাইবে, কুসুমের চেয়েও অনেক দূরদেশে, অনাত্মীয় মানুষের মধ্যে। শশীর বিদায় নেওয়া পর্যন্ত কুসুম কি গ্রামে থাকিতে পারিত না? হয়তো পরানের শরীর ভাঙিয়া গিয়াছে বলিয়া কুসুম তাড়াতাড়ি সরিয়া যাইতে চায়, সেখানে বিশ্রাম জুটিবে পরানের, অন্নচিন্তায় সে ব্যাকুল হইবে না, ভোরে পাঁচটায় ভাঙা শরীর লইয়া ছুটিতে হইবে না মাঠে। কাজটা খুব বুদ্ধিমতীর মতোই করিতেছে কুসুম। তবু, শশীকে একবার কি বলিতে পারিত না? মতি ও কুমুদের ব্যাপারটা শুনিবার জন্য একদিন কত ভোরে কুসুম তাকে তালবনে ডাকিয়া লইয়া গিয়াছিল, এতবড় একটা উপলক্ষ পাইয়াও কুসুম কি তার পুনরভিনয় করিতে পারিত না? কথাটা বলিবার ছুতায়

অসময়ে একবার কি সে আসিতে পরিত না শশীর ঘরে,-গোপাল উঠিয়া দাওয়ায় বসিয়া থাকিবে এরকম একটা প্রত্যাশা করিয়া? কুসুম রাগ করিয়াছে নাকি!

বাড়িতে পা দেওয়ামাত্র গোপাল বলিল, কোথায় গিয়াছিলি শশী? ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব পরশু থেকে তাঁবু গেড়ে বসে আছেন গাঁয়ে, দশবার তার চাপরাশি তোকে ডাকতে এল, শীতলবাবু দুবেলা লোক পাঠাচ্ছেন। কোথায় গেলি কবে ফিরবি তাও কিছু বলে গেলি না। যা যা, ছুটে যা, দেখা করে আয়গে সাহেবের সঙ্গে। ভালো পোশাক পরে যা।

শশী বলিল, এত বেলায় বাড়ি ফিরলাম, খাব না, দাব না, ছুটে সায়েবের সঙ্গে দেখা করতে যাব? কী যে বলেন তার ঠিক নেই।

গোপালের উৎসাহ নিভিয়া গেল বলিল, আমি কথা কইলেই তুই চটে উঠিস শশী।

শশী বলিল, চটব কেন, সকাল থেকে খাইনি কিছু, খিদে তেষ্টা তো আছে মানুষের?

খাসনি! গতকাল থেকে খাসনি কিছু?-গোপাল ব্যস্ত হইয়া উঠিল, শিগগির স্নান করে নে তবে ও কুন্দ, তোরা সব গেলি কোথায় শুনি? সকাল থেকে কিছু খায় নি শশী, সব কটাকে দূর করব এবার বাড়ি থেকে।

বিকালে শশী ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করিয়া আসিল। সাতগাঁর স্কুল, গাওদিয়ার হাসপাতাল সব শীতলবাবু তাঁহাকে দেখাইয়াছেন, শশীকে বসাইয়া অনেকক্ষণ হাসপাতালের সম্বন্ধে কথা বলিলেন। যাদবের মরণের ইতিহাসটা মন দিয়া শুনিলেন। এ বিষয়ে অদম্য কৌতুহল দেখা গেল তার। শশী নিজে দাঁড়াইয়া সব দেখিয়াছে? ব্যাপার নিজে তবে সে একটু ব্যাখ্যা করুক না? শশীর আজ কিছু ভালো লাগিতেছিল না, তাছাড়া যাদবের ও পাগলাদিদির মরণকে তার ব্যাখ্যা করিবার উপায় নাই। চিরদিন শুধু তার মনে মনেই থাকিবে। তারপর এক কাপ চা খাওয়াইয়া হাসপাতালের ফান্ডে একশত টাকা চাঁদা দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া ম্যাজিস্ট্রেট শশীকে বিদায় দিলেন। সেখান হইতে সে শীতলবাবুর বাড়ি গেল। কিছু না বলিয়া উধাও হওয়ার জন্য শশীকে একচোট বকিলেন

শীতলবাবু, তারপর তিনিও এককাপ চা খাওয়াইয়া শশীকে বিদায় দিলেন। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। শীতলবাবু সঙ্গে আলো দিতে চাহিয়াছিলেন, পকেটে টর্চ আছে বলিয়া শশী বারণ করিয়া আসিয়াছে।

সমস্ত পথ একবারও সে টর্চেও আলো ফেলিল না, অন্ধকারে হটিতে লাগিল। হাসপাতালে নিজের ঘরে গিয়া সে বসিল। হাসপাতালের কুড়ি টাকা বেতনের কম্পাউন্ডার বোধহয় আজ এসময় শশীর আবির্ভাব প্রত্যাশা করে নাই, কোথায় যেন চলিয়া গিয়াছে। প্রায় দু-ঘণ্টা পরে সে ফিরিয়া আসিল। শশী কিন্তু তাহাকে কিছুই বলিল না। হাসপাতালে ছটি বেড, তার মধ্যে দুটি মাত্র দুজন রোগী দখল করিয়াছে। তাদের দেখিয়া কম্পাউন্ডারকে তাদের সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া শশী বাড়ি ফিরিল। কী আজ বিগড়াইয়া গিয়াছে মন বাসুদেব বাড়ুজ্যের বাড়িটা অন্ধকার, সামনে সেই প্রকাণ্ড জামগাছটা, যার ডাল ভাঙিয়া পড়িয়া একটা ছেলে মরিয়াছিল। মরণের সঙ্গে কত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক শশীর, তবু সেই ছেলেটাকে আজো সে ভুলিতে পারিল না। চিকিৎসায় ভুল হইয়াছিল কি? দেহের ভিতরে কি এমন কোনো আঘাত লাগিয়াছিল ছেলেটার, সে যাহা ধরিতে পারে নাই? আজ আর সেকথা ভাবিয়া লাভ নাই। তবু শশী ভাবে। গ্রামের এমন কত কী শশীর মনে গাঁথা হইয়া আছে। এজন্য ভাবনাও হয় শশীর। গ্রাম ছাড়িয়া সে যখন বহু দূরদেশে চলিয়া যাইবে, গ্রাম্যজীবনের অসংখ্য ছাপ যদি মন হইতে তার মুছিয়া না যায়? চিন্তা যদি তার শুধু এইসব খণ্ডখণ্ড ছবি দেখা আর এইসব ঘটনার বিচার করায় পর্যবসিত হয়? শ্রীনাথের দোকানে একটু দাঁড়ায় শশী। কী খবর শ্রীনাথ? মেয়ের জ্বর? কাল একবার নিয়ে যেও হাসপাতালে, ওষুধ দেব। চলিতে চলিতে শশী ভাবে যে তার কাছে অসুখের কথাই বলে সকলে, ওষুধ চায়। বাঁধানো বকুলতলাটা ঝরা ফুলে ভরিয়া আছে: এত ফুল কেন? বাড়ির সামনে বাধানো দেবধর্মী গাছতলা। সেনদিদি বুঝি আর সাফ করে না? বাড়িতে ঢুকিবার আগে শশী দেখিতে পায় পরানের বড় ঘরের জানালাটা আলো হইয়া আছে। বাপ আসিয়াছে বলিয়া কুসুম বোধহয় আজ তার বড় ঝুলানো আলোটাকে তেল ভরিয়া জ্বালিয়া দিয়াছে।

মনটা কেমন করিয়া ওঠে শশীর। হয়তো পরশু, হয়তো তার একদিন পর কুসুম গাঁ ছাড়িয়া যাইবে, আর আসিবে না।

১৩. সূর্যাস্ত দেখিবার শখ

ঝোঁকের মাথায় কাজ করার অভ্যাস শশীর কোনোদিন ছিল না। মনের হঠাৎ-জাগা ইচ্ছাগুলিকে চিরদিন সামলাইয়া চলিবার চেষ্টা করে। তবে এমন কতকগুলি অসাধারণ জোরালো হঠাৎ-জাগা ইচ্ছা মানুষের মধ্যে মাঝে মাঝে জাগিয়া ওঠে, যে, সেসব দমন করার ক্ষমতা কারো হয় না। সকালে উঠিয়া কিছুই সে যেন ভাবিল না, কোনো কথা বিবেচনা করিয়া দেখিল না, সোজা পরানের বাড়ি গিয়া রান্নাঘরের দরজার সামনে দাঁড়াইয়া বলিল, একবার তালবনে আসবে বউ?

কুসুম অবাক। তালবনে? কেন, তালবনে কেন এই সকালবেলা?

এসো। কটা কথা বলব তোমাকে।

কথা বলবেন? হাসব বা কাঁদব ভেবে পাই না ছোটোবাবু। জন্মবয়সে আজ প্রথম আমাকে যেচে কথাটা বলতে এলেন, তাও তালবনে ডেকে যান আমি আসছি।

তালবনের সেই ভূপতিত তালগাছটায় শশী বসিয়া রহিল, এমনি সকালবেলা একদিন তাকে ডাকিয়া আনিয়া কুসুম সেখানে বসিয়া মতির কথা শুনিয়াছিল। খানিক পরে আঁচলে বাঁধা চাবির গোছা খেলাচ্ছলে মৃদু মৃদু শব্দে বাজাইতে বাজাইতে কুসুম আসিল। এত উৎফুল্ল কেন কুসুম আজ, কাল যে চিরতরে বিদায় গ্রহণ করিবে? মুখখানা একটু তাহার স্নান দেখাক, চোখে থাক গোপন রোদনের চিহ্ন? কথা শশী বলিতে পারিল না। নিজের মুখখানা স্নান করিয়া কুসুমের ভাব দেখিতে লাগিল।

হাসব?-কুসুম জিজ্ঞাসা করিল।

কেন, হাসবে কেন?

কুসুম হাসিয়া বলিল, আমার হাসি দেখলে আপনার মন নাকি জুড়িযে যায়? তাই শুধোচ্ছি।

শশী বলিল, তামাশা করার জন্যে তোমায় এখানে ডাকিনি বউ।

আহা, তা তো জানি না তামাশাই করলেন চিরকাল, তাই ডাকলে মনে হয় তামাশা করার জন্যেই বুঝি ডেকেছেন। বসি তবে বসে শুনি কীজন্য ডাকলেন!

শশী বলিল, একথা কী করে বললে বউ, চিরকাল তোমার সঙ্গে তামাশা করেছি?

তামাশা নয়? তবে ঠাট্টা বুঝি?

শশী একটু রাগ করিয়া বলিল, তোমার কী হয়েছে বুঝতে পারছি না বউ।

কুসুম তবু হালকা সুর ভারী করে না। বলিল, কী করে বুঝবেন? মেয়েমানুষের কত কী হয়, সব বোঝা যায় না। হলেই বা ডাক্তার! এ তো জ্বরজ্বালা নয়।

শশী জ্বালা বোধ করে। এ কী আশ্চর্য যে কুসুমকে সে বুঝিতে পারে না, মৃদু স্নেহসিঞ্চিত অবজ্ঞায় সাতবছর যার পাগলামিকে সে প্রশ্রয় দিয়াছিল? শশীর একটা দুর্বোধ্য কষ্ট হয়। যা ছিল শুধু জীবনসীমায় বহিঃপ্রাচীর, হঠাৎ তার মধ্যে একটা চোরা দরজা আবিস্কৃত হইয়াছে, ওপাশে কত বিস্তৃত, কত সম্ভাবনা, কত বিস্ময়। কেন চোখ ছলছল করিল না কুসুমের? একবার বাপের বাড়ি যাওয়ার নামে আছাড় খাইয়া তার কোমর ভাঙিয়াছিল, যদিবা শেষপর্যন্ত গেল, ফিরিয়া আসিল পনেরো দিনের মধ্যে। এখানে এমনভাবে হয়তো এই তাদের শেষ দেখা, এ জীবনে হয়তো আর এত কাছাকাছি তারা আসিবে না; আর আজ একটু কাঁদিল না কুসুম, গাঢ় সজল সুরে একটি আবেগের কথা বলিল না? কুসুমের মুখে ব্যথার আবির্ভাব দেখিতে শশীর দুচোখ আকুল হইয়া ওঠে, অস্ফুট কান্না শুনিবার জন্য সে হইয়া থাকে উৎকর্ণ। কে জানিত কুসুমের দৈনন্দিন কথা ও ব্যবহার মেশানো অসংখ্য সংকেত, অসংখ্য নিবেদন এত প্রিয় ছিল শশীর, এত সে ভালোবাসিত কুসুমের

জীবনধারায় মৃদু, এলোমেলো, অফুরন্ত কাতরতা? চিরদিনের জন্য চলিয়া যাইবে, আর আজ এই তালবনে তার এত কাছে বসিয়া খেলার ছলে কুসুম শুধু বাজাইবে চাবি কী অন্যায় কুসুমের, কী সৃষ্টিছাড়া পাগলামি।

পা দিয়া ছোট একটি আগাছা নাড়িয়া দিতে ঝরঝর করিয়া শিশির ঝরিয়া পড়িল। শশীর মনে হইল কুসুমকে ধরিয়া এমনি ঝাকুনি দেয় যাতে তার চোখের আটকানো জলের ফোঁটাগুলি এমনিভাবে ঝরিয়া পড়ে এবং দুচোখ মেলিয়া সে তা দেখিতে পায়।

কুসুম জিজ্ঞাসা করিল, কথা বলবেন বলে ডেকে এনে চুপচাপ কেন ছোটোবাবু?

শশী বলিল, শুনলাম তোমরা নাকি গাঁ ছেড়ে চলে যাচ্ছে, তাই শুধোতে ডাকলাম।

কুসুম অনায়াসে বলিল, পরশু যাব।

আমায় যে বলো নি কিছু?

কখন বলব? আপনি কি আসেন?

শশী রাগিয়া বলিল, নাই বা এলাম! জানো না কাজের ভিড়ে কত ব্যস্ত থাকি? মিথ্যা করে ভাঙা হাত দেখাতে বৃষ্টি মাথায় করে যেতে পারো, এতবড় একটা খবর দেবার জন্যে একবার যেতে পারলে না?

একথায় ক্রোধের কী অপূর্ব ভঙ্গিই কুসুম করিল দুহাতে মুখে দুপাশের আলগা চুলগুলি পিছনে ঠেলিয়া দিয়া এমন তীব্রভৃষ্টিতে শশীর দিকে চাহিল যে মনে হইল শশী যেন দুরন্ত অবাধ্য শিশু, এখুনি কুসুম তাকে একটা চড়চাপড় মারিয়া বসিবে। এমন তো ছিল না কুসুম! শশী কবে তাকে অপমান না করিয়াছে, কবে মান রাখিয়াছে তার অভিমানের, কবে এমন কথা বলিতে ছাড়িয়াছে যা শুনিলে গা জ্বলিয়া যায় না? কোনোদিন রাগ সে করে নাই, ভর্ৎসনার চোখে চাহে নাই। আজ এই সামান্য অপমানে সে একেবারে ফুঁসিয়া উঠিল বাঘিনীর মতো!

তবে কড়া কথা কিছু সে বলিল না, আত্মসম্বরণ করিল। তার রাগের ভঙ্গি দেখাইয়া শশী একেবারে নিভিয়া গিয়াছে দেখিয়া কে জানে কী আশ্চর্য কৌশলে, কথা বলার চিরন্তন রহস্যময় সুরটিও কুসুম ফিরাইয়া আনিল। বলিল, বাবা, কী ছেলেমানুষের পাল্লাতেই পড়েছি মিথ্যে করে ভাঙা হাত দেখাতে একবার ছেড়ে একশোবার যেতে পারি ঝড় বৃষ্টি ভূমিকম্প মাথায় করে, ওকথা বলবার জন্য যাব কেন?

শশী বলিল, পরানকে দিয়ে তো বলে পাঠাতে পারতে?

কুসুম বলিল, তাই বা কেন পাঠাব? যে খবর নেয় না তাকে খবর দেবার কী গরজ আমার? আমিই তো বারণ করলাম ওকে।

কাজের ভিড়ে আসতে পারিনি বলে আমি একেবারে পর হয়ে গেছি, না বউ?

পাগলাটে মানুষ আমি, তবু যাওয়ার দুদিন আগে আমাকে এখানে ডেকে আনা চাই, আজেবাজে কথা বলে কান ঝালাপালা করা চাই! দশ বছর খেলা করেও কি সাধ মেটেনি? আমরা মুখ্যু গেঁয়ো মেয়ে এ সব খেলার মর্ম বুঝি না, কষ্টে মরে যাই।

এ কথার কোনো প্রতিবাদ নাই বলিয়া শশীর মুখে কথা ফোটে না। জুতার ভিতর হইতে পা বাহির করিয়া পায়ে ঘাসের শিশির মাখিতে মাখিতে নতমুখে সে মূক হইয়া বসিয়া থাকে।

এদিকে কুসুমের চোখে এতক্ষণে জল আসিয়া পড়িয়াছে। শশীর কাছে মএত্র আবেগকে এমন স্পষ্টভাবে চোখের জলে কুসুম কোনোদিন স্বীকার করে নাই। তবে সে বড়ো শক্ত মেয়ে, দুবার জোরে জোরে শ্বাস টানিয়া আবার আঁচলে চোখ মুছিয়াই আবেগ সে আয়ত্তে আনিয়া ফেলিল।

বলিল, এমন হবে ভাবিনি ছোটোবাবু। তাহলে কোনকালে গাঁ ছেড়ে চলে যেতাম।

কুসুম আর কিছুক্ষণ চোখের জল ফেলিলে যে শশী হঠাৎ খ্যাপার মতো বিনা বাক্যব্যয়ে তাকে দুহাতে জড়াইয়া ধরিত তাতে সন্দেহ ছিল না, কিন্তু কুসুমের অনুযোগগুলি তাকে দমাইয়া রাখিল। একথা সে ভুলিতে পারিল না যে এতকাল পরে ওভাবে কুসুমের সমস্ত নালিশের জবাব দেওয়া আর চলে না। মুখখানা শশীর একটু পাংশু দেখাইতেছিল। কী বলা যায় কুসুমকে, কী করা যায়! কে জানিত মোটে দুদিনের নোটিশে কুসুম তাকে এমন বিপদে ফেলিবে, তার গুছানো সময়ের মধ্যে এমন ওলটপালট আনিয়া দিবে কুসুমের কাছে বসিয়া থাকিলে, দুদিন পরে সে যে চিরদিনের জন্য চলিয়া যাইবে, এই চিন্তার কষ্ট তরঙ্গের মতো পলকে পলকে অবিরাম উথলিয়া উঠিয়া তাকে এমন উতলা করিয়া তুলিবে, এ ধারণা শশীর ছিল না। কাল কথাটা শুনিয়া অবধি শশীর মনে নানা বিচিত্র ভাবধারা উঠিতেছিল, আজ সকালে সে-সমস্ত যেন শুধু একটা কটু ক্লেশে পরিণত হইয়া গিয়াছে।

কুসুমের যে শরীরটা আজ অপার্থিব সুন্দর মনে হইতেছিল তার সমস্তটা শশী জড়াইয়া ধরিতে পারিল না, হঠাৎ করিল কি, খপ করিয়া কুসুমের একটা হাত ধরিয়া ফেলিল। কুসুম একটু অবাক হইয়া গেল। দুজনের মধ্যে ব্যবধান ছিল, তাতে টান পড়ার জন্যই বোধহয় কুসুম একটু সরিয়াও আসিল, কিন্তু যা কথা বলিল তা অপূর্ব, অচিন্তিত।

কতবার নিজে যেচে এসেছি, আজকে ডেকে এনে হাত ধরা-টরা কি উচিত ছোটোবাবু? রেগে-টেগে উঠতে পারি তো আমি? বড় বেয়াড়া রাগ আমার।

শুনিয়া শশীর আধো-পাংশু মুখখানা প্রথমে একেবারে শুকাইয়া গেল। কে জানিত কুসুমকে এত ভয়ও শশী করে? তবু কুসুমের হাতখানা সে ছাড়িল না। বলিল, রেগো, কথা শুনে রেগো। আমার সঙ্গে চলে যাবে বউ?

চলে যাব? কোথায়?

যেখানে হোক। যেখানে হোক চলে যাই চলো আজ রাত্রে।

কুসুম সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, না।

শশী ব্যাকুলভাবে কহিল, কেন? যাবে না কেন?

কুসুম শুধু বলিল, কেন যাব?

শশী বোকার মতো, শিশুর মতো বলিল, কেন যাবে? কেন যাবে মানে কী কুসুম?

আজ নাম ধরে কুসুম বললেন!—বলিয়া ছোট বালিকার মতো মাথা দুলাইয়া জ্বলজ্বলে চোখে শশীর অভিভূত ভাব লক্ষ করিতে করিতে কুসুম বলিল, কী করে যে শুধোলেন কেন যাব। আপনি বুঝি ভেবেছিলেন যেদিন আপনার সুবিধে হবে ডাকবেন, আমি অমনি সুড়সুড় করে আপনার সঙ্গে চলে যাব? কেউ তা যায়?

শশী অধীরভাবে বলিল, একদিন কিন্তু যেতে।

কুসুম স্বীকার করিয়া বলিল, তা যেতাম ছোটোবাবু, স্পষ্ট করে ডাকা দূরে থাক, ইশারা করে ডাকলে ছুটে যেতাম। চিরদিন কি এরকম যায়? মানুষ কি লোহার গড়া যে চিরকাল সে একরকম থাকবে, বদলাবে না? বলতে বসেছি যখন কড়া করেই বলি, আজ হাত ধরে টানলেও আমি যাব না।

তার হাত ছাড়িয়া দিয়া শশী বলিল, তোমার রাগ যে এমন ভয়ানক তা জানতাম না বউ। অনেক বড় বড় কথা তো বললে, একটা ছোট কথা কেন তুমি বুঝতে পারো না? নিজের মন কি মানুষ সবসময় বুঝতে পারে বউ? অনেকদিন অবহেলা করে কষ্ট দিয়েছি বলে আজ রাগ করে তার শোধ নিতে চলেছ, এমন তো হতে পারে আমি না-বুঝে। তোমায় কষ্ট দিয়েছি, তোমার পরে কতটা মায়া পড়েছে জানতে পারিনি? তুমি চলে যাবে শুনে এতদিনে আমার খেয়াল হয়েছে? তা ছাড়া তোমার কথাই ধরি, তুমি বললে মানুষ বদলায়-বেশ, আমি অ্যাদিন তোমার সঙ্গে খেলাই করেছি, আজ তো আমি বদলে যেতে পারি বউ?

কী ব্যাকুল, উৎসুক আবেদনের মতো শোচনীয় শশীর কথাগুলি। কে জানিত কুসুমকে তাহার এমন করিয়া একদিন বলিতে হইবে। শুনিতে বিস্ময়ের সীমা থাকে না কুসুমের শরীরটা যে ভালো নাই তার মুখ দেখিয়াই তা বোঝা যায়, হয়তো কুসুম মনে করে যে তার এই সকাতর দুর্বলতা সেইজন্যই। সে মৃদুস্বরে বলিল, এ কী বলছেন ছোটোবাবু? আমার জন্য আপনার মন কাঁদবে?

শশী সরলভাবে বলিল, ভয়ানক মন কাঁদবে বউ, জীবনে আমি কখনও তা হলে সুখী হতে পারব না।

কুসুম ব্যাকুলভাবে বলিল, তা কি কখনও হয়? আপনার কাছে আমি কত তুচ্ছ, আমার জন্য জীবনে কখনও সুখী হতে পারবেন না। দুদিন পরে মনেও পড়বে না আমাকে।

শশী বলিল, এতকাল ধরে জড়িয়ে বেঁধেছ আর দুদিনে তোমাকে ভুলে যাব, তাই ভেবে নিলে তুমি?

শেষপর্যন্ত কুসুম বলিল, আমার সাধ্যি কী ছোটোবাবু আপনাকে জড়িয়ে জড়িয়ে বাঁধব?

শশী ক্ষুব্ধ হইয়া বলিল, আজ ওসব বিনয় রাখো বে। আজেবাজে বকার ধৈর্য আমার নেই। আমার কী হবে না হবে সেকথাও না। স্পষ্ট করে আমায় শুধু তুমি বুঝিয়ে দাও চিরকাল আমার জন্যে ঘর ছাড়তে তুমি পাগল ছিলে, আজকে হঠাৎ বিরূপ হলে কেন?

এসব কথায় কলহ হয় ছোটোবাবু। যাবার আগে কলহ কি ভালো?

কলহ হবে না, বলো।

কুসুম ম্লানমুখে বলিল, আপনাকে কী বলব ছোটোবাবু, আপনি এত বোঝেন! লাল টকটকে করে তাতানো লোহা ফেলে রাখলে তাও আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হয়ে যায়, যায় না? সাধ-আহ্লাদ আমার কিছু নেই, নিজের জন্যে কোনো সুখ চাই না। বাকি জীবনটা ভাত রেঁধে ঘরের লোকের সেবা করে কাটিয়ে দেব ভেবেছি—আর কোনো আশা নেই, ইচ্ছে

নেই। সব ভোঁতা হয়ে গেছে ছোটোবাবু। লোকের মুখে মন ভেঙে যাবার কথা শুনতাম, অ্যাদ্দিনে বুঝতে পেরেছে সেটা কী। কাকে ডাকছেন ছোটোবাবু, কে যাবে আপনার সঙ্গে? কুসুম কি বেঁচে আছে? সে মরে গেছে।

কুসুম মরিয়া গিয়াছে। সেই চপল রহস্যময়ী, আধো-বালিকা আধো-রমণী, জীবনীশক্তিতে ভরপুর, অদম্য অধ্যবসায়ী কুসুম। শশী যে কেন আর কোনো কথা বলিল না তার কারণটা দুর্বোধ্য। বোধ হয় ভাবিবার অবসর পাইবার জন্য। কুসুম তো আজ ও কাল এখানে আছে। বলিবার কিছু আছে কি না সেটাই আগে ভাবিয়া দেখা দরকার।

মিনিটখানেক চুপচাপ দাঁড়াইয়া থাকিবার পর বাড়ির দিকে চলিতে আরম্ভ করিবার সময় কুসুম শুধু বলিল, আপনি দেবতার মতো ছোটোবাবু।

বাড়ি ফিরিয়া শশী বুঝিতে পারে কল্পনার এমন কতকগুলি স্তর আছে, বিশেষ কোনো উপলক্ষ ছাড়া যেখানে উঠিবার ক্ষমতা মানুষের নাই। এক-একটা ঘটনা যেন চাবির মতো মনের এক-একটা দুয়ার খুলিয়া দেয়, যে দুয়ার ছিল বলিয়াও মানুষ জানিত না। এত বড় বড় কল্পনা শশীর, এত বিরাট ও ব্যাপক সব মনোবাসনা, একদিনে সব যেন পৃথক অনাবশ্যক হইয়া গেল, শিশুর মনের বড় বড় ইচ্ছাগুলি যৌবনে যেমন পায়। রবার-বসানো চাকা-যুক্ত গদি-আটা ঠেলাগাড়িতে চাপার জন্য ছেলেবেলা কত কাঁদিয়াছিল শশী, কলিকাতায় মোটর হাঁকাইবার সাধ আজ তারি পর্যায়ে গিয়া পড়িয়াছে। গ্রাম ছাড়িয়া কোথায় যাইবে শশী? কী আছে গ্রামের বাইরে শশীর যা মনোহরণ করিতে পারবে? একটা প্রকাণ্ড বড় পৃথিবী, অসংখ্য অচেনা মানুষ। কী পাইবে শশী সেখানে?

কুসুমের কথাগুলির অন্তরালে যত অর্থ ছিল ক্রমে ক্রমে শশী তা পরিষ্কার বুঝিতে পারে। একদিন দুদিন নয়, অনেকগুলি সুদীর্ঘ বৎসর ব্যাপিয়া তার জন্য কুসুম পাগল হইয়া ছিল, তারপর ক্রমে ক্রমে তার সে উন্মাদ ভালোবাসা নির্জীব হইয়া আসিয়াছে। হয়তো মরিয়াই গিয়াছে! কে বলিতে পারে? আজ এ ঘটনা শশীর কাছে যত ভয়ানক মনে হোক এই পরিণতিই তো স্বাভাবিক। গাঁয়ের মেয়ে ঘরের বউ কুসুম, মনোবাসনা কতদূর অদম্য

হইয়া ওঠায় দিনের-পর-দিন নৈবেদ্যের মতো নিজেকে শশীর কাছে সে নিবেদন করিয়া চলিয়ছিল এখন শশী তা বুঝিতে পারে, কুসুমের অমন ভয়ানক উপবাসী ভালোবাসা যে এতকাল সতেজে বাঁচিয়া ছিল, তাই তো কল্পনাতীতরূপে বিস্ময়কর। আপনা হইতেই যে প্রেম জাগিয়াছিল, আপনা হইতে স্বাভাবিক নিয়মে আবার তা লয় পাইয়াছে। শশীকে না দেখিয়া এখন কুসুমের দিন কাটিবে, শশীকে বাদ দিয়া কাটিবে জীবন।

কুসুমের পরিবর্তনে আশ্চর্য শশী তাই হয় না। ঘরে আগুন লাগিলে আগুন নেভে- বাহিরের, মনেরও। কুসুমের মনের আগুন কেন চিরদিন জ্বলিবে? নিজের ব্যাকুলতা শশীকে অবাক করিয়া রাখে। যখনি মনে হয় তার আর কিছুই করিবার নাই, জীবনে যতো বড়ো অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারুক কুসুমকে আর কোনোদিন সে ভালোবাসাইতে পারিবে না, কষ্ট শশী ছটফট করে। ফুটিয়া ঝরিয়া গিয়াছে, কুসুম মরিয়া গিয়াছে,–তারই চোখের সামনে তারই অন্যমনস্ক মনের প্রান্তে। কী ছেলেখেলায় সে মাতিয়াছিল যে এমন ব্যাপার ঘটিতে দিল!

ছেলেখেলাগুলি সবই বর্তমান আছে। হাসপাতালে গেল শশী, নাড়ি টিপিয়া হৃৎস্পন্দন শুনিয়া ওষুধ লিখিয়া দিল-ফোঁড়াও কাটিল একটা। সাতগাঁয়ে রোগীও দেখিতে যাইতে হইল। কতকাল এসব কর্তব্য শশী করিতেছে, একদিন কি কলের মতো কাজগুলি করা যায় না? অন্যমনে কুসুমের কথা ভাবিতে ভাবিতে নাড়ি টিপিতে কেহ তো তাহাকে বারণ করে নাই! এত রাগ কেন শশীর, মরণাপন্ন রোগীকে এমন ধমক দেওয়া কেন? কী আপসোস আজ শশীর মনে, কী আত্মধিক্কার কারো তো বুঝিবার নয়। ধরিতে গেলে একদিক দিয়া এ তো ভালোই হইয়াছে শশী? ঘরের বউ শুদ্ধ ও পবিত্রভাবে ঘরেই রহিয়া গিয়াছে, রক্ষা পাইয়াছে নীতি ও ধর্ম। সত্য এদিক দিয়া একটু ভালোলাগা উচিত ছিল। ভালোমন্দের অনেক দিনের পুরানো এসব সংস্কার তার আছে বইকী, তবু, একবারও শশীর মনে হইল না একদিন অনেক ভণিতা করিয়া কুসুমকে যে-কথাগুলি বুঝাইয়া বলিতে গিয়াছিল আজ প্রকারান্তরে তাই ঘটিয়াছে—শান্ত মনে বুঝিয়া শুনিয়া চারিদিক

বিবেচনা করিয়া কুসুমকে সে যে আত্মসংযম অভ্যাস করিতে বলিয়াছিল, কিছু না-বুঝিয়া শুনিয়াই কুসুম এখন অনায়াসে তা পালন করিতে পারবে।

পরদিন সকালে কুসুমকে এ বাড়িতে দেখা গেল। মেয়েদের কাছে বিদায় লইয়া আসিয়াছে। আর কেহ হইলে হয়তো ভাবিয়া বসিত এ তার শশীকে দেখিতে আসার ছল, শশী তা ভাবিল না। নিজের পক্ষে সুবিধাজনক ভাবনাগুলিকে শশী চিরকাল ভয়ানক সন্দেহের সঙ্গে বিচার করে। তবু সে করিল কী, বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকার বদলে নিজের ঘরে গিয়া সকলে কী ভাবিবে না ভাবিবে একেবারে অগ্রাহ্য করিয়া ডাকিল, পরানের বউ, একবার শোনো।

কুসুম ঘরে আসিয়া বলল, বিদায় নিতে এলাম ছোটোবাবু। দোষটোষ যা করেছি মনে রাখবেন নাকি?

শশীর লিল, রাখব না? দোষগুণ, ভালোমন্দ, তোমার সম্বন্ধে খুঁটিনাটি তুচ্ছ কথাটি পর্যন্ত কোনোদিন ভুলতে পারব না বউ।

কালের চেয়ে শশীর আজকের প্রেম-বিনোদন ঢের বেশি স্পষ্ট। যেমন বলিল তেমনভাবে শশী যদি কুসুমকে মনে রাখে তবে সত্যসত্যই কি গভীরভাবে কুসুমকে সে ভালোবাসে?

কুসুম তাই কাঁদো-কাঁদো হইয়া বলিল, এমন করে বললে আমার যে পায়া ভারী হয়ে যায় ছোটোবাবু?

শশী বলিল, সত্যিকথা আমি সোজা ভাষাতেই বলি বউ-স্পষ্ট করে। ইশারাফিশারায় বলা আমার আসে না।

যাওয়ার সময় বিপদ করলেন।–কুসুম বলিল।

নাই বা গেলে?—বলিল শশী।

কুসুমকে গাঁয়ে রাখিবার জন্য আজও চেষ্টা করিতেছে শশী, এ শশীকে যেন চেনা যায় না। এমন দীনভাব সে কোথায় পাইল, কোথায় শিখিল এমন কাঙালপনা? জানে, কুসুম থাকিবে না, থাকিলে ভালোবাসিবে না, তবু উৎসুকভাবে শশী জবাবের প্রতীক্ষা করে। মানুষ যে মরিয়া বাঁচে না কী তার প্রমাণ আছে? শীতকালের বর্ষায় এখনো কি মরা নদীতে বান ডাকে না? নিজেকে হয়তো কুসুম বুঝিতে পারে নাই, কাল তালবনে মিথ্যা বলিয়াছিল!

কুসুম ভয়ে ভয়ে বলিল, থেকে কী করব ছোটোবাবু? তাতে আপনারও কষ্ট, আমারও কষ্ট। এ বয়সে আর কি কষ্ট সইতে পারব? গলায় দড়ি-টড়ি দিয়ে বসব হয়তো।

শশী না পারুক, ইশারায় মনের কথা কুসুম বেশ বলিতে পারে, অনেকদিন শশীকে ওভাবে মনের কথা বলিয়া তার দক্ষতা জনিয়াছে। শশী বিবর্ণ হইয়া গেল। সভয়ে বলিল, না বউ না, ওসব কখনও কোরো না! ওসব নাটুকেপনা করতে নেই। গোড়ায় যদি বলতে, থাকার কথা মুখেও আনতাম না। এত যদি বিগড়ে থাকে মন, বাপের বাড়ি গিয়েই থাকো। বুঝেশুনেই তো কাজ করতে বলেছি তোমাকে গোড়া থেকে, চারদিক বিবেচনা করে।

কুসুম বলিল, তা না করলে অনেক আগেই গলায় দড়ি দিতাম ছোটোবাবু। যাব এবার?

এ অনুমতি চাওয়ার কোনো কারণই শশী সেদিন খুঁজিয়া পাইল না।

এত কাণ্ড করিয়া কুসুম বাড়ি গেল। এইরকম স্বভাব কুসুমের। জীবনটা নাটকীয় করিয়া তুলিবার দিকে চিরদিন তার বিশেষ পক্ষপাতিত্ব ছিল।

শুধু গ্রাম ছাড়িবার কল্পনা নয়, অনেক কল্পনাই শশীর নিস্তেজ হইয়া আসিয়াছে, তবে গ্রামে বসিয়া থাকিবারও আর কোনো কারণ সে খুঁজিয়া পায় না। হাসপাতালের কাজে বেশ শৃঙ্খলা আসিয়াছে, একজন ডাক্তার নিযুক্ত করিয়া এবার সে বিদায় গ্রহণ করিতে পারে। যাওয়ার কথা প্রকাশ করিলে ঘরে ও বাহিরে একটা হৈচৈ বধিয়া যাইবে, কৈফিয়ত

দিতে দিতে, উপদেশ ও উপরোধ শুনিতে শুনিতে বাহির হইয়া যাইবে প্রাণ। এটা এড়ানো চলিবে না। সে তো কুসুম নয় যে, যেদিন খুশি তল্পিতল্পা গুছাইয়া চলিয়া যাইতে চাহিলে এতবড় গ্রামের মধ্যে শুধু ব্যস্ত হইবে একজন।

হাঙ্গামার ভয়টাই যেন শশীকে নিক্রিয় করিয়া রাখিল। মন তো ভালো থাকেই না, শরীরটাও খারাপ। উৎসাহ এবং জীবনীশক্তির রীতিমতো অভাব ঘটিয়াছে।

মাস দুই কাটিয়া গেল। সকালবেলা সূচনা হইয়া একদিন মাঝরাত্রে সেনদিদির অবশ্যম্ভাবী বিপদটি আসিয়া পড়িল।

সত্যই বিপদ। সেনদিদি বুঝি বাঁচে না।

অনেক বয়সে প্রথম সন্তান হওয়াটা হয়তো আকস্মিক সৌভাগ্য বলিয়া ধরা যাইতে পারে, কিন্তু সেটা বিপজ্জনকও বটে। গোপালের বোধহয় এ আশঙ্কা ছিল, গ্রাম ছাড়িয়া এসময় দু-একদিনের জন্যও সে কোথাও যাইত না, সর্বদা খোঁজখবর লইত। যামিনী কবিরাজের বৈঠকখানায় তার সর্বদা যাতায়াত,-যামিনি বাচিয়া থাকিতে শেষের দিকে কখনও যাইত না। সেনদিদির দাদা কৃপানাথ কবিরাজ বড় পোষ মানিয়াছে গোপালের কাছে। লোকটা চিকিৎসাশাস্ত্র পড়িয়াছে ভালো কিন্তু প্রয়োগ জানে না, পশারও নাই। চরক-সুশ্রুতের শ্লোক বলিবার ফাঁকে ফাঁকে সে গোপালের স্তব পাঠ করে কিনা কে জানে, গোপাল তাকে বিশেষ কৃপা করিয়া থাকে। তা না হইলে যামিনী কবিরাজের বাড়িঘরে সপরিবারে বাস করিবার সৌভাগ্য তার বেশিদিন স্থায়ী হইতে পারিত না। গোপাল সেনদিদিকে বলিত, এবার তাড়াও ওদের; সেনদিদি ওদের বলিত, এবার তোমরা এসো। একটা গুরুতর মামলার শুনানি উপলক্ষে গোপাল আজ বাজিতপুরে গিয়েছিল। কোর্টে কাজ থাকিলে সেদিন গোপাল গ্রামে ফেরে না, আজ ফিরিল। রাত্রি প্রায় দশটার সময়।

সেনদিদির খবরটা আসিল গোপাল যখন খাইতে বসিয়াছে,-শশীর সঙ্গে। খবরটা দিল কৃপানাথ স্বয়ং।

এই তো বিপদ দাদা। আপনাকে একবার যেতে হচ্ছে।

গোপাল শুষ্কমুখে কাতরভাবে বলিল, আমি গিয়ে কী করব হে?

কৃপানাথ বলিল, একবার যেতে হচ্ছে। একটা বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়ে–

বুদ্ধি-পরামর্শ? বিপদে বুদ্ধি-পরামর্শ দিতে যাওয়াটা দোষের নয়, গোপাল তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করিয়া উঠিয়া গেল। ধীরস্থির থাকিবার চেষ্টা করেও গোপাল কিন্তু চাঞ্চল্য চাপিতে পারে না। বাড়ির মেয়েরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। মাথা হেঁট করিয়া শশী নীরবে খাইয়া যায়।

ও-বাড়িতে দিয়ে কৃপানাথকে গোপাল কী পরামর্শ দেয় সে-ই জানে, খাইয়া উঠিয়া শশী ঘরে গিয়া বসিতে-না-বসিতে সে আবার আসিয়া হাজির হয়। রলে, তোমাকে একবার যেতে হবে শশী।

শশী বলে, আমাকে অনুগ্রহ করে তুমি বলবেন না।

অ্যাঁ? বলিয়া কৃপানাথ একটু থামে। শীর্ণ মুখখানা তাহার একটু লম্বাটে হইয়া যায়। ভাবিয়া বলে, আমি আপনার পিতৃবন্ধু–

শশী বলে, আপনি যান মশায়, আমার ঘুম পেয়েছে।

কৃপানাথ আবার একটু থামে থতথত ভাবটা কাটিতে একটু সময় লাগে তার। তার সংস্কৃত শ্লোক বলার মতো গড়গড় করিয়া বিপদের কথা বলিয়া যায়, চোখদুটো তার ছলছল করে। শশী না গেলে সেনদিদি বাঁচিবে না, গেলেও বাঁচিবে কি-না ভগবান জানেন, তবু যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ কিনা তাই দয়া করিয়া আপনি একবার চলুন শশীবাবু।

গাঁয়ে আর ডাক্তার নাই, কৃপানাথ নিজে যদিও চিকিৎসক, এসব হাঙ্গামার ব্যাপারে সে বোঝে না। জ্বর-জ্বালা হয়, পাঁচন বড়ি দিয়া চোখের পলকে সারাইয়া দিবে, এ তো তা

নয়। শশী ভিন্ন সেনদিদির এখন আর গতি নাই। শুনিতে শুনিতে শশীর মনে পড়ে সেনদিদির সেই বসন্ত হওয়ার ইতিহাস, অসময়ে সাতগাঁর একটি বসন্তরোগীর দেহের বীজাণু দু-মইল মাঠঘাট বাড়িঘর ডিঙাইয়া সেনদিদির দেহে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল, যামিনীর চেলা ছিল সাতগাঁর রোগীটির চিকিৎসক। সেদিন এ-বাড়িতে গোপাল আর ও-বাড়িতে যামিনী তাকে সেনদিদির চিকিৎসা করিতে দেয় নাই। কত যুক্তি তর্ক অপমান আস্ফালনের বাঁধা ঠেলিয়া সেনদিদিকে সে বাঁচাইয়াছিল—একরকম গায়ের জোরে। আজ আবার অন্য কারণে সেনদিদি মরিতে বসিয়াছে। আজ তার চিকিৎসা করিতে বাঁধা নাই, নিজে গোপাল ডাকিয়া পাঠাইয়াছে। কেন ডাকিয়াছে? পুত্র বলিয়া এভাবে তাকে ডাকিবার অধিকার কে দিয়াছে গোপালকে? সেনদিদি মরুক বাঁচুক শশী কি গ্রাহ্য করে। এমন কত রোগী শশীর নিজের হাতে মরিয়াছে—সেনদিদি তো আজ শশীর রোগীও নয়। আর সমস্ত কথা সে যদি ভুলিয়াও যায়, যদি শুধু মনে রাখে যে সে ডাক্তার, মরণাপন্ন রোগীর আত্মীয় তাকে ডাকিতে আসিয়াছে, তবু না-যাওয়ার অধিকার তার আছে। দেহ তার অসুস্থ দুর্বল, সমস্ত দিন খাটিয়া খাটিয়া সে শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে, এখন ডাক আসিলে সে ফিরাইতে পারে বইকী। তার কি বিশ্রামের দরকার নাই?

কৃপানাথ ক্ষুণ্ণমনে চলিয়া গেলে আলোটা কমাইয়া শশী খাটে বসিয়া একটা মোটা চুরুট ধরাইল। আজকাল বিড়ির বদলে সে চুরুট খায়।

কুন্দ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এখন শোবেন শশীদাদা? মশারি টাঙিয়ে দেব?

শশী বলিল, দে।

মশারির কোণ বাঁধিতে বাঁধিতে বুন্দ বলিল, সেনদিদিকে একবার দেখতে যাবে না শশী দাদা?

শশী রাগিয়া আগুন হইয়া বলিল, তুই আমার সঙ্গে ইয়ার্কি দিচ্ছিস নাকি কুন্দ?

কুন্দ থতথত খাইয়া গেল। তারপর কাঁদিয়া বলিল, দুটি খেতে পরতে গিচ্ছেন বলে আমি কথা কইলেই আপনি রেগে যান। কী করেছি আপনার আমি? এর চেয়ে আমায় তাড়িয়ে দিন শশীদাদা, আমি যেখানে হোক চলে যাই।

শশী নরম হইয়া বলিল, আজেবাজে কথা বলিস তাই তো রাগ হয়।

কুন্দও কান্না সহজে থামে না! সে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, আজেবাজে কথা কখন বললাম, কখন ইয়কি দিলাম? একবার চিকিৎসা করে ওঁকে বাঁচিয়েছিলেন, তাইতো বললাম দেখতে যাবেন কিনা। তাও দোষের হয়ে গেল?

শশী আরও নরম হইয়া বলিল, শরীরটা ভালো নেই কুন্দ, গা-হাত পা ব্যথা করছে, কাঁদিস না। হাতের কাজটা চটপট শেষ করে দিকি, শুয়ে পড়ি।

রাত প্রায় বারোটার সময় শশীর দরজা ঠেলিয়া গোপাল আস্তে আস্তে ডাকিল, শশী? শশী ঘুমোলি?

অসুস্থ শরীরের তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাবটা এতক্ষণে শশীর ঘুমে পরিণত হইতেছে, জাগিয়া সাড়া দিতে গোপাল দরজা খুলিতে বলিল। শশী উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিল। গোপালের হাতে আলো ছিল, মেঝেতে সেটা নামাইয়া দিয়া সে বসিল খাটে। গোপাল স্তব্ধ, বিষন্ন, গম্ভীর; মনে হয় কথা সে কিছুই বলিবে না, নির্বাক আবেদনের ভঙ্গিতে এমনিভাবে মধ্যরাত্রে বসিয়া থাকিবে ছেলের ঘরের সামনে!

শশীই শেষে বিরক্ত হইয়া বলিল, আমার ঘুম পাচ্ছে।

গোপাল বলিল, ঘুম পাচ্ছে? তা পাবে বইকী, রাত কি কম হল! শরীরটাও তো তোমার ভালো নেই। একটা মানুষ মরে যাচ্ছে, তাই, নইলে তোমায় ডাকতাম না শশী।

শশী চুপ করিয়া রহিল। গোপাল ব্যগ্রভাবে বলিল, যাবি না একবার? শুধু তো মরবে না শশী, কী যন্ত্রণাই যে পাচ্ছে।

শশী বলিল, বাজিতপুর থেকে ওরা ডাক্তার আনাল না কেন। বিকেলে লোক পাঠালে এতক্ষণে এসে পৌঁছত!

গোপাল বলিল, সে বুদ্ধি কারো হয়নি। তুই গাঁয়ে থাকতে বাজিতপুরে ডাক্তার আনতে লোক পাঠাবেই বা কেন? তোর চেয়ে তারা তো বেশি জানেশোনে না। ডাকলে তুই যে যাবি না, ওরা তা ভাবতেও পারেনি শশী। কৃপানাথ এখন আমার হাতে-পায়ে ধরে কাঁদাকাটা করছে বাবা। তুই অপমান করে তাড়িয়ে দিলি, তাই তোর কাছে আসতে আর সাহস পাচ্ছে না।

শশীর ভয়ানক কষ্ট হইতেছিল, সে মৃদুস্বরে বলিল, মান-অপমান তো আমারও আছে বাবা।

গোপাল বলিল, না, না, তোকে অপমান করেনি শশী। না-বুঝে যদি একটা কথা বলে থাকে, কথা গোপাল শেষ করে না। তারপর দুজনেই চুপ করিয়া থাকে। উশখুশ করে গোপাল, করুণ চোখে সে তাকায় শশীর দিকে, মেরজাই-এর ফিতাটা টান দিয়া খুলিয়া বুকটা উদলা করিয়া দেয়, খাইয়া উঠিয়া পান মুখে দিবার সময় পায় নাই, তবু হয়তো অভ্যাসে, হয়তো মানসিক চাঞ্চল্যে, মুখের শূণ্যতাটা পানের মতো বারকয়েক চিবাইয়া দেয়। বড় অদ্ভুত রকমের শ্রীহীন দেখায় গোপালকে।

গোপাল যে নিজেই তাহাকে অনুরোধ করিতে আসিতে পারবে শশী এটা ভাবিতে পারে নাই। এতবেশি সেনদিদির জীবনের মূল্য গোপালের কাছে? একদিন ওর চিকিৎসা করিতে কেন তবে সে তাকে বাঁধা দিয়াছিল? গভীর দুঃখ ও লজ্জায় শশীর মন ভরিয়া গিয়াছিল, তবু সে মনে-মনে আশ্চর্য হইয়া গেল। বসন্ত যখন রূপ মুছিয়া লইয়া গেল সেনদিদির তখন মমতা আসিল গোপালের, এমন গভীর অবুঝ স্নেহ।

তারপর শশী বলিল, যান, শোবেন যান আপনি। আমি যাচ্ছি ও-বাড়ি জামাটা গায়ে দিয়ে।

গোপাল নিরুত্তরে উঠিয়া গেল। মুখ দিয়া আর তাহার কথা বাহির করার ক্ষমতা ছিল না। শশী তাহাকে অনেক কষ্ট দিয়াছে, আজ যে কষ্ট দিল তার তুলনা হয় না। কৃপানাথ যখন ডাকিতে আসিয়াছিল তখন যদি শশী সেনদিদিকে দেখিতে যাইত, এ লজ্জাটা তবে গোপালের থাকিতে পারিত নেপথ্যে।

এভাবে যখন তাহাকে যাইতেই হইল, সেনদিদিকে বাঁচানোর চেষ্টাটা শশী বিশেষ সমারোহের সঙ্গেই করিয়া দেখিল। রাতদুপুরে এই বিপদগ্রস্ত বাড়িতে সে আরও একটা অতিরিক্ত বিপর্যয় আনিয়া ফেলিল হুকুম দিয়া ধমক দিয়া সকলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। অনেক জল গরম হইল, লোক পাঠাইয়া হাসপাতাল হইতে ওষুধ যন্ত্রপাতি ও কম্পাউন্ডারকে আনানো হইল, দেখিয়া কে বলিবে কিছুক্ষণ আগেও উদাসীন শশী সেনদিদিকে মরিতে দিতে প্রস্তুত ছিল। আবার তেমন জিদ শশীর আসিয়াছে যার জোরে সেনদিদিকে আগে একবার সে বাঁচাইয়াছিল। সেদিন সে লড়িয়াছিল বাহিরের বাধার সঙ্গে, আজ কি শশীকে লড়িতে হইল অন্তরের বাঁধার সঙ্গে? মুমুর্ষ সেনদিদিকে দেখিয়াও কি শশীর মনে বিতৃষ্ণ মিলাইয়া গেল না? সব তো তারই হাতে, এ দুজনের মরণ বাঁচানো। কী না করিতে পারে শশী? শুধু সেনদিদির নয়, সেনদিদির নবাগত চিহ্নের চিহ্নকেও তো সে চিরদিনের জন্য পৃথিবী হইতে মুছিয়া দিতে পারে। কারো প্রশ্ন করাও চলিবে না কেন এমন হইল। শশী কি শুধু মানুষ বাঁচাইতে শিখিয়াছে, মারিতে শেখে নাই? অতি সহজে, অন্যমনস্ক অবস্থায় ভুল করার মতো করিয়াও, সে তা পারে। বাকি জীবনটা তাতে খুব কি আপসোস করিতে হইবে শশীকে?

শেষ রাত্রে একটি ছেলে হইল সেনদিদির, ভোরবেলা সেনদিদি মরিয়া গেল। এত কম জীবনীশক্তি ছিল সেনদিদির, এত দুর্বল হইয়া গিয়াছিল তার হৃদপিণ্ড, যে, প্রথমে তাকে পরীক্ষা করিয়া শশীর বিশ্বাস হইতে চাহে নাই, সেনদিদিকে দেখিয়া কখনও মনে হয় নাই তার দেহযন্ত্রের আসল ইঞ্জিনটা এমন হইয়া গিয়াছে। তবু, শশীও ভাবিতে পারে নাই এ যাত্রা সে রক্ষা পাইবে না। ডাক্তার মানুষ সে, সেও যেন ভালো করিয়া বুঝিতে পারিল না

অজ্ঞান অবস্থা পার হইয়া সেনদিদির যখন শান্ত হইয়া ঘুমাইতে আরম্ভ করা উচিত ছিল হঠাৎ হাত-পা কেন ঠাণ্ডা হইয়া আসিল।

শশী জানে এরকম হয়, মানুষের দেহের মধ্যে আজও এমন কিছু ঘটিয়া চলে এ যুগের ধম্বন্তরিরও যা থাকে জ্ঞানবুদ্ধির আগোচর। এ তো মানুষের বানানো কল নয়। তবু শশীর রাতজাগা চোখের আরক্ত ভাব যেন বাড়িয়া গেল, অবসাদ যেন হইয়া উঠিল অসহ্য। আর কিছু করিবার ছিল না, বাড়ি গিয়া স্নান করিয়া শশী কড়া এককাপ চা খাইল, তারপর শুইয়া পড়িল। আসিবার সময়ও বাহিরে গোপালকে সে দেখিয়া আসিয়াছে।

চেনা ও জানা মানুষগুলির মধ্যে দু-চারজনকে শশী যেমন মরিতে দেখিয়াছে, তেমনি তাদের ঘরে দু-চারজনকে জন্ম লইতেও দেখিয়াছে। দু-চারজন মরিবে দু-চারজন জন্ম লইবে এই তো পৃথিবীর নিয়ম। তবু এসব মরণ, মরণেঅভ্যস্ত শশী ডাক্তারকে বড় বিচলিত করে। যারা মরে তারা চেনা, স্নেহে ও বিদ্বেষে দীর্ঘকালব্যাপী সম্পর্ক তাদের সঙ্গে, যারা জনায় তারা তো অপরিচিত। এই কথা ভাবে শশী ; সেনদিদি কি বাঁচিত, সে যদি অন্যভাবে চেষ্টা করিত, যদি অন্য ওষুধ দিত? শেষের দিকে সে যে ব্যস্তভাবে গোটা দুই ইনজেকশন দিয়াছিল রোগিণীর পক্ষে তা কী অতিরিক্ত জোরালো হইয়াছিল? হইয়া থাকিলেও তাহার দোষ কী? অনেক বিবেচনা করিয়া তবে সে ইনজেকশন দুটো দিয়াছিল, তা ছাড়া আর কিছুই তখন করিবার ছিল না। নিজের জ্ঞানবুদ্ধিতে যা ভালো বুঝিয়াছে তাই সে করিয়াছে, তার বেশি আর সে কী করিতে পারে? আজ পর্যন্ত সে যে অনেকগুলি প্রাণ রক্ষা করিয়াছে সেটাও তো ধরিতে হইবে?

গোপাল একেবারে মুহ্যমান হইয়া গেল। এমন পরিবর্তন আসিল গোপালের যে সকলের সেটা নজরে পড়িতেছে বুঝিয়া শশীর লজ্জা করিতে লাগিল। গোপাল চিরকাল ভোজন-বিলাসী, এখন তার আহারে রুচি নাই; অমন চড়া মেজাজ, কিন্তু মুখ দিয়া আর কড়া কথা বাহির হয় না। গম্ভীর বিষণ্নমুখে বাহিরের ঘরে ফরাশে বসিয়া তামাক টানে আর আবশ্যক অনাবশ্যক নথিপত্র ঘাঁটে, যেগুলি গোপালের কাছে এতকাল নাটক নভেলের মতো প্রিয় ছিল। মন হয়তো বসে না গোপালের, তবু এই অভ্যস্ত কাজের মধ্যে ডুবিয়া থাকিয়া সে

সময় কাটানোর চেষ্টা করে। শশী আশ্চর্য হইয়া যায়। এসব তার কাছে একান্ত খাপছাড়া লাগে। অপ্রত্যাশিত যত কিছু ঘটিয়াছে শশীর জীবনে, তার মধ্যে গোপালের চরিত্রের এই বেমানান দিকটা সবচেয়ে বিস্ময়কর মনে হয়।

শশীর সঙ্গে কথাবার্তা গোপালের খুব কমই হয়। দুজনের দুটি জগৎ যেন এতদিনে একেবারে পৃথক হইয়া গিয়াছে। একদিন আচমকা গোপাল জিজ্ঞাসা করিল, তোমার সেনদিদি কিসে মরল শশী?

হার্ট খারাপ ছিল।

গোড়ায় বুঝি ধরতে পারো নি?

গোড়াতেই ধরেছিলাম।

তবে মরল যে।

এ প্রশ্নে শশী হঠাৎ রাগিয়া গেল। বলিল, গোড়ায় রোগ ধরতে পারলেও মানুষ মরে।

গোপাল বলিল, ইনজেকশন দুটো আগে দাওনি বলে হয়তো–

এটুকু বলিয়া উৎসুকভাবে গোপাল খানিকক্ষণ শশীর মন্তব্যের প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। কী সত্য সে নির্ণয় করিতে চায় কে জানে–শশী একেবারে স্তম্ভিত হইয়া যায়। খুঁটিয়া খুঁটিয়া তার চিকিৎসার আগাগোড়াই হয়তো গোপাল জানিয়া লইয়াছে। কী ভাবিয়াছে গোপাল? চিকিৎসক-পুত্রের সম্বন্ধে কী ভাবনা তার মনে আসিয়াছে? মুখখানা লাল হইয়া যায় শশীর। কিছু বলিতে ভরসা পায় না।

কৃপানাথ বলছিল সময়মতো দু-একদানা মৃগনাভি দিলে–

শশী এবার নীরবে উঠিয়া চলিয়া গেল। রাগও হয়, মমতাও বোধ করে শশী। বিষয়ী, সংসারী পৌঢ়বয়সী মানুষ, তার এ কী ছেলেমানুষি। কুন্দ জিজ্ঞাসা করে, মামার কী

হয়েছে, শশীদাদা? একটু স্নেহব্যাকুল সুরেই জিজ্ঞাসা করে। কুন্দর ছেলেটির বড় কঠিন অসুখ হইয়াছিল। অনেক চেষ্টায় শশী তাকে ভালো করিয়া তুলিয়াছে। পাকা দালানে একখানা ঘরও দেওয়া হইয়াছে কুন্দকে, আর দেওয়া হইয়াছে সংসার-পরিচালনার কিছু কিছু দায়িত্ব। মুখরা কুন্দ একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। কত সামান্য কামনা থাকে এক-একটি স্ত্রীলোকের, যার অভাবে স্বভাবটি হইয়া ওঠে হিংস্র খিটখিটে! শশীরও আজকাল মনে হয় ; না, কুন্দর প্রকৃতি তেমন মন্দ নয়, মোটামুটি ভালোই মেয়েটা। নিজের কাজের চাপে আজকাল আর বেশি নজর দিবার সময় পায় না, কুন্দ যে সিন্ধুকে বেশ যত্ন-টত্ব করে তাতে শশী আরও খুশি হয়।

কুন্দর প্রশ্নের জবাবে সে বলে, আমি জানি না কুন্দ।

কুন্দ বলে, আপনি বিয়ে টিয়ে করবেন না, কাল আমার কাছে বড় দুঃখ করছিলেন।

শশী বলে, বাবা দুঃখ করছিলেন, না তুই বাবার কাছে দুঃখ করছিলি?

কুন্দ একটু হাসিয়া বলে, আমরা দুজনেই করছিলাম।

শশী অবাক হইয়া তাকায় কুন্দর দিকে। এমন খাপসই আলাপ কুন্দ শিখিল কোথায়? হঠাৎ শশীর মনে হয় কুন্দ যেন বড় সুখী, ওর জীবনটা যেন আনন্দে পরিপূর্ণ।একটু ভাবপ্রবণ কুন্দ, একটু ঈর্ষাপ্রবণও বটে, শাড়ি গহনার লোভটাও বেশ একটু প্রবল, স্বামী তার গোপালের মুহুরিদের সঙ্গে মিশ খাইয়া গিয়াছে, তবু কুন্দ এত সুখী যে শখ করিয়া দুটো-একটা কৃত্রিম দুঃখ বানাইয়া সে উপভোগ করে, তার অভাব অভিযোগগুলিও তাই। কুন্দর অস্তিত্ব এতকাল শশীর কাছে ছিল জড়বস্তুর মতো নিরর্থক, আজ ওর অর্থহীন জীবনে এমন সুখের সমাবেশ দেখিয়া সে যেন খানিকটা ভড়কাইয়া গেল। কী যেন করিয়া দিয়া গিয়াছে শশীকে কুসুম। সামনে আসিলেই মানুষের চোখেমুখে ব্যাকুল চোখে কী যেন শশী খোজে। মুখে হাস্যচ্ছটা দেখিলে, চোখে আনন্দের ছাপ দেখিলে শশীর মন জুড়াইয়া যায়! সজল চোখে ক্লিষ্ট কাতরমুখে যে দাঁড়ায় শশীর সামনে তাকে শশীর

মারিতে ইচ্ছে হয়। হঠাৎ কুন্দকে বড় ভালো লাগে শশীর। সস্নেহে বলে, তোর কী চাই বল তো কুন্দ? খুব ভালো একখানা কাপড় নিবি? বেনারসী?

কুন্দ অবাক। বলে, হঠাৎ কাপড় কেন দাদা?

শশী গম্ভীরমুখে বলে, দেব, তোকে একখানা কাপড় দেব। এমনি দেব কুন্দ, মিছিমিছি।

মিছিমিছ কুন্দকে শশী কাপড় কিনিয়া দেয়। এদিকে আবির্ভাব ঘটে গোপালের গুরুদেবের। ভোলা ব্রহ্মচারী নামে তার খ্যাতি। সুপুষ্ট লোমশ দেহ, মাথা গোঁফদাড়ি ভ্রূ সব কামানো, হাতে কুচকুচে কালো একটি দণ্ড। গায়ে গেরুয়া, পায়ে গেরুয়া-রঙ-করা রাবার-সোলের ক্যাম্বিশ জুতা। বছর পাঁচেক একে গোপাল একরকম ভুলিয়াই ছিল, হঠাৎ এমন ব্যাকুলভাবে স্মরণ করিয়াছে যে ভগবানকে করিলে হয়তো তিনিও দেখা দিতেন। সসম্মানে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিল, স্বহস্তে পা ধোয়াইয়া দিল। অন্দরের একখানা ঘর আগেই ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া রাখা হইয়াছিল, সেখানে ভোলা ব্রহ্মচারীকে থাকিতে দেওয়া হইল। ব্রহ্মচারীকে শশী ভক্তি করিত, এসময় হঠাৎ তাহার আগমনে বিশেষ খুশি না হইলেও শ্রদ্ধার সঙ্গে একটা প্রণাম করিল।

ব্রহ্মচারী দিন সাতেক রহিয়া গেল। এই সাতদিন একমুহূর্তের জন্যও গোপাল তাহার সঙ্গ ছাড়িল না। কত প্রশ্ন গোপালের, কত ব্যাকুল নিবেদন। গোপালের অবহেলায় বাজিতপুরের কোর্টে একটা মামলা ফাঁসিয়া গেল। তা যাক, মনে বৈরাগ্য আসিয়াছে, ওসব মামলা-মোকদ্দমা বিষয়কর্ম তার কাছে এখন তুচ্ছ। শুধু সেনদিদির জন্য তো নয়, আজ কতকাল হইল গোপালের মনে ভাবনা ঢুকিয়াছে, কিসের জন্য এসব। কার জন্য সে এতকষ্টে অর্থসম্পদ সংগ্রহ করিতেছে। একটা মেয়ে আছে সিন্ধু, দুদিন পরে ওর বিবাহ দিলে পরের ঘরে চলিয়া যাইবে, তখন কে থাকিবে গোপালের? শশী? শশীর কাছে কোনো আশাভরসাই সে রাখে না। বাপকে যে ছেলে ঘৃণা করে, তার কাছে কী প্রত্যাশা থাকে বাপের? ধরিতে গেলে সেই তো মনটা ভাঙিয়া গোপালের।

এ বড় আশ্চর্য কথা যে কুসুমের মতো গোপালের মনটাও শশীই ভাঙিয়া দিয়াছে। এ দুজনের মনের মতো হইতে না-পারার অপরাধটা শশীর এতবড় ভাঙা মনটা লইয়া কুসুম সরিয়া গিয়াছে। গোপাল আজও হাল ছাড়ে নাই। ব্রহ্মচারীর কাছে মনোবেদনা ব্যক্ত করিয়া সে তফাতে যায়, ব্রহ্মচারী ডাকেন শশীকে।

বাবা শশী, তুমি বিদ্বান বুদ্ধিমান, তোমাকে বলাই বাহুল্য যে খেয়ালের চেয়ে কর্তব্য অনেক বড়।

আজ্ঞে হ্যাঁ।

বাপকে ভক্তিশ্রদ্ধা করার চেয়ে বড় কর্তব্য ছেলের আর কী আছে?

ঠিক এমনিভাবেই বলেন ব্রহ্মচারী, এমনি ভূমিকাবিহীন কঠোর ভাষায় কথাটা তাই বড় জোরালো হয়। শশী আহত হইয়া বলে, বাপের প্রতি ওটাই ছেলের প্রথম কর্তব্য বইকী। ছেলের মনের ওটা স্বাভাবিক ধর্ম বাবা, যুক্তিতর্কে বোঝানোর জিনিস নয়। বাপের স্বভাব মন্দ হলে ছেলে হয়তো বড় হয়ে তাকে সমালোচনা করে কিন্তু যেমন বাপই হোক ছেলের মনের অন্ধভক্তিটা কিছুতেই যাবার নয়।

কম নয় শশী, গুরুকে সে গুরুর মতো বোঝায়। সাত-আট বছর আগে ভোলা ব্রহ্মচারীর কাছে গোপাল তাহার দীক্ষা দিয়াছিল, ওঁ স্থানে নমো বলিয়া গুরুর মন্ত্র কিছুদিন শশী জপও করিয়াছে, তারপর কত পরিবর্তনই হইয়াছে শশীর!

সংক্ষেপে পরিচ্ছন্নভাবে তারপর অনেক জ্ঞানগর্ভ কথাই ব্রহ্মচারী বলেন, শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনিয়া শশীও জ্ঞানগর্ভ জবাব দেয়। মনে মনে সে টের পায় যে গুরুর চেয়ে জ্ঞানটা তার অনেক বেশি বাড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু এটা সে প্রকাশ পাইতে দেয় না। শশীকে ব্রহ্মচারীর বড় ভালো লাগে। ছেলের সম্বন্ধে যেসব অভিযোগ গোপাল করিয়াছিল সমস্ত ভুলিয়া গিয়া অনেককালের সঞ্চিত বাধাধরা উপদেশগুলি নেপথ্যে রাখিয়া নানা বিষয়ে শশীর সঙ্গে আলাপ করেন। ক্রমে ক্রমে মনে হয় অনেকগুলি বছর আগে তাদের মধ্যে যে গুরুশিষ্যের

সম্পর্কটি স্থাপিত হইয়াছিল, আজ তাহা বাতিল হইয়া গিয়াছে ধর্মের কথা নয়, ইহকালপরকাল পাপ-পুণ্য সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর নয়, এবার তাদের মুখোমুখি বসিয়া শুধু গল্প করা, অসমবয়সী দুটি বন্ধুর মতো। দুটি দিন এখানে বাস করিতে-নাকরিতে শশীর কাছে একটা মুখোশ যেন ভোলা ব্রহ্মচারীর খসিয়া গেল, ভিতরের আসল মানুষটির সঙ্গে শিষ্যের তিনি পরিচয় ঘটিতে দিলেন। আপনভোলা সদাশিব মানুষ, অনেকটা যাদবের মতো ঘটনাচক্রে তিনি ব্রহ্মচারী, সাধ করিয়া নয়– তারপর অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। ক্রমে ক্রমে জীবনের দু-একটি ঘটনা ও সম্ভাবনার কাহিনী শশীকে তিনি শোনান। প্রথম যৌবনে প্রথম সন্ন্যাসী-জীবনের কথা, ঘরে যা মেলে নাই তারই অন্বেষণে দেশে দেশে যাযাবর বৃত্তি। অনিশ্চিতের সন্ধানে বাহির হওয়ার এমনি সব কাহিনী চিরদিন শশীকে ব্যাকুল করে। তারও অনেক দিনের বাহির হওয়ার সাধ।

গোপালের অনুরোধে শশীর মনটি ঘরের দিকে টানিবার চেষ্টা করিতে গিয়া তার ঘর ছাড়ার প্রবৃত্তিকেই ব্রহ্মচারী উস্কাইয়া দিয়া গেলেন।

দিন সাতেক গুরুসঙ্গ করিয়া গোপাল যেন একটু গা ঝাড়া দিয়া উঠিল। নিজের সঙ্গে কিছু সে একটা রফা করিয়া ফেলিয়া থাকিবে, কারণ দেখা গেল কর্তব্য সম্পাদন ও শশীর প্রতি ব্যবহার তার সহজ্ঞ ও স্বাভাবিক হইয়া আসিয়াছে।

বলে, হাসপাতালে রোগীপত্র কেমন হচ্ছে শশী?

শশী বলে, বাড়ছে দু-একটি করে।

গোপাল আপসোস করিয়া বলে, বেগার খেটেই তুমি মরলে। মাইনে হিসেবে কিছু কিছু নাও না কেন? পরিশ্রমের দাম তো আছে তোমার, একটা লোক রাখলে তাকে তো দিতে হত?

শশী বলে, হাসপাতালের টাকা কোথায় যে নেব বাবা? সামান্য টাকার হাসপাতাল, আমিও যদি নিজের পাওনা গণ্ডা বুঝে নিতে থাকি, হাসপাতাল চলবে কিসে?

তা না নিক শশী মাহিনা বাদে কিছু এখন সেটা আর আসল কথা নয় গোপালের কাছে, ছেলের সঙ্গে একটু সে আলাপ করিল মাত্র। এমনি নারীসুলভ একধরনের ছলনায়ময় ব্যবহার গোপালের আছে, শশীকে মাঝে মাঝে যা আশ্চর্য ও অভিভূত করিয়া দেয়। ভোলা ব্রহ্মচারীকে শশী কথার কথা বলে নাই, গোপালের প্রতি একটা অন্ধ ভয়মেশানো ভক্তি আজও তার মধ্যে অক্ষয় হইয়া আছে-হয়তো চিরদিনই থাকিবে। গোড়ার দিকে অনেকগুলি বছর ধরিয়া তার মনের সমস্ত গাথুনি যে গাথিয়াছিল গোপাল, সেগুলি ভাঙিতে পরিবে কে?

কায়েতপাড়ার পথ দিয়া চলিবার সময় এক-এক দিন শশী যামিনী কবিরাজের বাড়িতে শিশুর ক্রন্দন শুনিতে পায়। কচি গলার কান্না। খুবই যেন কচি মনে হয় গলাটা শশীর। বিপিনের কি এক ছোট শিশু আছে? অনেকদূর চলিয়া গিয়াও অনেকক্ষণ অবধি কান্নার সুরটি শশীর কানে বাজিতে থাকে। নিজের এই ভাবপ্রবণতা ভালো লাগে না। যে শিশু জনিয়াছে সে মাঝে মাঝে কাঁদিবে বৈ কি! তাতে এতখানি বিচলিত হওয়ার কী আছে? নিজের বাড়িতেও এমন কান্না সে কত শোনে।

সেনদিদির মারা যাওয়ার মাস তিনেক পরে একদিন অনেক বেলায় শশী ফিরিয়াছে, এমনি কান্নায় রত একটি শিশুকে বুকে করিয়া কুন্দ শশীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, সেনদিদির ছেলে শশীদাদা।

রোদের তেজে অস্নাত অভুক্ত শশীর মুখখানা শুকনো দেখাইতেছিল, আরও একটু পাংশু হইয়া সে বলিল, কার ছেলে বললি কুন্দ, সেনদিদির?

কুন্দ বলিল, হ্যাঁ। পেট থেকে পড়েই তো মাকে খেয়েছে রাক্ষস, কিপানাথ কবরেজের শালীর কচি ছেলে আছে, তার মাই খেত। সে আজ চলে গেল কিনা, মামা তাই আমাকে এনে দিলেন। খুকির সঙ্গে আমার দুধ খাবে। মার মতো শেষে আমাকেও না খায়!

একগাল হাসিল কুন্দ, সেনদিদির কাথা-জড়ানো ছেলে শশীর সামনে মেলিয়া ধরিয়া বলিল, ওকে মানুষ করার জন্য সোনার হার পাব শশীদাদা। মামার মন আজকাল বড় দরাজ হয়েছে।

ওকে আনলে কে?

মামাই আনল। এমনি কথা জড়িয়ে বুকের কাছটিতে ধরে। বাড়ির ছেলেমেদের কাছে ঘেঁষতে দেয় না, পরের ছেলে কোলে নেবার মামার রকম দেখে হেসে হেসে বাঁচি না। আমায় কী বললেন জানেন?–ছেলেটা নিলামরে কুন্দ আমি, মানুষ করতে পারবি? তোকে দশভরির হার গড়িয়ে দেব। আমি বললাম, দিন না মামা, আমার ছেলেমেয়ের সঙ্গে মানুষ হবে, এতে আর হাঙ্গামা কী?

শশী ঝাঝিয়া বলিল, কেন তুই এ ভার নিতে গেলি? এত গয়নার লোভ তোর!

কুন্দ অবাক হইয়া বলিল, গয়নার লোভে বুঝি? অতটুকু মা-মরা শিশু, কেউ না দুধ দিলে বাঁচবে কেন? মামি-টামি কারো কচি ছেলে নেই। সেকথা যদি বাদ দেন, মামা বললে আমি তো না বলতে পারি না।

সন্দিগ্ধভাবে তাকায় কুন্দ, খানিক বোঝে খানিক বোঝে না। এতক্ষণ পরে শশী হঠাৎ জামাকাপড় ছাড়িতে আরম্ভ করিল। কুন্দ জিজ্ঞাসা করিল, এত রাগলেন কেন শশীদাদা?

না, রাগিনি।

সেনদিদির ছেলে কান্না থামাইয়াছিল। কুন্দ তাকে একটা চুমো খাইল,–সস্নেহে, গৌরবের সঙ্গে। কে জানে কী দুষ্টামি আছে কুন্দর মনে তারপর ছেলেকে আর একবার শশীর দিকে বাড়াইয়া দিয়া বলিল, কী সুন্দর হয়েছে ছেলেটা দেখুন শশীদাদা, সেনদিদির মতো দেখতে হবে। মুখখানা দেখলে মায়া হয় না?

শশী শ্রান্তভাবে বলিল, তুই যা তো কুন্দ। ঘেমেচেমে হয়রান হয়ে এলাম, একটু বিশ্রাম করতে দে।

কার উপরে রাগ করিবে শশী, কাকে বলিবে? সেনদিদির ছেলে যে সুন্দর হইয়াছে তাতে সন্দেহ নাই, আশ্চর্যরকম সুন্দর হইয়াছে; সেনদিদির যে জমজমাট রূপ বসন্ত হরণ করিয়াছিল ছেলের মধ্যে যেন তার ক্ষতিপূরণ হইয়াছে সুদসমেত। এতটুকু ছেলে, কাচা সোনার মতো কী তার রঙ। ওর মুখ দেখিয়া গোপালের যদি মায়া হইয়া থোকে, মায়া করিয়া গোপাল যদি এই অনাথ শিশুকে বুকে তুলিয়া ঘরে আনিয়া থাকে, তাতে কার কী বলিবার আছে? এ তো মহত্ত্ব, প্রশংসনীয় কাজ। ক্ষোভে দুঃখে এজন্য এমন কাতর হওয়া তো শশীর উচিত নয়।

সেনদিদির ফুলের মতো শিশুকে দেখিয়া একটু কি মায়া হইল না শশীর মায়া করার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি কি তার এমনভাবে নষ্ট করিয়া দিয়া গিয়াছে কুসুম? গম্ভীর বিষন্নমুখে শশী স্নান করিতে গেল, সেনদিদির ছেলেকে কোলে করিয়া কুন্দ অদূরে আসিয়া বসায় ভালো করিয়া খাওয়া পর্যন্ত হইল না শশীর। অল্পে অল্পে শরীরটা তাহার কিছু ভালো হইয়াছে, কী ক্ষুধাই আজ পাইয়াছিল!

সমস্ত দুপুরটা শশী নিঝুম হইয়া রহিল। এবার কিছু করিতে হইবে তাহাকে, আর চুপ করিয়া থাকা নয়। আর গরমিল চলিবে না। স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে নিস্তেজ শয্যাশায়ী শশীর মনে অসংখ্য এলোমেলো ভাবনা বিস্ময়করভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া আসিতে থাকে, কোমল মমতাগুলির আলগা ফুলের মতো ঝুরঝুর করিয়া ঝরিয়া যায়। আগুনের আচে সরস বস্তুর শুকাইয়া যাওয়ার মতো নিজে সে রুক্ষ প্রকৃতির মানুষ হইয়া উঠিতেছে এমনি একটা অনুভূতি শশীর হয়। একেবারে বেপরোয়া, নির্মম, অবিবেচক কুসুমের জন্য মন কেমন করিত শশীর। বড় আকুলভাবে মন কেমন করিত। এতবড় উপযুক্ত ছেলের মর্যাদায় ঘা দিয়া মনকে কী করিয়া দিয়াছে গোপাল যে সেই মন-কেমন-করাকে আজ হাস্যকর মনে হইতেছে? সে যে-বাড়িতে বাস করে অবানবদনে সেনদিদির ছেলেকে সেখানে গোপাল কেমন করিয়া আনিল? সেনদিদিকে মরমর জানিয়াও শশী যে তার চিকিৎসা করিতে

যাইতে চাহে নাই গোপাল কি সে কথা ভুলিয়া গিয়াছে? শশীর অভিমান এতই তুচ্ছ গোপালের কাছে, সে কী ভাবিবে না ভাবিবে সেটা এতখানি অবহেলার বিষয়! শশীর কাছে তার একটু সংকোচ করিবারও প্রয়োজন নাই? ছেলের সম্বন্ধে এমনি ধারণা গোপালের যে সে ভাবিয়া রাখিয়াছে সেননিদির ছেলেকে বাড়িতে আনিয়া পুত্রস্নেহে মানুষ করিতে থাকিলেও শশী চুপ করিয়া থাকিবে, গ্রাহ্যও করিবে না। কে জানে, গোপালই হয়তো গ্রাহ্য করে না শশী চুপ করিয়া থাক অথবা গোলমাল করুক।

পরদিন সকালে হাসপাতাল-কমিটির মেম্বারদের কাছে শশী জরুরি চিঠি পাঠাইয়া দিল। শীতলবাবুর বাড়িতে সন্ধ্যার পর কমিটির জরুরি সভা বসিল। শশী পদত্যাগপত্র পেশ করিল, ডাক্তারের জন্য বিজ্ঞাপনের খসড়া দাখিল করিল, প্রস্তাব করিল যে হাসপাতালের সমস্ত দায়িত্ব কমিটির সুযোগ্য প্রেসিডেন্ট শীতলবাবুর হাতে চলিয়া যাক।

কমিটির হতভম্ব সভ্যেরা প্রশ্ন করিলেন, কেন শশী, কেন?

শশী বলিল, আমি গাঁ ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

এবার আর দ্বিধা নয়, গাফিলতি নয়। অনিবার্য গতিতে শশীর চলিয়া যাওয়ার আয়োজন অগ্রসর হইতে থাকে। হাসপাতাল-সংক্রান্ত ব্যাপারগুলি শীতলবাবুকে বিশদভাবে বুঝাইয়া দেয়, টাকাপয়সার সম্পূর্ণ হিসাব দাখিল করে, আর ভবিষ্যতের কার্যপদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু কিছু নির্দেশও লিখিয়া দেয়। ডাক্তারের জন্য কাগজে যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল তার জবাবে দরখাস্ত আসে অনেকগুলি। কমিটির সভ্যদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া তাদের মধ্যে কয়েকজনকে শশী দেখা করিতে আসিবার জন্য পত্র লিখিয়া দেয়।

সকলে খুতখুঁত করে, কেহ কেহ হায় হায় করিতেও ছাড়ে না। কোথায় যাইবে শশী, কেন যাইবে? সে চলিয়া গেলে কী উপায় হইবে গায়ের লোকের? পাস-করা ডাক্তারের দরকার হইলে আবার কি তাহদের ছুটিতে হইবে বাজিতপুরে? সকলে কৈফিয়ত চায় শশীর কাছে, তার সঙ্গে তর্ক জুড়িবার চেষ্টা করে। শশী না দেয় কৈফিয়ত, না করে তর্ক। মৃদু একটু হাসির দ্বারা অন্তরঙ্গতাকে গ্রহণ করিয়া প্রশ্নকে বাতিল করিয়া দেয়।

তবু খবরটা প্রচারিত হওয়ার পর হইতে চারিদিক এমন একটা হৈচৈ শুরু হইয়াছে যে মনে মনে শশী বিচলিত হইয়া থাকে। কেবল ডাক্তার বলিয়া স্বার্থের খাতির তো নয়, মানুষ হিসাবেও মনের মধ্যে সকলে তাহাকে একটু স্থান দিয়াছে বৈ-কি। সাধারণের ব্যাপারগুলিতে সে উপস্থিত থাকিলে সকলের মনে উৎসাহের সঞ্চার হয়, তার উপরে নির্ভর রাখিয়া সকলে নিশ্চিন্ত থাকে। এ তো অকারণে হয় না, কতবড় সৌভাগ্য শশীর, না চাহিয়া জনতার এই প্রীতি পাইয়াছে। এ তো শুধু সৎকার্যের পুরস্কার নয়। কী এমন সৎকাজটা শশী করিয়াছে? রাস্তাঘাটের সংস্কারের জন্য কোদাল ধরে নাই, ম্যালেরিয়া নিবারণের ছাত্রসঙ্গ প্রভৃতি গড়িয়া তোলে নাই, কিছুই করে নাই। শুধু হয়তো আশেপাশে দশটা গ্রামে শশীর চেয়ে বেশি প্রভাব আর কাহারো নাই! শশীকে যদি সকলে ভালো না বাসিবে এমনটা তবে হইবে কেন?

শশী তাদের ভালোবাসে, শশীকে তারা ভালোবাসিয়াছে? গ্রাম ও গ্রাম্যজীবনের প্রতি মাঝে মাঝে শশী গভীর বিতৃষ্ণ বোধ করিয়াছে, ধরিতে গেলে আজ কত বছর এখানে তার মন টিকিতেছে না; তবু ক্ষতের বেদনার মতো স্থায়ী একটা কষ্ট শশীর মধ্যে আসিয়াছে, গ্রাম ছাড়িবার কথা ভাবিলে কেমন করিয়া উঠে মনটা। এখানে জন্ম শশীর, এখানেই সে বড় হইয়াছে। এই গ্রামের সঙ্গে জড়ানো তার জীবন। কুসুম ছিল বিদেশিনী, যেদিন শখ জাগিল নির্বিকার চিত্তে বিদায় হইয়া গেল-শশী কেন তা পরিবে? রওনা হওয়ার সময় চোখের কোণে জল পর্যন্ত আসিবে শশীর। নিশ্চয় আসিবে।

কুন্দ কাঁদে -কেন শশীদা, কেন চলে যাচ্ছেন আমাদের ছেড়ে?

সেনদিদির ছেলের ভার লওয়ায় কুন্দর কাজ বাড়িয়াছে, তবু সে শশীর সেবা বাড়াইয়া দেয়। শশী যতক্ষণ বাড়িতে থাকে কোনো-না-কোনো ছলে কুন্দ বারবার কাসে আসে, ছলছল চোখে শশীর দিকে তাকায়, কত কী বলিতে চায় কুন্দ, সব কথা বলিতে সাহস পায় না।

কি রে কুন্দ, কী হল তোর? কুন্দ বলে।

কুন্দ বলে, আপনার জন সবাইকে ফেলে চলে যাওয়া কি ভালো শশীদাদা?

কেউ কি তা যায় না কুন্দ? সকলে কি দেশে গাঁয়ে থাকে?

যারা যায় পেটের ধান্দায় যায়, আপনার যাবার দরকার?

কার স্নেহের অভাবে এমন হু হু করিতেছে শশীর মন যে কুন্দর একটুকু মমতায় তার মোহ জাগে? মনে হয় আরও একটু মায়া করুক কুন্দ, আরও একটু কাতর হোক।

কাতর হইয়াছে গোপাল। একেবারে যেন আধমরা হইয়া গিয়াছে মানুষটা। নিজের বাড়িতে চোরের মতো বাস করে, ভীতু করুণ চোখে তফাত হইতে শশীর চালচলন লক্ষ করে, অপরকে জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া শশীর মতলবাদির সন্ধান নেয়। সামনাসামনি শশীর সঙ্গে কথা বলিবার সাহসও গোপাল পায় না! কে জানে কী বলিতে কী বলিয়া বসিবে তার দুরন্ত অবাধ্য ছেলে কোথায় যাইতে চায় শশী, কী করিতে চায় সঠিক খবর কেহ গোপালকে দিতে পারে না, তবে ব্যবস্থা দেখিয়া সকলে অনুমান করে যে দু-চার দশদিনের জন্য সহজ সাধারণ যাওয়া নয়, যাওয়াটা শশীর যাওয়ার মতোই হইবে।

তারপর একদিন শশীর চিঠির জবাবে হাসপাতালের চাকরির জন্য দরখাস্তকারীদের মধ্যে একজন গ্রামে আসিয়া পৌঁছিল। নাম তার অমূল্য, শশীর সঙ্গে একই বছর পাস করিয়া বাহির হইয়াছে। নাম শশীর মনে ছিল না, এখন দেখা গেল শশীর সে চেনা। অমূল্যের সঙ্গে আলাপ করিয়া শশীর ভালো লাগিল, তা ছাড়া এই সামান্য চাকরির দাবি লইয়া উপস্থিত হইলে বন্ধুকে কে ফিরাইতে পারে? লোক বাছিবার আর প্রয়োজন রহিল না, কয়েকদিন পরে পরে যাদের আসিবার জন্য তারিখ দেওয়া হইয়াছিল, তাদের বারণ করিয়া চিঠি লিখিয়া দেওয়া হইল।

নিজের বাড়িতেই অমূল্যকে একখানা ঘর শশী ছাড়িয়া দিলা বলিল, একদিন আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে হবে অমূল্য, রোগীদের চিনে সব বুঝে-শুনে নেবে-এবার থেকে সমস্ত ভার

তোমার। গাঁয়ের যারা তোমায় ডাকবে তাদের অধিকাংশ বড় গরিব, ফি-টা তাচ্ছিল্য করিতে শিখো। যার যা ক্ষমতা নিজে থেকেই দেবে, গায়ের লোক ডাক্তারকবরেজকে ঠকাতে সাহস পায় না।

সঙ্গে করিয়া অমূল্যকে সে হাসপাতালে লইয়া গেল, নিজের চেয়ারের পাশে তার জন্য চেয়ার পাতিয়া দিল। একটু মোটাসোটা মানুষ অমূল্য, ধীর শান্ত প্রকৃতি, কিন্তু উৎসাহের অভাব নাই। নিবিড় মনোযোগের সঙ্গে সে শশীর কাজ

নিয়মকানুনের বিষয়ে প্রশ্ন করিল। মনে হইল, এখন হইতেই সে যেন গভীর দায়িত্ব বোধ করিতেছে। শশী চলিয়া যাইবে, আর কখনও ফিরিয়া আসিবে না, একথা শুনিবার পর এখানকার সমগ্র নূতনত্বের অন্ধকারে তার নিজের আলোটি জ্বলিবার অধিকার যেন তার জনিয়াছে। একটু সমালোচনাও অমূল্য করিল। এই নিয়মটা এমন হইলে ভালো হইত না শশী, এই ব্যবস্থার বদলে এই ব্যবস্থা? এসব সুলক্ষণ, কাজকর্ম অমূল্য যে ভালোই করিবে তার প্রমাণ, তবু মনে মনে শশীর অকারণে ক্ষোভ জাগিতে লাগিল। তার একটা রাজ্য যেন কে বেদখল করিতে আসিয়াছে—কত যত্নে কত পরিশ্রমে শশী যে গড়িয়া তুলিয়াছে তার এই হাসপাতাল, লোকে যে এটা শশী ডাক্তারের হাসপাতাল বলিয়া জানে! ফোড়াকাটা ক-খানা ছুরি আছে হাসপাতালে তাও শশীর গোনাগাথা। গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে জানিয়াও ধীরে ধীরে হাসপাতালটিকে বড় করিয়া তুলিবার কল্পনা সে তো কম করে নাই। দুদিন পরে এখানে কর্তৃত্ব করিবে অমূল্য, হয়তো উন্নতি হইবে, হয়তো অবনতি হইবে, কিছুই শশী দেখিতে আসিবে না।

যাওয়ার কথা ভাবিতে ভাবিতে এমন হইয়াছিল শশী যে সে যেন ভুলিয়া গিয়াছিল কেহ তাহাকে যাইতে বলে নাই, নিজে সে সাধ করিয়া যাইতেছে, এখনও যাওয়া বন্ধ করিলে কেহ তাহাকে কিছু বলিতে আসিবে না। না গেলে তার যে চলিবে না, যাইতে সে যেন বাধ্য। কে যেন গা হইতে তাহাকে তাড়াইয়া দিতেছে, থাকিবার উপায় নাই।

যাইতে ক্ষোভই বা কিসের শশীর? কতকাল ধরিয়া কতভাবে সে যে তার যাওয়ার কামনাকে পুষ্ট করিয়াছে? যাওয়ার আয়োজন শুরু করিবার সময় দ্বিধা না করিবার, গাফিলতি না করিবার প্রতিজ্ঞাই বা কোথায় গেল শশীর? অমূল্যের মধ্যে নিজের ভবিষ্যৎ প্রতিনিধিকে দেখিয়াই মনটা এমন বিগড়াইয়া গেল? জীবনের বিপুল ব্যাপক বিস্তারের স্বপ্ন দেখিয়া যার দিন কাটিত, এই তুচ্ছ গাওদিয়া গ্রামে এই ক্ষুদ্র হাসপাতালের মোহে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে চাওয়ার কথা তো তার নয়!

অমূল্যকে দেখিয়া এবং সে কেন আসিয়াছে শুনিয়া গোপাল আরও ভড়কাইয়া গেল। আর সে চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। রাত্রে শশী খাইতে বসিলে কোথা হইতে আসিয়া নীরবে একখানা আসন আনিয়া নিজেই পাতিয়া গোপাল তার পাশে বসিল। পিসি ছুটিয়া জলের গ্লাস দিয়া অদূরে বসিতে যাইতেছিল, গোপাল বলিল, যা তুই ক্ষান্ত, পাকঘরে বসবি যা।

পিসি চলিয়া গেলে গোপাল বলিল, তুমি কোথায় যাবে শশী?

শশী বলিল, প্রথমে আপাতত কলকাতায় যাব।

গোপাল বলিল, তারপর পশ্চিম-টশ্চিম একটু ঘুরে বেড়িয়ে বাড়ি ফিরবে বুঝি? মাসখানেক লাগেব তোমার, না?

কলকাতা থেকে বিলেত যাব।

বিলেত? মুখে একগ্রাস ভাত তুলিয়াছিল গোপাল, সেটা গিলিতে গিয়ে দম যেন আটকাইয়া আসিল।–বিলেত কেন?

শিখে টিখে আসব।–শশী বলিল।

গোপাল ব্যাকুলভাবে বলিল, তাতে তো অনেকদিন লাগবে শশী। দু-তিন বছরের কম নয়। এতকাল আমি একা পড়ে থাকব গাঁয়ে?

শশী আশ্চর্য হইয়া বলিল, একা পড়ে থাকবেন?

না, একা নয়, ঘরভরা আত্মীয়-পরিজন থাকিবে গোপালের, গ্রামভরা থাকিবে শত্রুমিত্র। তবু শশী না থাকিলে কী একাই যে সে হইয়া যাইবে এতবড় ছেলেকে কেমন করিয়া গোপাল আজ তা বোঝায়। এ জগতে আর কে আছে একা গোপালের অন্তর জুড়িয়া? হৃদয় তাহার কী রীতি পালন করিয়াছে গোপাল তা জানে মা, এ জগতে একটা মানুষকে সে স্নেহ করিতে পারে নাই, নিজের মেয়ে কটাকে পর্যন্ত নয়; শুধু শশীর জন্য, একা শশীর জন্য, উন্মাদ বাৎসল্য আজও বুক জুড়িয়া আছে। গাম্ভীর্য, ধীরতা সব খসিয়া যায় গোপালের, জড়ানো ভারী গলায় সে বলে ; কেন যাবি বাবা, আমার ওপর রাগ করে, তোর তো আমি কিছুই করিনি!

শশী মৃদুস্বরে বলিল, জীবনের উন্নতি করতে যাব, এতে রাগের কী আছে?

একটু ভাবিয়া গোপাল বলিল, তিন-চার বছর পরে ফিরে এসে হয়তো আমায় আর দেখতেই পাবি না শশী।

তিন-চার বছর পরেও সে যে ফিরিয়া আসিবে না সে-বিষয়ে শশী কিছু বলিল না। নীরবে ভাত মাখিতে লাগিল।

গোপাল আবার বলিল, বুড়ো হলাম, হঠাৎ একদিন যদি মরে যাই, তুইও কাছে না থাকিস, কে এসব দেখবে শশী? সারাজীবন খেটেখুটে যা-কিছু করেছি সব যে ছারেখারে যাবে।

শশী বলিল, আপনার যাকে খুশি সব দিয়ে দেবেন।

এ তো ছেলেমানুষ কথা হল শশী, রাগের কথা হল! বলিয়া গোপাল উৎসুক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। মিথ্যা আশা। প্রতিবাদ করিয়া কিছুই তো শশী বলিল না। ভিতরে ভিতরে একটা জ্বালা বোধ করিতেছিল গোপাল, কী অদ্ভুত বিকারগ্রস্ত সে সন্তান, যার মনের নাগাল মেলে না? কী হইয়াছে বলুক না শশী, জানাক না ঠিক কী সে চায়। অনেক অধিকার ত্যাগ

করিয়া ছেলের ইচ্ছায় গোপাল আজ সায় দিবে। নিজের অনিচ্ছার দিকে একেবারেই তাকাইবে না। উপযুক্ত হইয়াছে অবাধ্য হইয়াছে ছেলে, কী আর করিবে গোপাল, নীরবে সবই তাহাকে সহিতে হইবে! এই ধরনের কথা কিছু শশীকে সে বলে। তার কথায় একপ্রকার অদ্ভুত মিনতি ধ্বনিত হইতে থাকে। কী উগ্র ক্রোধ আর নিদারুণ ভয় আর গভীর দুঃখ মনের মধ্যে চাপিয়া রাখিয়া গোপাল কথা বলিতেছে বুঝিতে পারিয়া নিজেকে বড় বিপন্ন বোধ করে শশী, তবু ধরাছোয়া সে দেয় না। পিতাপুত্রে কী আজ শুরু হইয়াছে বুঝিতে কাহারো বাকি থাকে নাই, ঘরে ঘরে দরজাজানালার আড়ালে জড়ো হইয়া সকলে ওঁত পাতিয়া আছে, চড়া গলায় এদের কথা শুরু হইলে প্রাণ ভরিয়া শুনিবে। বাড়ির একটা অস্বাভাবিক স্তব্ধ আবহাওয়া স্পষ্ট অনুভব করা যায়। কখন ঝড় উঠবে ঠিক নাই।

ঝড় উঠিল সম্পূর্ণ অন্য দিক দিয়া। হঠাৎ সেনদিদির ছেলেকে কোলে করিয়া কোথা হইতে কুন্দ আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, খেয়ে উঠে একবার দেখবেন তো শশীদাদা, গাটা বড় গরম বোধ হচ্ছে।

শশী মুখ তুলিল না, কথা বলিল না। গোপাল বা হাত বাড়াইয়া উদ্বিগ্নকণ্ঠে বলিল, জ্বর হয়েছে নাকি? দেখি। দ্যাখ তো শশী একবার হাত দিয়ে? জ্বর মনে হচ্ছে যেন।

শশী নিঃশব্দে ভাত ফেলিয়া চলিয়া গেল।

জ্বর হয়েছে কি না দেখিবার জন্য অতটুকু শিশুর গায়ে একবার হাত দিবার অনুরোধ। তার জবাবে অমন করিয়া উঠিয়া গেলে সে কাজের মানে গোপালের মাথাতেও ঢোকে বৈ-কি। কুন্দর বিস্মিত দৃষ্টিপাতে লজ্জায় গোপালের গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। অভ্যস্ত গলায় হুংকার দিয়া কুন্দকে বলে, দূর হ, সামনে থেকে দূর হ হারামজাদী।

বিনা দোষে এমন গর্জন কুন্দ সহিতে পারে না, প্রথমে সে বিহ্বল হইয়া গেল, তারপর কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল নিজের ঘরে। দেখিতে দেখিতে বাড়ির কৌতুহলী মেয়েরা সেখানে গিয়া হাজির। কিছুদিন হইতে এ-বাড়ির কাণ্ডকারখানায় সকলে ভ্যাবাঁচাকা খাইয়া যাইতেছে। সাহসী কুন্দই সম্প্রতি ও আশ্চর্য হইয়া গেল।

কেন রে কুন্দ, বকল কেন রে তোকে?

কুন্দ কি সহজে সে কথা ফাঁস করে? ফাঁসফোঁস করিয়া সকলকে সে চলিয়া যাইতে বলে, কেন বিরক্ত করছ আমায়? অনেক তোষামোদে একটু ঠাণ্ডা হয় কুন্দ, তারপর গোপালের রাগের কারণটা ব্যক্ত করে। বলে, আমার যেমন পোড়া কপাল! সেনদিদিও ছেলেটাকে শশীদার সামনে নিয়ে যেতে কতবার মামা বারণ করেছে, তা কথাটা একদম ভুলেই গেলাম। সাদাসিধে মানুষ বাবু আমি, ওসব ঘোরপ্যাচের কথা কি ছাই আমার মনে থাকে!

সকলে বলে, হ্যাঁ লো কুন্দ, ও ছেলেকে আনার পর থেকে বুঝি শশী এমন রেগে আছে, বাপের সঙ্গে কথা কয় না, বিবাগী হয়ে বেরিয়ে যাবে বলে?

নয়তো কী? কুন্দ বলে।

একটু হাসে কুন্দ কে জানিত তলে তলে এমন বাকা মন আমাদের ঠোঁট কাটা কুন্দর বলে, এই ছেলেটাকে নিয়ে বাপ-বেটার কত কী চলেছে তোমরা কী জানবে টের পাই আমি। কী হয় দেখবার জন্যেই তো দুজনে একত্তর খেতে বসেছে দেখে ছেলেটাকে নিয়ে গেলাম। অমন গাল খাব তা ভাবিনি ছোটমামি। আর এখনি হয়েছে কী, একে নিয়ে কী ভীষণ কাণ্ড হয় দেখো, যেমন-তেমন মায়ের ছেলে তো নয় এ।

তার ওপরে মাই খাচ্ছে তোর, না রে কুন্দ? ও ছেলে দেবেই তো ঘরে আগুন!

জ্বর বোধ হয় একটু হইয়াছিল ছেলেটার, গোলাপি বর্ণ তাহার আরও লালিম হইয়া উঠিয়াছে, তাকাইলে চোখ ফেরানো যায় না এমন আশ্চর্য সুন্দর শিশু, তাকে কেন্দ্র করিয়া এক বাড়িতে এতবড় একটা ঝড় উঠিবার উপক্রম হইয়াছে এ যেন বিশ্বাস করা যায় না। কুন্দর চারিদিকে সমবেত মায়েরা দুর্ভাগা ছেলেটাকে ঈর্ষা করে, বাৎসল্য ব্যাকুলও হয়। এর সঙ্গে এক বাড়িতে বাস করিতে চাহে না, কী কঠোর মনটা শশীর, স্নেহলেশশূন্য অন্তঃকরণ।

সেদিন রাত্রে বিনিদ্র গোপাল কী সব ভাবিল সে-ই জানে, পরদিন সকালে কুন্দকে সে চালান করিয়া দিল তার খুড়-শ্বশুরের বাড়ি রাজাতলায়, সঙ্গে গেল তার স্বামীপুত্র এবং সেনদিদির ছেলে।

কাজটা করিয়া গোপাল যেন অনেকটা নিশ্চিত হইল। রাগের কারণ দূর হইল, আর তো শশীর রাগ থাকিবে না। সেনদিদির ছেলে পৃথিবীতে আসিয়াছে বলিয়া শশী রাগ করে নাই, তাকে বাড়িতে আনা হইয়াছে বলিয়া সে গৃহত্যাগ করিয়া যাইতেছে। এ অন্যায় আবদার শশীর অসঙ্গত ব্যবহার, তবু মাথা নিচু করিয়া গোপাল যখন তাহার অভিযোগের প্রতিকার করিল, বাড়ি ছাড়িয়া যাইতে কি আর শশী পরিবে!

পরের মুখে খবরটা ঠিকমতো শশীর কানে পৌঁছেবে না আশঙ্কা করিয়া চোখ-কান বুজিয়া নিজেই গোপাল তাহাকে শোনাইয়া দিল। বলিল, কুন্দকে আজ শ্বশুরবাড়ি পাঠিয়ে দিলাম শশী।

শশী বলিল, রাজাতলায়?

গোপাল বলিল, হ্যাঁ। যামিনীর ছেলেটাকেও ওর সঙ্গে দিয়ে দিলাম।

যামিনীর ছেলে প্রসঙ্গ উঠিলে শশী মুখ খোলে না। গোপাল আবার বলিল, কুন্দ এখন ওখানেই থাকবে বলে দিয়েছি এখানে আসবার ওদের কোনো দরকার নেই।

শশীর সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়াই কাজটা সে যে হাসিল করিয়াছে এমনিভাবে গলা নামাইয়া গোপাল জাবাব বলিল, আসল কথা কী জানিস বাবা, এক ঢিলে দুটো পাখি মেরেছি। কুন্দকেও সরালাম, পরের ছেলে ঘাড়ে করার দায় থেকেও রেহাই পেলাম। যা খুশি করুক গিয়ে এবার, আমি কিছু জানি না-কেঁদেকেটে চিঠি লেখে দু-চার টাকা পাঠিয়ে দেব, বাস্, ফুরিয়ে গেল সম্পর্ক।

তাই যদি ইচ্ছা ছিল গোপালের, বিপিনের কাছ হইতে সেনদিদির ছেলের ভার গ্রহণ করিবার তার কী প্রয়োজন ছিল শশী তা জানিতে চায় নাই তাই রক্ষা, জবাব গোপাল দিতে পারিত না। শশীকে গোপাল ছাড়িতে পারে না, সেনদিদির ছেলেকে ফেলিতে পারে না, অনেক ভাবিয়া চারিদিক রক্ষা করার জন্য পাকা রাজনীতিকের মতো সে যে চাল চালিয়াছে তার সমর্থনের জন্য এরকম দুটো-একটা বানানো পাকা কথা না বলিলে চলিবে কেন ছেলের সঙ্গে তর্ক করিয়া অখণ্ড যুক্তি দাঁড় করানোর জন্য তো এসব বলা নয়, এ শুধু তাকে জানানো যে হার গোপাল মানিয়াছে, ওরে পাথরের পুত্র-দেবতা, এবার তুই তোর ভীষ্মের প্রতিজ্ঞ ছাড়।

সেনদিদির ছেলেকে সরাইয়া নেওয়ার জন্য শুধু নয়, তাকে ধরিয়া রাখার জন্য গোপালকে এমন উতলা হইয়া উঠিতে দেখিলে হয়তো শশী মত বদলাইয়া ফেলিত, আবার হয়তো বাতিল হইয়া যাইত তাহার গ্রামত্যাগের কল্পনা। এখন বড় দেরি হইয়া গিয়াছে। মন তো শশীর কখন চলিয়া গিয়াছে দূরতর দেশে নবতর জীবনযাপনে, এখন শুধু বেঁচেকা ঘাড়ে সেখানে পৌছনো বাকি-তাও দুচারদিনের মধ্যেই ঘটিবে।

সারাদিন গোপালের নিশ্চিন্ত প্রফুল্লভাব শশীকে পীড়া দিল। সে বুঝিতে পারিল গোপাল ধরিয়া লইয়াছে তাদের মধ্যে সমস্ত গোলমাল মিটিয়া গিয়াছে, দিনগুলি অতঃপর যেমন সহজভাবে কাটিতেছিল তেমনিভাবে কাটিতে থাকিবে। এমন একটা জটিল ব্যাপারের এত সহজে এরকম মনোমতো পরিণতি ঘটিবে, গোপালকে ইহা বিশ্বাস করিতে দেখিয়া আশ্চর্যও শশী কম হইল না। তার কাছে কী প্রত্যাশা করে গোপাল? এমন আকুল আগ্রহে কেন সে তাকে ধরিয়া রাখতে চায়? মতে তাদের কখনও মিল হইবে না, প্রতিদিন খিটিমিটি বাঁধিবে, স্নেহ মমতা শ্রদ্ধা ভক্তি পাহাড়কে চাপা দিয়া স্তূপাকার হইয়া উঠিবে অশান্তির হিমালয়। তবু শশীকে গ্রামে বসিয়া এই আত্মবিরোধময় সংকীর্ণ জীবন যাপন করিতে হইবে? এতবড় বিপুল পৃথিবী পড়িয়া থাকিতে তাদের দুটি বিরোধী ব্যক্তিত্বকে অর্থহীন অব্যবহার্য মেহের মোহ আশ্রয় করিয়া থাকিতে হইবে এ ক্ষুদ্র গৃহকোণে?

সেনদিদির ছেলেকে বাড়িতে আনার জন্য মনে মনে শশীর যত বড়ো আঘাতই লাগিয়া থাক, গৃহত্যাগের কারণ হিসাবে আজ তা বহুগুণে তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে। গ্রাম ছাড়িয়া যাইতে যে গভীর দুঃখ জাগিয়াছে শশীর মধ্যে, ও-ধরনের মানসিক বিতৃষ্ণার অজুহাত তার কাছে খাটানো চলে না; আরও বড় লোভ, আর বড় আকর্ষণ দরকার হয়। অথচ গোপালের পক্ষে তা ধারণা করাও অসম্ভব। শশী চলিয়া গেলে তার যাওয়ার ঐ একটি কারণের কথাই গোপাল জানিয়া রাখিবে—সেনদিদির ছেলেকে বাড়ি আনা।

শীতলবাবু ডাকিয়াছিলেন। অমূল্যর সঙ্গে সন্ধ্যার পর শশী তার বাড়ি গিয়াছিল। অমূল্যকে জলটল খাওয়াইয়া শীতলবাবু সকাল সকাল ছাড়িয়া দিলেন, শশকে ছাড়িলেন রাত্রির আহারের পর, অনেক রাত্রে। শীতলবাবু আর এক বিপদ হইয়াছে শশীর, দুবেলা ডাকেন আর গেলেই কথায় কথায় পাগল করিয়া তোলেন শশীকে। বাড়ি ফিরিয়া শশী দেখিল আহারের স্থানে পাশাপাশি দুখানা আসন পাতা আছে এবং যে গোপাল আটটায় খাইতে বসে সে আজ তার প্রতীক্ষায় এগারোটা পর্যন্ত না-খাইয়া বসিয়া আছে।

এত দেরি করলে যে শশী? চট করে মুখহাত ধুয়ে এসো, বসে পড়ি আমরা।

শশী বলিল, আপনি বসুন, আমি খেয়ে এসেছি। শীতলবাবু না-খাইয়ে ছাড়লেন না।

গোপাল ক্ষুন্ন হইয়া বলিল, আজ রান্নার একটু আয়োজন করতে বলেছিলাম বাবা, ভাবলাম পরের ছেলে একটি বাড়িতে এসে আছে, আজবাদে কাল চলে যাবে, একদিন একটু আয়োজন-পত্র করি খাওয়ার। তুমি খেয়ে আসবে বাইরে থেকে, তা জানতাম না।

শশী জিজ্ঞাসা করিল, পরের ছেলে কে?

গোপাল বলিল, অমূল্যবাবুর কথা বলছি। আহা, ডেকেডুকে এনে চলে যেতে বললে বড় লাগবে বেচারির মনে।

শশী বলিল, অমূল চলে যাবে কেন? ওকেই তো হাসপাতালে কাজ দেওয়া হয়েছে?

গোপাল সভয়ে বলিল, তুই থাকলে ও আবার কী করতে থাকবে শশী, অ্যাঁ?

আমি পরশু রওনা হব ভাবছি।-শশী বলিল।

পরশু? গোপালের মুখে আর কথা ফুটিল না। শশী ঘরে চলিয়া গেলে সে একেবারে বাহিরের দাওয়ায় গিয়া অন্ধকারে কাঠের বেঞ্চিটাতে বসিয়া রহিল। একজন মুনীষ দাওয়ায় শয়নের আয়োজন করিতেছিল, সে এক ছিলুম তামাক সাজিয়া দিল গোপালকে, তারপর মনিবের সামনে শুইয়া পড়িতে না পারিয়া বিছানো চাটাইটির উপর উবু হইয়া বসিয়া শ্রান্তিবশত জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিল। আজ আবার ব্রহ্মচারীকে মনে পড়িতেছে গোপালের, সেনদিদির মৃত্যুর পর মনে যে গভীর বিষাদ ও বৈরাগ্য আসিয়াছিল, ব্রহ্মচারীর মুখে নীরস আধ্যাত্মিক কাহিনী শুনিতে শুনিতে এক আশ্চর্য উপায়ে তার ঘোরটা কাটিয়া গিয়াছিল। আজ বড় অবসন্ন মনে হইতেছে নিজেকে। বিচিত্র কাণ্ডকারখানা ভরা দীর্ঘ জীবনটা আজ অকারণ, অর্থহীন মনে হইতেছে-কোনো কাজেই লাগিল না! শশীর জন্মের দিনটি হইতে তারি পানে চোখ রাখিয়া কত কল্পনাই গোপাল করিয়াছে—যার ডগাটি আকাশে ঠেকিয়া প্রায় হইয়াছে আকাশ-কুসুম খেলখাপড়া শিখিয়া এ কী রীতিনীতি শিখিয়াছে শশী? বাগান, বাড়ি, জমিজমা, ধনসম্পদ, আত্মীয়পরিজন-এত সব যে গোপাল একত্র করিয়াছে, এ কী তার নিজের জন্য? তার আর কতদিন বাকি। এসব তুচ্ছ করিয়া শশী যদি চলিয়া যায়, সমস্ত জীবনটাই গোপালের ব্যর্থ হইয়া যাইবে না?

এত রাত্রে সে একবার অমূল্যের ঘরে যায়। অমূল্যকে জাগাইয়া বলে, একটা কথা শুধোই বাবু তোমাকে। শশী পরশু চলে যাবে আমায় যে বলনি?

রাতদুপুরে ঘুমন্ত মানুষকে তুলিয়া গোপালের এই কৈফিয়ত দাবি করা অমূল্যকে ভড়কাইয়া দেয়। সে বলে, আমি জানতাম না, কবে যাবে শশী, আমায় কিছু বলেনি।

গোপাল অসন্তোষের সুরে বলে, আর সব বললে, একথাটা বললে না? কী যেন মতলব ছিল বাবু তোমার, তাই গোপন করেছিলে।

অমূল্য জিভ কাটিয়া বলে, আজ্ঞে না, সে কী কথা!

গোপাল বলিল, সে কী কথা! আমার ছেলে দেশছাড়া হবে চিরকালের জন্যে আর তুমি তার জায়গায় জেকে বসবে, বড় ভালো মতলব তোমার! ওঠো দিকি বাবু সুখশয্যা ছেড়ে, জিনিসপত্র চুপিচুপি গুছিয়ে নাও তারপর চলো আমরা বিদেয় হই।

ডাতাকের মতো দেখায় গোপালকে, খুনে দাঙ্গাবাজের মতো শোনায় কথাবার্তা। অমূল্যের ঘরে যে বিচিত্র, নাটকীয় কথোপকথন চলে, কিছুই শান্ত শশীর চেতনায় পৌঁছায় না; জীবন সম্বন্ধে যে অমন তীব্রভাবে সচেতন, সে হইয়া থাকে পুতুলের মতো চেতনাহীন। তাকেই বাৎসল্য করে বলিয়া মধ্যরাত্রে গোপাল আজ যে বিচিত্র দৃশ্যের অবতারণা করে, যেসব অদ্ভুত কথা বলে, তা দেখিলে ও শুনিলে একটা অভিজ্ঞতা জন্মিয়া যাইত শশীর। চাপা গলায় খানিকক্ষণ অমূল্যের প্রতি তর্জনগর্জন করিয়া গরম মাথাটা বোধ হয় একটু ঠাণ্ডা হয় গোপালের, সে ঘরে যায়।

পরদিন খুব ভোরে শশীকে সে ডাকিয়া তুলিল। শশী উঠিয়া দেখিল মুনীষের মাথায় বাক্স বিছানা চাপাইয়া কোথায় যাইবার জন্য গোপাল প্রস্তুত হইয়া আছে।

গোপাল সহজভাবেই বলিল, পরশু তোর যাওয়া হয় না শশী, আমি আজ বাবার কাছে কাশী যাচ্ছি,-সাত-আট দিন আশ্রমে থাকব। একজনের বাড়ি না থাকলে চলবে না। আমি ফিরে এলে যা হয় করিস।

শশী বলিল, হঠাৎ কাশী যাবেন কেন?

গোপাল পালটা জবাব দিয়া বলিল, হ্যাঁরে শশী, চিরকাল সংসারে হাঙ্গামা নিয়ে হয়রান হয়ে এলাম, এখন তোরা বড় হয়েছিস, মন টন ব্যাকুল হলে সাতটা দিনের ছুটিও পাব না? এতটুকু আশাও তোদের কাছে আমার করা চলবে না?

শশী মৃদুস্বরে বলিল, তা বলিনি, কোথাও কিছু নেই হঠাৎ যাচ্ছেন, তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম। কাল তো কিছু বলেননি আমাকে?

গোপাল দারুণ অভিমান করিয়া বলিল, না যদি থাকতে পারিস তো বল, যাওয়া বন্ধ করি। অদৃষ্টের লেখা কে খণ্ডবে!

শশী বলিল, বেশ তো আসুন গিয়ে-কদিন পরে গেলেও আমার কোনো অসুবিধা হবে না।

গোপালকে শশী প্রণাম করিল। সকালবেলায় স্বচ্ছ আলোয় দুজনের মুখ দেখিয়া মনে হইল না পিতা-পুত্রে কোনোদিন কোনো সামান্য বিষয়েও মতান্তর ছিল, জীবনের গতি দুজনের বিপরীতগামী।

সেই যে গেল গোপাল আর সে ফিরিল না। সংসার গৃহস্থ মানুষ সে, সমস্ত জীবন ধরিয়া ফলপুষ্পশস্যদাত্রী ভূমিখণ্ড, সিন্দুক ভরা সোনারুপা, কতকগুলি মানুষের সঙ্গে পরিবারিক ও আরও কতকগুলি মানুষের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক, দায়িত্ব, বাধ্যবাধকতা প্রভৃতি যতকিছু অর্জন করিয়াছিল সব সে দিয়া গেল শশীকে, মরিয়া গেলে যেমন সে দিত। কুন্দ কয়েকদিন পরে ফিরিয়া আসিল। রাজাতলা হইয়া গোপাল সেনদিদির ছেলেকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছে। কুন্দ সোনার হার কিনিবে বলিয়া দুশো টাকাও তাহাকে দিয়া গিয়াছে। হয়তো ওটাই ছিল শেষ বাধ্যবাধকতা।

কী আর করিবে শশী, এ ভার তো ফেলিবার নয়। গভীর বিষন্নমুখে একে একে যাওয়ার আয়োজনগুলি বাতিল করিয়া দিল। দুমাসের মাহিনা পকেটে পুরিয়া অমূল্য ফিরিয়া গেল, গাঁয়ে থাকিতে হইলে হাসপাতালের প্রত্যেক রোগীর নাড়ি টিপিতে না পারিলে শশীর চলিবে কেন? কাজ আর দায়িত্ব ছিল জীবনে, কাজ আর দায়িত্বের জীবনটা আবার ভরপুর হইয়া উঠিল। নদীর মতো নিজের খুশিতে গড়া পথে কি মানুষের জীবনের স্রোত বহিতে

পারে? মানুষের হাতে কাটা খালে তার গতি, এক অজানা শক্তির অনিবার্য ইঙ্গিতে? মাধ্যাকর্ষণের মতো যা চিরন্তন অপরিবর্তনীয়।

মামলা করিতে শশী বাজিতপুরে যায়, ফিরিবার পথে চোখ তুলিয়া দেখিতে পায় খালের ধারে বজ্রাহত একটা বটগাছ শুকনো ডালপালা মেলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। গাওদিয়ার ঘাটে গোবর্ধন নৌকা ভিড়ায়। নন্দলালের পাট-জমাকরা শূন্য চালাটা প্রায় ভাঙিয়া পড়িয়াছে দেখিয়া শশীর মনে হয় নন্দলালের পাপ-জমা-করা বিন্দুর দেহটাও হয়তো এতদিনে এমনিভাবে ভাঙিয়া পড়িয়াছে। জোরে আর আজকাল শশী হাঁটে না, মন্থর পদে হাঁটিতে হাঁটিতে গ্রামে প্রবেশ করে। গাছপালা বাড়িঘর ডোবা পুকুর জড়াইয়া গ্রামের সর্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ রূপের দিকে নয়, শশীর চোখ খুঁজিয়া বেড়ায় মানুষ। যারা আছে তাদের, আর যারা ছিল। শ্রীনাথের দোকানের সামনে, বাঁধানো বকুলতলায়, কায়েতপাড়ার পথে। যামিনী কবিরাজের বাহিরের ঘরে হামানদিস্তার ঠকঠক শব্দ শশী আজও শুনিতে পায়; এ বাড়ির মানুষের ফাঁক মানুষ পূর্ণ করিয়াছে। যাদবের বাড়িটা শুধু গ্রাস করিতেছে জঙ্গলে, পরানের বাড়িতেও এখনো লোক আসে নাই। তার ওপাশে তালবন। তালবনে শশী কখনও যায় না। মাটির টিলাটির উপর উঠিয়া সূর্যাস্ত দেখিবার শখ এ জীবনে আর একবারও শশীর আসিবে না।

সমাপ্ত